সেই আয়না

সুজয় রায়

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১, শংকর ঘোষ লেন,
কলকাতা-৬

প্রকাশক : শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৬৬

মুদ্রাকর : শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

ভাষাবুদ্বুদের কথার সাগরে অঞ্জলি দিলাম আমার গল্পকল্প-প্রগলভতা। চৈতন্যের বীণার তারে ভাষা প্রহরীদের সাজ সাজ রব - কে তুমি?—বাণী মঞ্জরী।

সময় পেছনে পড়ে রইল। যদিও ভাঙা হাট কানে কানে সাধন দেয়, "পালাও, পালাও।" তবু ....

মন্ত্র দাও। সঞ্চারী হলো চিন্তার গতি।

সূচি

গৌরচন্দ্রিকা

লিখি কেন? আসলে সময় লিখে চলেছে আমাকে জীবনের কালি দিয়ে। অনেককাল আগে আমার একটা সরল স্বারস্বত তৃষ্ণা ছিল। কিন্তু তার পরিণত রূপটা সাকার চেহারায় ধারণা ছিল না। একটা অদৃশ্য ছলনার বাঁশীর মধুর সুর কানাকানি করত আমার চাষা-সুন্দর স্বভাবের সঙ্গে। কাদের যেন ইশারা 'আছি, নেই; আছি নেই' গোছের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখে যেত। বিহারের লণ্ঠন সভ্যতা, পরনে হাফ প্যান্ট। সেই দিনের স্মৃতি চিহ্ন এখন হাফ টোনে আঁকা ঝাপসা হয়ে গেছে। তারপর যতদিন পঠন-পাঠন, চাকরি, সংসারে আসামী হাজির,- আমাকে ভোলানাথের মতো অন্নপূর্ণার কাছে বন্ধক রাখল, ততদিন আমার কাব্যের ভেলা অনবসরের উজান ঠেলে প্রতিকূল হাওয়ায় হারিয়ে গেল। বয়ঃসন্ধিকালের সুর যৌবনে ঘুমিয়ে রইল অবহেলায়। দীর্ঘকাল ছিল কাব্যের অবেলা। শুরুতে যা ছিল কাব্যের চুলকানি, প্রবীণ আকাশে তাই হয়ে দাঁড়াল এলার্জি। এখন সাহিত্যের জ্বর প্রলাপের ভাষা পেয়েছে; তাই দিয়ে কাগুজে বাঘের কলমের থাবা বসাচ্ছি লেখার খাতায়। ভাষার সজ্জিত রণতরী, কথার ঢক্কানিণাদ। জ্বরটা বেড়ে চলেছে, তবে সান্ত্বনা এই যে মনের মধ্যে গরল কম। সাহিত্যভোজের আমিষ আকাঙ্খাই প্রলাপ বকে চলেছে। মাতৃভাষার এলাচ, মৌরী চিবিয়ে আর পেট ভরছে না।

আজকের গল্পগুলি এসেছে রঙীন ফাগ মেশানো কল্পনার গুলিস্থান থেকে। তর্কাতীত সত্য এই গুল। অমরাবতীর বাগিচায় সাহিত্যের বুলবুল। গুলবুলিস্তান। জীবনের লোকপ্রিয় সন্দেশ এই গল্পের চয়ন। সাধারণ, অসাধারণ চরিত্রদের রামধেনুর রঙের তুলিতে খেলিয়ে তুলেছি। এদের খেলোয়ারী স্বভাব। পরিহাসের মালা সকলের গলায়। সকলেই আমরা পরাজিত নায়ক। হাস্যরস যেন অন্য ভুবনের অনন্য কলস্বর। মরুভূমির স্তিমিত প্রাণে এনে দেয় সহস্র বাক্যস্রোত। শীতল সমুদ্রের তিমির রাতে তীরের আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে- এক মানুষী ইচ্ছা।

এই সুন্দর পৃথিবী আমাকে বাচাল করেছে। অথচ জীবন মানেই বিড়ম্বনা। অনিশ্চিতের নিশ্চিত হাতছানি। কালো মেঘের শরীরে জীবনের ভাঙা গড়ার গান। পরিহাসের এক উদাস বিবাগী সুর আছে- সেটা বিশ্বের লোটা-কম্বল। নষ্ট সুর, তাল বেতাল। ভণ্ডুল তান। আমাদের সারা জীবনের ভাঙা-গড়া, চড়াই,উৎরাই ভগবানের এক টিপ চতুর নস্যি নেওয়ার সমান। অদৃষ্টের রসায়নে আমরা পরিহাস শিল্পী।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ। জীবনে হামা দেওয়ার বয়স থেকেই মামাদের অতুল পরিহাস- সাহিত্য চৈতন্যে মেখে নিয়েছিলাম। সকালবেলায় তাঁরা গল্পের সল্তে

পাকিয়ে দিয়েছিলেন; সাঁঝের বেলায় তাই আরব্যরজনীর প্রাসাদে কথার পিদিম ঝল্মল্ করছে। অরুণ মৈত্র, বড়মামা এঁকেছেন বইয়ের ছবিগুলি। ভাষাতে যে অসম্পূর্ণতার ভার থেকে গেছে তুলিতে তাকে তুলে নিয়ে বোধহয় উত্তীর্ণ করে দিলেন। প্রবীণ শিল্পীর নবীন প্রাণের সাজ এই ছবিগুলিতে দেখা যাবে।

সাহিত্যিক বন্ধু অনিল চক্রবর্তীকে গল্পের ভেতরে ধরেছি। নইলে শোধবোধ হবেনা। আমার হাতে কলম ধরানোর দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। সাহিত্যের মগডালে আমাকে তুলে দিয়ে মই সরিয়ে নিয়েছেন। এখন চক্কোত্তি মহাশয় আমাকে উদ্দেশ্য করে অম্লরসের ছড়া কেটে চলেছেন।

স্বীকৃতি জানাই প্রশান্ত সিকদার, অমর বসু ও কমল ব্যানার্জীকে। লেখকের জীবনে যারা চলার পথ সুগম করে দিয়েছেন। এঁদের উৎসাহ অনেকাংশে আমার সাহিত্যের ধানের গোলা ভরে তুলেছে।

কলমের বৈঠা বেয়ে তীরে এসে তরী সমে ঠেকল আমার পরিবারে। আমার দীর্ঘ যাত্রার পথের ধুলো জমা হলো। এখানে স্বীকৃতি জানাতে গেলে লেখনীর দৈন্য ধরা পড়বে।

অচিন বোস, কৌশিক রায় ও মানস রায়—এই তিন অস্থির মানুষ স্থির প্রত্যয়ে আমার লেখা ডানা মেলে সম্পাদকের জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে আনলেন। তাই এই লেখা দিনের আলোর দেখা পেল।

সেই আয়না

এক

সেই আয়না, সেই কাল, সেই বায়না। অতীতকে ফিরে দেখা। অতীতের ঘটনাগুলি চতুরশিরোমনি। এই তো সেদিন ছিল, আজ নেই। অশ্বক্ষুরের ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল। আয়নার গায়ে মুখের গরম বাষ্প,— আর বক্ষের হুতাশন ছড়িয়ে ছেঁড়া কাপড়, ফাটা জামা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করছি। যে দিনগুলো ফেরারী হয়ে গেছে, আমার সেই আনাড়ী শৈশব উঁকি মারছে আয়নাতে। স্মৃতির গোলকধামে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে সে। খোলা আকাশটা আয়নার বুকে ছায়া ফেলেছে, অতীতের পুরাতন মেঘটাকে টেনে খেয়া পারাপার করছে আজও। স্মৃতির রং বুঝি নীলাকাশ? চিরকাল এই আমার বদ স্বভাব। প্রকৃতিটা **sentiment**- এর বাড়াবাড়ি, আলুথালু গড়াগড়ি। বাবা বলতেন, " গগনবিলাস, আকাশচারিতা থামাও বাপু!"

সেই আয়না, মায়ের বিয়ের উপহার। যার সামনে বহুবার সংসারে হার মেনে চোখের জল ফেলেছেন। ফুলশয্যার রাতে গভীর প্রত্যাশায় আয়নাতে জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সংসারের তস্কর আক্রমণে মা তখনো বাজী হারেননি। চোখের দৃষ্টিতে জ্যোতি ছিল। বাবা দাঁড়িয়েছিলেন পেছনে স্ফীত বক্ষে আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নবদম্পতির গাঁটছড়া বাঁধা জীবন। **Belgian** কাঁচ দিয়ে তৈরী আর্শীটা, গোলাপ ফুলের এক বিশাল পাপড়ির আকারে তার দেহ সৌষ্ঠব। ড্রেসিং টেবিল মেহগনী কাঠের। শক্ত তনুটি অস্থায়ী সময়কে হার মানিয়ে আজও স্থায়ী হয়ে, আগামীকালের জন্য তরিবৎ সুস্থ শরীরে আছে। বাবা, মা ও আমার জীবনের উপকুলে প্রতিমা ভাসানোর সময় এলেও যৌবন হারায়নি সে। দুই এক ফোঁটা চোখের জল তার গায়ে গড়িয়ে পড়লেও, অমলিন, উজ্জ্বল সে আজ পর্যন্ত। দুই পুরুষ পার করে দিয়ে আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিতালি করছে, নিভৃতে তাদের জীবনের সঙ্গে আলো- ছায়ার লুকোচুরি খেলছে। সংসারের বেড়া ভাঙছে, মেরামত হচ্ছে। সাক্ষী সেই আয়না।

আমার দাদামশায় তাঁর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানোর সময় যৌতুক দিয়েছিলেন এটা। ভাগ্যগণনা করে বলেছিলেন, " এই রত্নটি ইতিহাসে অনেকদূর যাবে। " রুমাল দিয়ে যত্ন করে মুছে পরিষ্কার করি সেই আয়না। টুকরো স্মৃতির নীলাকাশ স্ফটিক

স্বচ্ছ আর্শির গায়ে **frame** করা হচ্ছে। স্নায়ুর ওপর দিয়ে স্মৃতির জলতরঙ্গ বেজে গেল।... ড্রেসিং টেবিলের টুলে মা চুল আঁচড়াচ্ছেন, বাবার চওড়া বুক আয়না জুড়ে আছে। ছোট বোনটা সবে একটু লম্বা হয়েছে, ওর চোখ, নাক অর্ধেক উঁকি মারছে আয়নার গায়ে। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ভর করে ব্যালেরীণা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমি গ্যালিস দেওয়া হাফ প্যান্ট পরে ছন্দভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে পাশে। ট্যারা চোখে আয়নাতে দৃষ্টি দিচ্ছি। আমার মাথার চুল ঝাঁটার মতো খোঁচানো, কিন্তু একটা ওঁচা তাচ্ছিল্যের টান ঠোঁটে। চোখ দুটি কুতকুতে।

সেই আয়না, যাতে শৈশব ধরা থাকে। বিহারের পল্লী জীবনের মস্ত অবকাশ, যেখানে কাল বহে যায়, কিন্তু ইতিহাসের চাকা এক কদম এগোয়, দুই কদম পিছিয়ে আসে। বাড়ির খাস দেহাতী চাকরটা রোজ সকালে তেঁতুল দিয়ে পিতলের লোটা ঘসে চকচকে করে চকমিলানো রম্যপ্রাসাদ গড়ে তুলছে যেন। কেবল লোটা-কম্বল ছিল যার জীবনের সম্বল। আমিও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রুমালের ঘসা টানে স্মৃতির সৌধ আঁকি সেই আয়নাতে।... দেদার ভাই বোন ছিলাম আমরা ঠাকুর্দার উদার পরিবারে। বিকেল বেলায় মাঠে বল পড়েছে, বাবা, কাকা, জ্যাঠারা জীবনকে নিয়ে ফুটবল খেলায় মেতে থাকতেন। আমরা শিশুসাথী পঙ্গপাল ঠাকুমার ভাঁড়ার ঘরের সামনে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছি। ঠাকুমা আমাদের প্যান্টের দুই পকেটে টইটম্বুর করে ভরে দিলেন মুড়ি, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে চিড়েভাজা, মুড়কী। শিশুসাথী পঙ্গপাল এবার শরতের মেঘের মতো লঘু পায়ে মুড়ি চিবিয়ে জাবর কাটতে কাটতে চলল খেলার মাঠে ধুলোর রাস্তায়। যেখানে সেদিন ছিল আমাদের ধুলোর সিংহাসন, গড়াগড়ি দিয়েছি কত! গ্রামের স্কুলের সামনে বিশাল খেলার মাঠ —সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। ঠাকুর্দা চালু করেছিলেন এই খেলার আসর। ওনার নামে ও হাতে তৈরী **Hemchandra High School**। আমাদের কিষণপুর গ্রামের সঙ্গে পূর্ণিয়ার টিমের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ আজ। বাবা সেন্টার ফরোয়ার্ড, অন্য গুরুজনেরা কেউ ফরোয়ার্ডি, কেউ ব্যাকে দাঁড়িয়ে। মাঠ তো নয়, যেন সবুজ ঘাসের শীতলপাটি। তার গায়ে চোরা বাবলা কাঁটা। বেপরোয়া দুই খেলোয়াড় বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে দুর্ধর্ষ ছুটে চলেছে। রুদ্ধশ্বাসে আমরা মুড়ি চেবানো, জাবর কাটা ভুলে হঠাৎ দেখি তাদের একজন দ- আকারে মাঠে একপায়ে যন্ত্রণায় নাচছে। বাবলা কাঁটা লেগেছে পায়ে। এবার বল ছুটে চলেছে মাঠের বাঁ দিকের লাইন ধরে। মাঠের চৌকো সীমানার বাইরে ঘিরে আছে ঘন কাশবন। সেখানে লাইনের ধারে খেলোয়াড়দের জটলা বেঁধে গেছে। বেপরোয়া পায়ের আস্ফলন করছে সকলে, বলে লাগছে, কিম্বা গায়ে লাগছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই কারো। রেফারী প্রাণপণ হুইসিলের দণ্ডাদেশ জানাচ্ছে, কেউ কর্ণপাত করছে না। বংশানুক্রমিক দুই টিমের খেলোয়াড়ী মেজাজ আজ পরস্পর জাতক্রোধ মেটাচ্ছে। বাবা তারই মধ্যে প্রজাপতির মতো উড়ে চলেছেন, বল ছুটে

তার পায়ে আসছে চুম্বক টানে, সকলকে এড়িয়ে পেনাল্টি সীমানায় ঢুকে পড়েছেন। গোলরক্ষক একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ঝুঁকছে। বাবা ছুটে এলেন, বল নিয়তির মতো গোল সীমানায় ঢুকে গেল। কিষণপুর সেদিন ম্যাচ জিতল। কিন্তু ছেলের চোখে বাবা ধরা পড়ে গেলেন। স্পষ্ট দেখলাম বলটা ওনার কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে গোলে ঢুকে গেল। ময়রাদের দোকানে সেদিন প্রচুর মণ্ডা মিঠাই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।

... সারা সপ্তাহটা বড় খাটুনি গেছে অফিসে। রবিবার সকালবেলা গতরটা নড়াতে পারছি না। আজ কাজের মালিককে ঘাড় থেকে নামিয়ে আস্তাবলের ঘোড়ার মতো অবসন্ন বেদনায় চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ছি। অদৃষ্টের পায়ে মাথা ঠুকে কপালটা ফুলেছে। "পোড়া কপালী,মা কালী এবার ফেরাও মোরে।" বিছানায় শুয়ে আছি মনের সঙ্গে একই শয্যায় আড়ি করে। জীবনে স্টোরী যদি নাই থাকল, তবে সেই আয়নার সামনে এত টেরী কাটো কেন ? এককালে ছিল জমিদারের বংশ, বর্তমানে বাঁশঝাড়ে পরিণত হয়েছে। ঠাকুর্দার ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ফটো আছে ,— আমার জীবনের ফাটল ভরাট করার জন্য জাঁক করে দেখাই সকলকে। বাঘা শিকারী, রাইফেল পাশে রেখে নিজের হাই প্রোফাইল বিজ্ঞাপিত করছেন ফটোতে। আপাদমস্তক শিকারীর ধরা চূড়া পরানো, কলকাতায় সাহেব পাড়া থেকে কেনা। একটা বিশাল শুয়োর মৃত সৈনিকের নিখুঁত অভিনয় করছে সামনের জমিতে ধরাশায়ী হয়ে। পেছনে জঙ্গলে তাঁবু পড়েছে —দেখা যাচ্ছে ফটোতে। ঠাকুর্দার একটা পা উদ্যত বরাহের দিকে, পায়ের বুড়ো আঙ্গুল সর্ন্তপণে জন্তুটার গায়ে ছুঁয়ে আছে। বহুকাল মুগ্ধ চোখে দেখেছি সেই ফটো। নিজেকে বড়ো খাটো মনে হয়েছে তার সামনে। আয়নার গায়ে ঘসাঘসি করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গ্রামের এক সীমানায় ছিল মেথরপল্লী। বরাহ রত্নকে চেনা চেনা ঠেকছে কেন? দেখেছি এমন অনেকগুলোকে মেথর পাড়ায়। তাদেরই একটাকে চোলাই মদের নেশায় বেহুঁশ করে সঁপে দেওয়া হয়েছে জমিদারের পায়ে। ও হরি, এরই জন্য এত সাজ, তাঁবু খাটানো। ঠাকুর্দা আলতো করে পা দিয়ে ছুঁয়েছেন বেচারীকে। জেগে উঠে তাড়া করলে রাইফেল ফেলে তাঁবু ভেদ করে রণে ভঙ্গ দিতে হবে।... ঠাকুর্দার কুলাঙ্গার নাতিগুলো অবিশ্বাসে ভরা চরম নাস্তিক। তাই সেদিনের চল্লিশজন মানুষের ভরাট সংসার ক্রমে অন্ধকার হয়ে গেল; একে একে সব তারা গেল খসে, সবকয়টা প্রদীপের আলো ছাই হল। জীবনের মাদল আর বাজেনা। জ্যাঠতুতো ভাইয়েরা সাময়িকভাবে কখনো সখনো কয়েকটা দিন সেই ভদ্রাসনে বাস করে শহরে চলে যান। সঙ্গী শুধু ভাগ্যপ্রবঞ্চিত কোলকুঁজো এক দেহাতী চাকর। অদৃষ্টের করতালি, আর গ্রাম্যরসবোধ অনুযায়ী নামটি তার ভগবান, পরিহাসের মালার মতো গলায় লগ্নী হয়ে আছে।

আজ আয়নার গায়ে প্রতিচ্ছবিটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল। আমার ছাতি, কোমর, পা তালগোল পাকিয়ে লাট্টুর মতো ঘুরছে। একী গেরো রে বাবা ! সংসারের সাত পাকে

বাঁধা ধাঁধার গোলকধাম সাপের খোলস ছাড়াচ্ছে না কী ? বাড়ীর কুকুরটার মাঝে মাঝে এরকম মতি গতি হয় বটে। **The tail wagging the dog** । লেজের পিছনে ঘোরাঘুরি করে শেষে কুকুরের ধরটা পাকাপাকি ভাবে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। অজ্ঞান জগত সংসারটা তমসার ঘন ছায়ার মতো ঘূর্ণী ঝড়ের ছন্দে উন্মাদ শিব নৃত্য শুরু করেছে। পায়ের তলার শ্যামল মাটির ধরাতল সরে যাচ্ছে। অপসৃয়মান জীবনের বায়োস্কোপ শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে। এবার অদৃষ্টের হাতে করতালি বেজে উঠবে হয়তো। ফুৎকারে নিভে যাবে জীবনের আলো। একেই কি বলে **cosmic dissolution** ? স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ঠাকুরঘরে কি এই কালপ্লাবী মহাকালের অতিজাগতিক পেণ্ডুলামে চড়ে বসে কেঁদে উঠেছিলেন ? চালচুলো সব যে উড়ে গেল ঝড়ের হাওয়ায় উৎখাত হয়ে। তবে অবশিষ্ট রইল কী?— কান!— না ধূমকেতুর মতো বিদ্যাসাগরী খড়ম বা চটি চটে উঠে আয়নার পটে বাঙালীকে ভর্ৎসনা করছে না। নেহাতই আমার বিসদৃশ একটি কান মায়াবী আয়নার ছায়ায়। অমার্জিত সেই কান, যেটা গুরুজনদের বড়ো আদরের ছিল। আমারই চরিত্রের স্বাক্ষর। আয়নাটা আমার জীবন কাহিনীর ওপরে টিপ্পনী কাটছে।

দুই

এক বিরাট মিছিলের কাহিনীকার সেই আয়না। মাত্রা ও লয়কে হরণ করে ইস্টার্ন রেলের মালগাড়ী গদাই লস্করী চালে পদে পদে হোঁচট খেয়ে এগিয়ে চলেছে যেন। বিহারের পল্লীগ্রামের শ্যামল আঁচলে, বাবার পিঠে,মায়ের কোলে সামান্য কটা বছরই বা কাটিয়েছিলাম? তবু তো নাড়ীর টান অমোঘ। জীবনের প্রথম প্রভাতের উজ্জ্বল নীল আকাশ আজও নীলাঞ্জন মায়া জড়িয়ে রেখেছে দু চোখের কাজলে। আজও সেই অতলান্ত সমুদ্রের মতো নীলাকাশকে আঁজলা করে পিপাসা মেটাতে ইচ্ছে করে। মহাকালের সুদূর হাতছানি। ভৈরোঁ রাগিণীর সুরমুর্চ্ছনা সানাইতে বাজে। রঙে, বর্ণে মাতাল আমি। গ্রামের কোল ঘেঁষে সবুজের আল্পনা, কত সবুজ হতে পারে? আঁধার রাত কানা চোখে কত কথা বলে মনের সুড়ঙ্গ পথে?

"আঁধারের রং তুমি দেখেছ কী?" কাজল কালো দীঘি? পল্লীগ্রামের অন্ধকার রাস্তায় অপর গ্রামে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাবা গভীর রাতে ফিরছেন গরুগাড়ী চড়ে ভুবন ডাঙার প্রান্তর পার হয়ে। নামটা চেনা ঠেকছে ? তবে অন্য নামে চিহ্নিত করছি জায়গাটা — চারগুহা। বন্যার সময় অথৈ জল, জল শুকিয়ে গেলে সারা বছর বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। দশ মাইল জুড়ে কোনো গ্রাম বসতি নেই। ত্রাসে ভরা এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ডাকাত চলার রাস্তা। আমাদের গরুগাড়ী চলেছে, গরুগুলো ঝিমিয়ে পড়ছে, গাড়োয়ান রুক্ষ হাতে গরুর লেজমর্দন করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সেই রাতটা

আজও স্বপ্ন-সুনিবিড়। নিরবতার একটা ভাষা আছে, যখন আকাশের তারাও কথা বলে। ভয়ংকর সুন্দরী সেই রাত। **Beauty is the begining of terror**।

আবার মুছি সেই আয়না। যৌথ পরিবারের মিছিল। তারই মধ্যে তারা-খসা আমি—ঘরছুট, দলছুট হয়ে এক লম্বা দৌড় দিচ্ছে আমার তরুণ পা দুটি। পলাতকা ঘুড়ীর মতো সঞ্চারী হৃদয়। জীবনের গেরো কেটে এই বিরাট ছুট বড় জরুরী। কার্যকারণ, পরিণাম জানা নেই। মানুষের সমান কাশবন চৌচির করে ছুটে চলেছি আমি। সর সর আওয়াজে,কাশবন বিদীর্ণ করে ছুটে চলা— অনির্দিষ্ট কক্ষপথে তীর ছুঁড়ে অজানা লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার মতো। আমি চাষা-সুন্দর, ভ্রমর-গুঞ্জন করি। আমার ভন্ডুল-জীবনে মাধুকরী বৃত্তি আছে। **Where the bee sucks there suck I**। " মনের সাথে ভ্রমর যেথায় একই ফুলে বসে।" আকাশের নীলিমায় মদিরার নেশা ঢালা। নীল আকাশে সাদা কাশ আমার মুগ্ধ প্রাণে মোচর দিয়ে যাচ্ছে। একটা গঙ্গা ফড়িং জুটেছে মানুষের সঙ্গে রূপকের সন্ধানে। আকাশের গায়ে টেলিগ্রাফের তার টানটান করে বাঁধা। সুদূরের খবর, মানুষের কলতান ঐ তারে বাজছে। একটা তীক্ষ্ণ শীষের সুর সেই তারে বেজে চলেছে বাতাসের ঝঙ্কারে। আমার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে। কোনদিন সেয়ানা ছিলাম না আমি। কিন্তু জেঠিমা দু'খিলি পান মুখে পুরে বলতেন," ছেলেটা শেয়ালপক্ক, ওর হায়নার হাসি, আর কুম্ভীরাশ্রু"। হুট করে কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় পায়ের চাকা এবারে টপ গিয়ারে ছুটে চলল। অভিমানে কাশবন উদাস হয়ে আছে। এই ছোটা পথে যদি তিব্বতের রাস্তার সন্ধান পাওয়া যেত? .... এবার রাস্তা ঘুরে চলল আমের বাগিচায়। গাছগুলো পরস্পর বিশ্রুম্ভালাপ করছে। তাড়া নেই কোনো কাজে। বাতাসের আঙুলে গাছের মাথায় পাতার বিনুনীর বিন্যাস। ল্যাংড়া, ফজলী, বোম্বাই, সিঁদুরে, কলমের আম, আঁঠির আম — বাগানের এই ভরা সংসার। বাগীচার পশ্চিম প্রান্তে সারি বেঁধে প্রহরায় দাঁড়িয়ে লম্বা গাছগুলি — তুঁতে ফল হয় তাতে। সবুজ, লাল রঙ মেশানো। আস্বাদের গায়ে প্রশ্রয় দিতে জানে সেই ফল। বাগানের দক্ষিণ সীমানায় বাতাবী, গন্ধরাজ আর লিচু গাছ। আমের ঘরে উপুরি পাওনা এরা।

জ্যৈষ্ঠমাসের তপ্ত হাওয়া হাহাকার স্বরে বাগানের বুক বিদীর্ণ করে উড়ে চলে। কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাষ গাঙের মাঝি আগাম খবর পেয়ে আমাদের কাছারীতে জানায়। ঋতু পরিবর্তনের আগমনী বার্তা— আবহাওয়া দপ্তর নয়, অন্য নিয়মে চিঠি লিখে পাঠায় গ্রামের মানুষকে। পল্লী সমাজের জাগতিক বিজ্ঞানের পরম্পরা। বিহারে এক বছর খরা যায়, পরের বছর বন্যা। "বন্যার জলের ঢল নামবে এবার, বাবু,শক্ত করে বৈঠা ধরে বসো।" এই ভাসমান "নাও" জীবনতরীর মতো টলায়মান, — আষাঢ়ের ঘন মেঘ সহসা নিশীথের যবনিকা টেনে দেবে সংসারে। বন্যার জলে ভাসবে, ডুববে সংসারটা। একদিকে করালী গঙ্গা পাড় ভাঙছে, অপর

প্রান্তে তিস্তার ভাঙন। দুই নদীর সাঁড়াশী আক্রমণ। তবু তো নেই নেই করে অভাবের সংসারে তিন পুরুষ কেটে গেল আমার চোখের সামনে। এ যেন ইউরোপের ত্রাসিত বুকে হিটলারের সাঁজোয়া গাড়ির আক্রমণ। **Panzer Division** দেশের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে, রাষ্ট্রের ম্যাপ, জাতির ইতিহাস ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। গোটা ইউরোপ উট পাখির চরিত্র ধারণ করে, ধ্বংসের স্তূপে মুখ গুঁজে শুনছে নিয়তির পায়ের আওয়াজ।

সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গল্পের সলতে পাকাই। জীবনটাকে নিয়ে পাকা ধানের মাড়াই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু জীবনের পারটাই খুঁজে পেলাম না তো! **Shoreless man .Immigrant beings**, ভাঙনের পারে বিহারের মানুষ উদ্বাস্তু জীবন ধারণ করে রয়েছে। অসীম সীমানাতীত বর্হির্বিশ্বে মানুষের চিন্তার আলোকবর্তিকা ছুটে চলে। জ্ঞানের প্রজ্বলিত আলোর শিখা মানুষের মনে। কিন্তু আমার গ্রামে আজও লণ্ঠন—সভ্যতা। সভ্য জগত থেকে দ্বীপান্তরে নির্বাসন। "হেই বাবু, তোর গ্রাম কোথা?"... "ঐ যেদিকে চিল উড়ে চলেছে উধাও দিগন্তে, সেখানে আমার বাল্যের বৃন্দাবন।" পীচের রাস্তা ধ্বংস হয়েছে, রেললাইন গেছে গঙ্গার পাকস্থলীতে। সেখানে আমার গ্রাম, **at the back of the beyond**।

. . . সময়ের পাতা ঝরে যায়। আজও সেই জীবনের পূর্বরাগের স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে বাল্যের পল্লীগ্রাম অবশিষ্ট রয়েছে। হয়তো আমার লেখনীর মনোঃসংযোগ করবার জন্য প্রহর গুনছে। গ্রামের মুখ ভবিষ্যতের তমসায় ঢাকা। ঠাকুর্দার আত্মজীবনী হাতে হাতে ঘুরে হয়রান হয়ে সেই লেখার পাড়ুলিপি এসে পৌঁছল আমার প্রবীণ আকাশে। লিখতে বসেছি সেই অনুপ্রেরণায় — দেখি সেই বীণার তারে আজও বাণী আছে কিনা। কাহিনীর সততা কতদূর রক্ষা করা যাবে জানিনা। কারণ আমার কলম নিজের টিপ্পনী রেখে যাবে ইতিহাসের বাস্তবতার গায়ে। কলম হাতে এলেই সেই আয়না বটগাছে চড়ে বসে সনাতন জগৎ সংসারকে মিছিল করে ফিরিয়ে আনে। তাই কাকে ফেলে কাকে পেশ করব ? কলমের এক আশ্চর্য্য জীবনশক্তি আছে। সেটা স্মৃতির দীপশিখা উদ্দীপ্ত করে তোলে। লেখনীর বিশ্রাম নেই। আমার কানে কেবল সাজ সাজ রব শোনাচ্ছে। উত্থান পতনের ঢেউ আছড়ে পড়ে জীবন সৈকতে।

> **" I hear the sibilation of the waves,**
> **In the welter of times,**
> **The story of man is the soverign refrain,**
> **penetrated with sunshine."**

বৎস, তুমি হর্ষ করো। তোমার লেখা কেউ যদি না পড়ে, থোড়াই কেয়ার। মানুষের ভাষা তোমাকে অষ্টপ্রহর জাগিয়ে রাখবে। দেবী স্বরস্বতী তোমার বাচাল জিহ্বায় আরোহণ করে শব্দের গোলা-বারুদ তোমার হাতে তুলে দেবেন।

তারপরে তুমি ওলন্দাজ, গোলন্দাজ, কিম্বা তীরন্দাজ— সেটা তোমার আন্দাজ ও অভিরুচি অনুযায়ী, ফরমায়েশ করে নিও। শব্দকল্পদ্রুম হাতে ধরে ইতিহাসের পাষাণ-প্রতিমাকে পাথরের প'রে পাথর খসিয়ে নতুন করে হাল ধরো। বাবা বলতেন, "ছেলেটার ধরো ধরো নধর চেহারা। থরো থরো শরীরে আকাশের গায়ে ভরো ভরো প্রাণে চাতক পাখীর মতো তাকিয়ে থাকে। ছেলেটাকে কলসী কাঁখে বেহান বেলায় কাজল দীঘির রাস্তা দেখিয়ে দেব। জল ভরা কলসি নিয়ে ফেরার পথ পাবেনা। ওজনের ভারে পড়ো পড়ো কেঁদে পিছল পথে গড়াগড়ি ক'রে কাঁদা হবে।" কথাটা শুনে প্রাণে বাজ ডেকেছিল। লেখনীর উজানী আলোয় আমার কান্নার ধ্যানমুর্তি হারিয়ে যায়। লেখনী আছে, সেই অবসরে লেখক আছে পরম আশ্রয়ে টিকি বাঁধা,— আশ্রম বালিকা শকুন্তলার মতো।

... তুমি ও বহুজন আমার আর্শী। আমার রূপটাকে একা হাতে মানুষ করতে পারিনি, তাই সেটা বিলি করে দিয়ে নিজেকে দেখছি জীবনের জনপদে। তবে সেই দেখা আমার স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের কর্মফল জমিয়ে তোলা। তাই তো জীবনে হোঁচট খেলেও সেই আয়না অতীতের ভারকে অনায়াসে তুলে নিয়েছে। জ্বরা নেই তার গল্পের বিনুনী পাকাতে। অতুল স্মৃতি - সম্পদ জীবনের কালি দিয়ে আমার হাত ধরে লিখে চলেছে আগামী মানুষের চেনার দৃষ্টি সেয়ানা করতে।

তিন

ঠাকুর্দা হেমচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। কলম বাগালেই মানুষটিকে মনে পড়ে বাগিচার আশ্চর্য মালী চরিত্রে। সময় ও অর্থের ছিলনা অভাব। হাতে ধরে নয়, কিন্তু প্রাণে ধরেছিলেন বনস্পতিকে। "আমি তোমার মালঞ্চের মালাকার।" রবিঠাকুরের দিকে নির্ভর বিশ্বাস কম ছিল তার। জমিদারীর শাণ দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে কবিকে স্থান দেননি জীবনদর্শনে। মেজাজটা ছিল বঙ্কিমী। ঠাকুর্দাকে আইনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মোকদ্দমা চালাতে হতো। বাড়ীর পশ্চিম দিকে বিশাল কাঁঠাল গাছ বাড়ীটাকে ছত্রছায়ায় ঢেকে রেখেছে। কাঁঠাল তলায় গেলেই অনেকের মাথায় সেই গাছ কাঁঠাল ভাঙছে। বাড়ীর আধমাইল দূরে গাছের আগ্রাসী শিকড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাগানে ডালিম গাছ, যার ফুল ঠাকুর্দার দিবাস্বপ্নে রঙীন ফাগ মেশাচ্ছে। আর বাতের শরীরে সুখের মলম বুলিয়ে দিচ্ছে। সারি সারি ফলন্ত পেঁপে গাছ। পেঁপের গায়ে ক্যাল্‌সিয়ামের সুঁই দেওয়া হত। হেমচন্দ্রের ফটো আছে পেঁপে গাছের সামনে আবির্ভাব। ফোলা ফোলা চেহারা, তাকিয়ার মতো শরীর।... বাড়ীর পূর্বদিকে আমার তরুণ পা ছুটে চলে। সেখানে পেয়ারা গাছ— বড় বেয়ারা তার বেড়ে ওঠা। সেখানে

আছে গোলাপ ফুলের কেয়ারী। যৌবনের ভার ধরে রাখতে পারছে না, লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে পাপড়ি। সেখানে উঁচু করে সিমেন্টের গোল বেদী তৈরী হল। পাঁচ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মা সবে নববধূ হয়ে এসেছেন শ্বশুরবাড়ীতে। সকলে নাম রাখল নতুন কাকিমা। সেই নাম পরিবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আজ কোজাগরী পূর্ণিমার শতদল ঢল নেমেছে। মা বেদীতে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছেন, "অয়ি বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম সভী, আজও পড়ে মনে মোর .....।" দিলীপ রায় তখন সযত্নে মেয়েদের মনে তোলা থাকত। দিলীপ রায়ের যেমন সুদর্শন চেহারা, তেমনি তার প্রেমময় সন্ন্যাসলীলা। ঠাকুর্দা গড়গড়ায় ভুড়ক ভুড়ুক ভড়ং করছেন। মনে মনে বেয়াই মশাইয়ের সাথে বচসা করছেন। "কেমন দেখছেন, বেয়াই মশায়, তোমার মেয়ে আমার বাঁশবনের শেয়াল রাজ্যে বেমানান ঠেকছে কী ?"

আবার আয়নার গায়ে রুমাল ঘসে সময়ের ধূসর প্রলেপ মুছি। বয়সে শরীরটা ভারী হয়েছে যদিও, স্মৃতির কলমে চরণ লঘু রয়েছে। অতীতের দিকে ফিরে দেখা, এক বিলম্বিত মায়ার টান চোখ প্রসারিত করে পেছনের জগতকে অশেষের ধন করে ভরে রেখেছে। যখন সময় ছিল ফিরে তাকাওনি কেন? উত্তরদিকে বাড়িটা পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দিনের অন্তিম আলোর রজনীগন্ধা, হাসনুহানা, কেয়া আর ম্যাগনোলিয়া ফুলের বিজয়মাল্য যেন চক্ষুহীন ছায়াপথে আলিঙ্গন করতো সারা বাড়ীটা। রাতের নিদ্রার বুকে একটা স্বপ্নের কুঁড়ি ফুটে উঠত। একটা আর্শ্চয্য সুন্দর ফুলের উদ্দাম সৌরভ সারা সংসারকে বৈকুণ্ঠের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে স্বপ্নের মসনদে বসিয়ে। চোখের পরে ঘুমের কাড়াকাড়ি শুরু হওয়ার আগে, **H.M .V** কোম্পানির কলের গান সারা সন্ধ্যা শোনা যাচ্ছিল। — "নীল যমুনার তীরে, রাধা কাঁদার সুরে ...," কিংম্বা সিরাজদ্দৌলা পালার রেকর্ডে বাজছিল সিরাজের পলাশীর যুদ্ধে যাওয়ার আগে বিলাপ, "আলেয়া, আর যদি না ফিরি ? " সকলের মনের মেজাজটা ছিল **patriotic**। মেজাজটা একটু গোলাপী রোমান্টিক প্রগলভতার দিকেও ঢলে পড়েছিল। কার গলায় মালা পড়াই, কার বুকে প্রাণের দহন জুড়োই গোছের সতৃষ্ণ প্রশ্ন মনের কোণে আল্পনা কেটে যাচ্ছিল। নিজেকে কবুল করবার এক **confessional** বাতাবরণ সেই গাঁয়ের নিশীথে কোন রূপকবাসিনী নিশীথিনী প্রিয়ার ছায়াপথ ধরে বেড়া ভাঙবার চেষ্টা করছিল। ঠাকুর্দা কেবল জড়িবুটি নয়, মনেরও মালাকার ছিলেন। কিন্তু ধুতির কোঁচা নিভাঁজ রাখতেন, আবেগের আতিশয্যে আলুথালু ধুতি ভুঁড়ির নীচে কখনো দেখা যায়নি। তীক্ষ্ণ সংসার বুদ্ধি, আর বাগিচার আণাচে কাণাচে মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের মন্ত্রগুপ্তি।

(এত কথা বুঝবার মতো রস আমার তখন বয়সের গুঁড়িতে গজায়নি অবশ্য। এতই ছোট ছিলাম সংসার সীমান্তে, কমা, ফুলস্টপের আকারে)। আমি সেদিনের সন্ধ্যায় লন্ঠন জ্বালিয়ে ইতিহাসের অন্ধগলিতে হাতড়ে বেড়িয়েছি। অবনঠাকুরের

"রাজকাহিনী" পড়ে কান্নার জলে চোখ ফুলে উঠল। সেই সব চরিত্র — গোহ, গায়েব, গায়েবী। লণ্ঠনের আলোর আড়ালে আঁধার পৃথিবী। রাজপুত ইতিহাসের আত্মত্যাগের বীর রসের করুণ স্বর আমার দুই কানে বাজছে। সাচ্চা ইতিহাস আছে কিনা জানিনা। সেদিনের হাতেখড়ি আমার অক্ষয় হয়ে থাক।" **There is no history, but the journey of man's soul "**। অবনঠাকুরের হাতে আত্মার গুটিপোকা ইতিহাসের জাল বুনে চলেছে। **Nietzshe** বলেছিলেন," **there are no facts, only interpretations**।" জীবনকে সম্পূর্ণ জানা মানুষের অগম্য।

সেই আয়নার শরীরে আমার দুঃখ-ভালবাসাকে আঁকড়ে ধরতে চাই। সেও এক রাত ছিল! মা ও বাবার কোল কাড়াকাড়ি করে শুয়ে আছি। বাবার নাসিকা গর্জন অসীম আশা আকাঙ্খা নিয়ে সা, রে, গা, মা ভাঁজছে , তুঙ্গস্থ ত্রিতাল শুনিয়ে, ভেঙে পড়ছে ভাঙা বাঁশীর মতো।পুরুষরা একটু গগনবিলাসী। মা সারাদিন পরিশ্রম করে আমার বুকে হাত রেখে ইষ্টনাম জপ করতে করতে ঘুমে কাদা হয়ে পড়েছেন। আমার চোখে ঘুম ফাঁকি দিয়েছে। টিনের চালে পায়রার নখের আওয়াজ তীক্ষ্ণ স্কেলে কানে বাজছে। ঘরের ঘুলঘুলিতে ওরা বাসা বাঁধে। একবার ডান, একবার বাঁ পায়ে দাঁড়াচ্ছে। ঝিঁঝি পোকা, বাতাসে শেয়ালের ডাক, শ্যাওড়া গাছের পেত্নীর সাদা শাড়ী, চোখ ও কানের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে ।**All ghosts' night**। বাবার গায়ে পা তুলে দিয়ে কোলবালিশ করে বাঁদরছানার মতো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছি জানলার দিকে। বুকের ভেতরে বিপদের ঝাঁপতাল বাজছে। এমন সময় বাড়ির উত্তরদিক থেকে এক চোখ ধাঁধানো আলো খোলা তরবারির মতো ঘরে এসে পড়ল। তার রুষ্ট ভয়াল শিখা এ ঘর, সে ঘর, সারা বাড়ী ছোটাছুটি করছে। **Can light be more sinister than darkness** ? সারা বাড়ী জেগে উঠে সরগরম হয়েছে। প্রত্যেকটা ঘরে একটা বল্লম থাকত। বাড়ীর সেপাই আর লেঠেলরা হাঁক ডাক শুরু করল। কলের গান আবার সবাক হয়ে উঠল — যাতে কেউ ঘুমিয়ে না পড়ে। উত্তরের মাঠে ভিন গাঁয়ের ডাকাতরা এসেছে। শিকারের টর্চ (চার ফুট সমান লম্বা) জ্বেলে দেখছে গৃহী জেগে আছে কিনা। নইলে কচুকাটা করে রেখে যাবে সকলকে। ভোরের দিকে বিপদের কালো মেঘ পিছু হটে সরে গেল। রেখে গেল গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এক অশনি সংকেত।

ভয়ের রাত কেটে গিয়ে পরের দিন সকালবেলার মুখটা কত নির্ভয়, শুভ্র সমুজ্জ্বল। আজও প্রতিদিনের নিয়ম পালন। মালি এসে সাজি ভরে তাজা গোলাপের তোড়া রেখে গেল বড় কর্তার শোয়ার ঘরে। ঐ যেদিকটাতে কাল রাতে ডাকাতের দল কালো মেঘের ভিড় জমিয়েছিল, সেই উত্তরের বিশাল ডাঙায় ভয়ের ভ্রুকুটি নেই। আছে ভোরের স্তিমিত আমেজ, আর স্বচ্ছন্দ বাতাস। ঘুম ভেঙে জেগে উঠে উত্তরের দোতলা বারান্দায় দাঁত মেজে মুখের জল কুলকুচি করছি। পিচকারীর মতো

মুখের জল কতদূর ফেলা যায় ? ভারি দিয়ে তোলা জল অবহেলায় অপচয় হচ্ছে। এখানকার জল নোনা ভরা নয়, প্রাণ ভারী করেনা। কিষণপুরের জলে পেটের ব্যামোর ভীষণতা নেই। মিষ্টি স্বাদের যষ্টি মধু যেন, আজলা ভরে পান করলে আয়ু বেড়ে যায়। এতক্ষণে বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন শুরু করেছেন। ওনার দাঁতগুলি ডালিমের দানার মতো। হঠাৎ কানে এল একতলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে দশটি গলা হরিসংকীর্তন শুরু করেছে। ছুটে গেলাম দক্ষিণের দোতলা বারান্দায়। নীচে উঠোনে তখন অচেনা মুখের ভিড়। সমস্বরে ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! বাড়ির লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে বটে, তবে ফিরেও তাকাচ্ছেনা। আমার দুই গালের অবশিষ্ট জলের সম্বল অর্বথ্য নিশানায় ছুঁড়ে দিলাম সেই দিকে। বাবা এসে বললেন," ওরা কে জানিস ? আমাদের গ্রামের ডাকাতদল। গ্রামে পুলিশ এলে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। চর এসে খবর দেবে টিকটিকি সরে গেছে, তখন এরাও ফিরে যাবে। জমিদারের বাড়িতে পুলিশ ঘেঁযে না সচরাচর।" বাবা এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "কেন, কেন, কেন,.... রেকারিং ডেসিমেল চালিয়ে যাচ্ছ ! এত প্রশ্ন করা বড্ড খারাপ স্বভাব। ওদের সঙ্গে শলা হয়েছে, অন্য গাঁয়ের ডাকাত পড়লে এরা আমাদের রক্ষা করবে। এরা আমাদের বন্ধু।" এই কথা শুনে শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল আমার। রাতে দস্যু, দিনে ডাকাত, বাবা কাকারা ডাকাতের স্যাঙাত, তবু তো কয়েক পুরুষ সময় কেটে গেল, গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।

তাই আজও সেই আয়নাতে আমার ঝড়ের মুখ দেখি। **Now the autumnal hairs are spread on my head, which the loud world winds find well to disturb.** মুখের চেহারা আমার ডান দিকের বেহেড়ের ডাকাতের মতো নিয়ম শৃঙ্খলাহীন। বাম দিকের মুখশ্রী বিধাতার **left handed trearment** পেয়েছে — বঙ্গসন্তানের র‍্যাডিকল মেজাজ, অথচ **revisionist** স্বভাব। ডাইনে বাঁয়ে উভয় সংকট। ঠাকুর্দ্দার মেজাজ ছিল কড়া তামাকের মতো। বাবার স্বভাব ছিল খেলার মাঠে গোল সন্ধানী **opportunism** । কিন্তু সংসারে **fair game** খেলে গেলেন। জমিদারীর টইটম্বুর গোলা ভর্তি ধানের বেশীদিন ঋণী ছিলেন না। অকালে চলে গেলেন। গ্রামজীবনের সবুজ প্রাণ তরুণ সমাজ অন্ধ হয়ে গেল। **The flower of dashing youth has perished** । আজও সেই মুলুকে অতীতের বালুকাবেলায় আমার বিশেষ পরিচয় বিজয়বাবুকা বেটা। এপার ওপার খেয়া পারাপার। বাবা বলতেন, " সলতেটা একটু জাগিয়ে তোলো। খুশীমতো চলো। **Great boxers die, when they are punching best** ।" উত্তুরে শীত, বাহাত্তুরে বুড়ো। সে পথে পা মারালেন না।

চার

.....কলম ও সেই আয়না। অতীতের সঙ্গে সেতুবন্ধন করে চলেছে। কাছারী ঘরে ঝুলানো কবেকার ঘরজোড়া টানা পাখা আজ আবার দুলে উঠল। আজ হেমবাবু এজলাসে বসবেন। কাছারী বারান্দায় প্রজারা তক্তপোশে বসে গামছা দিয়ে ঘাম মোছে আর গায়ে বাতাস করে। সামনে সবুজ চওড়া মাঠ, বেড়া দেওয়া গাছের সারি চারধার ঘিরে আছে। আরো লোক আসছে, গরুগাড়ী চড়ে, পায়ে পায়ে লাঠি হাতে। কারো গামছায় মুড়ি চিঁড়ে বাঁধা, বিলম্বের ক্ষুধা মেটাতে হবে। একটা ছোট-খাটো জনারণ্য। বাড়ীর সামনে সদর রাস্তায় দুই ধারে ইউক্যালিপটাস গাছ। এক মাপা গোছানো পারিপাট্যের ছাপ চোখে পড়ে। সেটা যত্নের পারিপাট্যের জন্যই হোক, অথবা জমিদারীর স্বাচ্ছন্দ্যের দরুণ। কালটা ছিল অনেক আগে, আমার কৈশোরের গোড়ার ছবি। আমার হাঁটা তখন ছিল বাঁকা, পায়ের দুই পাতা বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকত। পদ-স্খলনই ছিল শৈশবের চলার ছন্দ। বুদ্ধি ছিল ঝাপসা, কিন্তু নবীন শরীরে স্নায়ু ছিল সতেজ। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর আলো পান করতাম। আজও সেদিনের পায়ের ছাপ ঘাসের বুকে দেখতে পাই। .... কাছারী ভর্তি লোক। খাজনা,নালিশ, মামলা, মোকদ্দমা, দশ ঘা বেত, পাইক, বরকন্দাজ,দলিল, দস্তাবেজ, ক্ষেতী, পালা, পার্বণ, দেনাপাওনা, আদব, বেয়াদব,বেওকুফ, খাজনা মকুব ...., ইত্যাদি কত কী ভারী ওজনের আক্কেল গুড়ুম কথাবার্তা, শব্দের গোলা বর্ষণ হল তার হিসেব সেদিনের বালকের কাছে চেওনা। আমি শুধু সেই ঘরে আড়ি পাতি, আর ঠাকুর্দার আরামকেদারায় বসে সঙ সাজার ছবি আঁকি মনে।

এজলাস ভাঙল। প্রজারা দুঃখে সুখে কান্না ও হাসির সঞ্চয় নিয়ে গেল ফিরে। কাছারি ঘরটা এবার বিদায়ী দিনের পতিত ভূমি। এজলাস ভাঙলে বসতে গেলাম ঐ সিংহাসনে। কিন্তু হায় আমার আগে বাবা দখল করেছেন সেই আসন। বাবার **Capstain** তামাকের কৌটো টেবিলে রাখা। দৃশ্যের পালাবদল হল। বাবার এজলাস শুরু হয়েছে অন্য চরিত্রের। হাটে বাজারের সন্ধানী মীমাংসা সেখানে ঠাঁই পায়না। খেলার মাঠ সেই বৈঠকের মর্মস্থল। সবুজ অবুঝ মন পায়ের নিশানায় গোলাকার বলকে গোলকধামে পাঠিয়ে হাততালি কুড়িয়ে নিতে চায়। ফুটবলের গুলতানী আর চায়ের জন্য চাকরের পেছনে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কিষণপুরের ফুটবল টিম বাবাকে ঘিরে আছে। বাবার পেটানো শরীরের গঠন, প্রকৃতির হাতে যত্নে গড়া খেলোয়ারী ভাঁজ। খেলা জেতার আলো চোখে মুখে। ক্যাপস্টেন সিগারেট ঠোঁটে ধরে একটা কাপ্তানী ভঙ্গী। ঠোঁট আর হাতের চেটো আশ্চর্য্য লাল, যেন আবীর মেশানো। উঠতি খেলোয়াড়রা তাকে নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো ঘিরে রয়েছে। ওনার গোঁফ তীক্ষ্ণ করে সযত্নে কামানো, থিয়েটারী টান-টোন আছে।... ক্রমে ক্রমে দিনের পিঠ সূর্যাস্তের

আড়ালে গুড়ি মেরে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু কাছারী ঘরের ছুটির অবসর নেই। অন্য জনতা চওড়া তক্তপোশে ভীড় জমাল এবার। গ্রামের থিয়েটারের দল। এরা খেলার মাঠে কঠিন কাজে ব্যথা পায়। রসের আসরে নরম জমিতে শোভা পায়। মাথায় বাবড়ী, নয়নে চোরা চাহনী। কাছারির দেওয়ালে চিতা বাঘের ছাল জুড়ে আছে, মুখের দাঁত বার করা, চোখদুটি জ্বলছে। গ্রামের পালা পার্বণের মাস আসছে, থিয়েটারের ঢাক গুড়গুড় কানে বাজছে। বাবা আবার মধ্যমণি।

কিষণপুর গ্রাম থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে বংশের আদি বাড়ি ড্রিল্লী দেওয়ান গঞ্জে। ফুলবর নদীর পাড়ে উঁচু জমিতে ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভুবনচন্দ্র রায়ের কালে তৈরী হয়েছিল সেই বটবৃক্ষ। আমাকে নিয়ে পাঁচ পুরুষ কেটেছে সেই গাঁয়ের আসমানের তলায়। রাধা কৃষ্ণের কূল বিগ্রহ সেখানে আজও পূজো পায়। অতীত সেখানে ঈশ্বরের দিকে উর্ধ্বে হাত বাড়িয়ে কৃপা ভিক্ষা করছে। কিষণপুরে ঠাকুরদার নামে বাড়ি হেমকুঞ্জ।' সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখে দৃষ্টির ডানা মেলে দাও দিগন্তের খোলা জানালায়। মনের কল্পনা বল্গাহীন হয়ে ছুটে চলবে। দূরে কুমেদপুর স্টেশন। ট্রেনের ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে নীল আকাশে ছবি আঁকছে। অতদূরে দৃষ্টি মেললে মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে ওঠে। স্টেশনের আনাচে কানাচে আছে ড্রিল্লী দেওয়ান গঞ্জ। পথের মাঝখানে জমিদারীর কামাথ। অর্থাৎ **farm house** । উধাও দিগন্তের মাঝখানে সোনালী ফসল। ধান, পাট, কলাই, ভুট্টা, আখ তুলে গোলায় ভর্তি করা হয়। কামাথের কথা কানে এলে ছুটির ঘণ্টা প্রাণে বাজত। গল্পের রাজপুত্রের হংসমুখী শ্বেতকল্পনা গরুর গাড়ি চড়ে চড়ুইভাতি করতে বেড়িয়েছে। তাল তমাল বনরাজি যেখানে নীল দিগন্তে গিয়ে মিশেছে সেখানে আলো ছায়ার খেলা, মেঘের মেলা, বাতাসের করতালি। সেখানে ছিল ভাঙা পথের রাঙা মাটিতে আমার ধূলার সিংহাসন। উধাও দিগন্তের তলায় চোখ বেঁধে প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে কানামাছি খেলা। আকাশে শ্রাবণের স্বরবিতান আমার কানে মন্ত্র পড়ছে। পুঞ্জ মেঘের পাহাড় জমেছে মুক্তাঙ্গণে – **vast Olympiad of clouds. Fullest utterance of nature** । এতটা বোঝবার মতো মনের হজম শক্তি তখনও হয়নি। তাই অবাক বিস্ময়ে হয়েছিলাম বোকা। **Of such nuturings of earth the past was born**। সেই আয়নাকে ইঁট-কাঠ পাথরের শহরে, লোহার শিকলে আজ বেঁধে রেখেছি। তাই লিখতে গিয়ে গ্রামের তন্দ্রা ভেঙে গেল। মনে এলো পিচের শহরের নিচের কবিতা।

Birds' morning carouse,
the leefy oratories of plant life,
anthem of stars at night,
- all these I leave back ;
sin's pack horses have come,

fast I travel to the city,
back where life lives dangerously,
and the fat is on fire,
... the morning champaigne dew
vanishes as dream.

ইতিহাসের মৃত্যুর শিয়রে বসে আয়নার শুকনো চেহারাটা আমাকে তিরস্কার করছে। ধিক্কার দিয়ে বলছে,

" Footfalls echo in the memory,
down the passage we did not take,
towards the door we never opened
into the rose garden. (Eliot).

একবার দেখেছিলাম গাঁয়ের রাস্তায়।- **Cow licking the calf, and when the mother kisses her child, the entire world kisses him** ।সেই দিনটা আজ মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। গ্রামের বাইরে মিটার গেজ ট্রেনের **picture post-card** রেলস্টেশন, আজ সেটা গঙ্গার জলের ক্ষুধা মেটাচ্ছে। ফিরে দেখার সৎসাহস আগে কখনো হয়নি।

And time yet for a hundred indecisions,
and for a hundred visitations, visions, and revisions,
before the taking of a toast and tea ...
and indeed there will be time
To wonder,"do I dare, do I dare?"
time to turn back and descend the stair. (Eliot)

জীবনের সিঁড়ি বেয়ে অবতরণ। সেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে কানে বাজে সময়ের ভোঁ দৌড়। **Shadow of shadows**, এই আমার লেখা। আয়নার ছায়াকে কলমের মসী দিয়ে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি গড়ি। ছায়া হতে ছায়ান্তরে চলেছে শূন্যতার গহন রহস্য। কলমের কোলাহল থেমে গেলে বাড়ীটা আজকাল একলা খাঁ খাঁ করে। দ্বিতল বাড়ীর সবকয়টা ঘর খালি। নিস্তব্ধতা থৈ থৈ করে। যে ঘরে বাল্যজীবনটা বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে ভোরের আশায় এক চিলতে আলোর প্রতীক্ষা করত, সেখানে আলসে দিনগুলি অনবসরের উজান ঠেলে আর ফিরে আসেনা। ঠাকুর ঘরটা অলীক অন্ধকার ঠেকে, যেখানে একসময় সংসারটা কতই না মাথা ঠুকেছে। ফসলের গোলা শূন্য। মানুষেরা নেই তবুও কলমের হাওয়ায় ফানুস ওড়াচ্ছি শূন্য বন্ধ্যা অতীতে। মানুষের পথিক ইতিহাস। কলমের ছুটি নেই। লিখি কেন ? নিজেকে ভোলাবার জন্য। কলম স্তব্ধ হলে অতীতের বুকফাটা হাহাকার কানে আসবে, "নেই, নেই, নেই!" ণত্ব ষত্ব ভুলে কেঁদে উঠবে, "বাবা"। ধ্যানের আসনে বসে নাকের ডগার বাইরে দেখ, সমস্ত পৃথিবী টপাস্ টপাস্ করে চোখের জল ফেলছে। কান্নার ওড়ণা

সরিয়ে দাও, দেখবে পৃথিবীর একভাগ মাত্র স্থল দুঃখের সায়রে ভাসান হয়ে গেল। সেই শোকের ভাষাকে চাপা দেওয়ার জন্য কলমের তাল ঠুকে চলি, সেই তাল আয়নার সামনে ঘুরে ঘুরে এসে সমে ঠেকে। যতদিন লেখা দিয়ে অক্ষরের কালো শরীরে জীবনের ভাস্কর্য খোদাই করে চলা যায়, ততদিন আরব্য রজনীর পিদিম হেমবাবুর দ্বিতল বাড়িতে বহু কক্ষে ঝলমল করবে। পালে হাওয়া নেই, তবুও অতি কষ্টে কলমের বৈঠা বেয়ে চলা।

আজকের কাহিনী অজগর সাপের মতো আমাকে কতদূর লেজে খেলাবে বোঝা যাচ্ছে না। আজ অফিসে যাওয়ার পথে গাড়ীতে বসে পার্ক স্ট্রীটের ভিড়ের রাস্তা কায়দা করতে করতে মনে উদয় হল গল্পটা এক রূপকের সন্ধানে বেড়িয়েছে। যে রূপকের খাতায় হেলান দিয়ে তর্কাতীত স্থির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। একটা পাকা বুদ্ধি রূপক, যেটা কেউ ভুল করে ধোপার খাতা ভেবে ধাপায় পাঠাবেন না। বাড়ীতে বিবেকানন্দের ফটো আছে, বুকের ওপর দুবাহু ভাঁজ করে হুঁশিয়ার উদ্ধত ভঙ্গীতে জীবনকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। রজোগুণী সন্ন্যাসী রাজা। আমিও একই পোজে সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি। জীবনে টুকে পাশ, বেশ করেছি। আমি পুরুষসিংহ। সিংহের রজোগুণে পাপের তামসিকতা নেই। যেদিন টোকাটুকি ছেড়ে যাব, সেদিন টুকিটাকি সংসারকে থোরাই কেয়ার করব। একবার চিত্ত যদি তিতিবিরক্ত হয়, একবার মনটা যদি অন্য দিকে পাশ ফিরে শোয়, তাহলেই বিছানার পাশবালিশটা ভগবৎ প্রেমে গদগদ হয়ে উঠবে। অথবা তীব্র বৈরাগ্যে ছটফট করতে করতে **Schopenhaur** এর ফিলজফী বই হাতে ধরে স্বেচ্ছায় কযাইয়ের ছুরীর তলায় গলাগলি করবো। সেই রূপকটা কি **sands of time** ? কলস ভরা জল উপুড় হয়ে পড়েছে, জীবনের সঞ্চয় সময়ের স্রোত বেয়ে ব্যয় হয়ে চলেছে। গঙ্গার স্বভাবটা হাঙরের মতো, আশেপাশের গ্রামকে কখনো মুড়োতে কাটছে, কখনো লেজে। ভাগীরথীর ঢল নামার আগেই সেই আয়নাকে দূর্গাপ্রতিমার মতো কলকাতায় তুলে আনা হয়েছিল। পাঁচ পুরুষ আগে বঙ্কিম রায়ের নাম খোদাই করা প্রকাণ্ড পিতলের জাম বাটি নিয়ে এসেছি এবার টুকরো স্মৃতি বহন করে। একটা ছোট শিশুকে বসিয়ে দেওয়া যায় সেই বাটিতে। পশ্চিম ঘরের সিন্দুক বহু বছর পরে আমার হাতে খোলা পড়ল, জেঠিমার আঁচলের চাবি ঘুরিয়ে। কেন জানিনা সেটা খুলে দেখবার রুচি বংশের কারোরই হয়নি। সে কি অবহেলা, না অভিমান ? সিন্দুকের ভিতর একটা সুদীর্ঘ কাল চাপা পড়ে আছে। ফেলে আসা দিনগুলির অবশিষ্ট বৈভব সামান্যই। আজকের প্রলেতারিয়েত বংশধরেরা হাতে ধরতে চায়না। তাছাড়া সিন্দুক ভরা ভারী পেতলের বাসন ফ্ল্যাট বাড়িতে তুলে নিয়ে এলে হাল আমলের সংসারের ফাটল বড় প্রকট দেখায়। যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। আকারে প্রকারে, আচারে ব্যবহারে চাহিদায় আমরা ছোট মাপের হয়ে গেছি। আমাদের পিপিলিকা জীবনে অল্প

খাওয়াটাই আজকের মূল্যবোধ। জাঁক করে বলি," ভাই দিনে একবাটি ভাত, রাতে দুটি রুটি খাই। ডাক্তারী মতে একটা **safety zone** এ থাকি।"

পাঁচ

অথচ দিনকাল অন্য রকম ছিল আগে। বাড়ীতে বিয়ে লাগলে গ্রাম উজাড় করে খাওয়ার পাত পড়ত। ভিয়েন বসত বাড়ির বাগানের গায়ে। বাড়ীর ভেতরেও উৎসবের জন্য ছিল তিনটে আলাদা রান্নাঘর। আগুন জ্বলছে মাটির ভেতরে গর্ত করা উনুনে। আগুনের লাল চোখে গনগনে খিদে। ধানের ক্ষেতের লালচে রঙের মোটা চাল মোটা বসনের মতো আমজনতাকে মুষ্টিখোলা আনন্দ দিত। গাছের তলায় রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা, তারই পাশে ঠেলাঠেলি করে, পিঠোপিঠি খাওয়া হচ্ছে। যে মাটিতে চাষ করি সেই মাটিতেই খাই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। কষে খাচ্ছি, খাওয়ার ছন্দটা গোগ্রাসে। এরা কারা ? গ্রামের প্রজারা, চাষীরা বসেছে সারি সারি। কয়েক মাস আগে থেকেই খাওয়ার গন্ধ গ্রামের আকাশে। বাতাসে নাক পাতছিল সবাই, গ্রামে একটা বিয়ে লাগতে যাচ্ছে।"পরাণের ভেতরটা হাঁচোর পাঁচোর করত্যাছিল কর্তা", এক মুসলমান প্রজা শুনিয়ে দিল। সোনা মুগের ডাল, ভাজা, রুই, কাতলা, খাট্টা খোট্টাই দই, মুড়কী। মিষ্টির নাম খাজা, যেটা পাতে দিলেই পিঁপড়েরা হত্যা দেয়। ছোট পিশেমশায় বাঘের মতো ভাঁড়ার আগলে বসে আছেন। রোজ সকালে চব্বিশটা ডিমসেদ্ধ খেয়ে প্রথম কথা বলেন,"জীবনটা গোল্লায় গেল"। আমরা পঙ্গপাল ভাইয়েরা পরিবেশন করছি। পিশেমশায় **code language** এ নির্দ্দেশ দিচ্ছেন,"টিপে টিপে দাও," অর্থাৎ ভাঁড়ারে উদ্বৃত্ত আছে, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। সকলে আবেদন করছে, হাতা খুন্তি ফেলে দিন, খাবারের হাঁড়ি, কলসী, ঝুড়ি যা আছে পাশে রেখে যান, কষ্ট দেবনা বাবুদের। পিশেমশায়ের হুকুম শোনা গেল,"খাবার রিপিট করো, ডিফিট হয়ো না," অর্থাৎ কিনা সমঝে চলো, একটু সযত্নে হাতটান করো। শেষবারে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন," ওরে তোরা ঢেলে ঢেলে দে!" অর্থাৎ কিনা ভাঁড়ার শূন্য, **every body march back**। অতিথিরা ততক্ষণে গলাভর্তি খেয়ে বিশাল জালার মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। এক খাওয়াতেই বাজিমাত।

... সেই আয়নার গায়ে ট্রেনের ধোঁয়া ভেসে উঠল কেন ? ও হরি, বরযাত্রী আসছে কলকাতা থেকে। আশার মালা জপ করতে করতে। জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ে। ঠাকুর্দ্দা চিঠির পাতায় হিসেবি বুদ্ধি মিশিয়ে বংশানুক্রমিক বাঁশবনের রাজত্বটাকে মুখরোচক করে তুলে দিয়েছেন বকুলবাগানে বোনের ভাবী শ্বশুরকুলের হাতে। সেখানে তারা ভাবছে, "আহা, কী কুলমর্যাদা! কখনো চাকরী করে গতর নষ্ট করে

না। বাড়ীর খায়, দিনে দুপুরে তোফা নিদ্রা যায়। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ"। আশা ভরা একটা লম্বা দম বুকে টেনে বরযাত্রীর দল শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে চেপে রওনা দিল। রাত ভোর হলে ট্রেন এসে পড়বে "তিন পাহাড়ের" মাথার ছায়ায়। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সাহেবগঞ্জ জংশন। সেখান থেকে বালিতে পা ডুবিয়ে যাওয়া গঙ্গার ষ্টীমার ঘাটে। আগের দিন আকাশফুঁড়ে পানি এল, তাই বালিতে কাদাতে পায়ের তলায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে পা টেনে তুলে কাদার কাছ থেকে দখলদারি নিতে হচ্ছে। কুলি মালের বহর দশভূজা হয়ে তুলে নিয়ে বোঝাই বজরার মতো কাদার বাঁধন ছিন্ন করে ছুটে চলেছে স্টীমারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। স্টীমারে জায়গার সংকুলান বড় কম। ভোর সকালে এমন কর্মব্যস্ততার জন্য মনটা প্রস্তুত নয়। ঘুম না ভাঙতেই **100 meters dash**। এদিকে কাদার সঙ্গে নিজের লড়াই, ওদিকে কুলীসর্দার যাত্রীর জনতাকে ছেড়ে দলছুট হয়ে হারিয়ে গেল। জান রাখি, না মাল রাখি? ওদিকে মান সম্মান জলাঞ্জলি। কার গৃহিণী কার কর্তার কাছার খুঁট ধরে "ওগো শুনছো, ওগো শুনছো" ডাকে অরণ্যে রোদন করছে, আর নিজের বিপুলভার ধারণ শক্তিকে ধরে রাখতে চাইছে তার হিসেব করার সময় কোথায়? কর্তা বিহারী কুলির টিকি লক্ষ্য করে একই জায়গায় কাদায় দাঁড়িয়ে ছোটাছুটির মোটামুটি **slow motion** নাটক করে চলেছেন। পার্কস্ট্রীট মার্কা এক সুবেশা মহিলা চলেছেন দার্জিলিঙে। কিন্তু কাদার পায়েসে মাছির মতো লটকে আছেন। **Tongue lashing** শুরু হয়েছে, ভাষার চাবুক ছুটছে। ইংরেজি বুলি ভুলে গিয়ে নির্ভেজাল বাংলা কথায় ইতর ভষণ। মাতৃভাষার অগ্রাধিকার। স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলি হার মেনে যাবেন। " দূর শ্লা, নিকুচি করেচে, দার্জিলিঙের মাথায় লাথি মারি। ঐ যারা যাব যাব বলে খাবি খাচ্ছে, সবকয়টা পাঁঠা, তস্য পাঁঠা " এত ক্লেশ কেন? কারণ এপারে বাংলা, ওপারে বিহার, মধ্যিখানে গঙ্গা। এপারে যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্মব্যস্ততা চলেছে।

আমাদের বরযাত্রীরা উথালি পাথালি করে স্টীমারে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। স্টীমারের সারেঙ খবর পেল এরা হেমবাবুর বড়ছেলের মেহমান। গলায় গামছা বেঁধে ছিটকে ছুটে এল," কর্তা,কর্তা, কি চাই বলো, কী তব বার্তা ? জামাই বাবাজী বিয়ে করতে চলেছে ? আমারও নিমন্ত্রণ আছে সেথায়। ওপরের ডেকে তোমাদের জন্য গার্ডেন চেয়ার পেতে দিচ্ছি। গঙ্গার হাওয়া খাও, ডেকে বিহার করো। গঙ্গাজল ফুটিয়ে চা তৈরী হচ্ছে, গুড় মিশিয়ে। খেলে চিত্ত শুদ্ধি হবে।" সব ভাল যার চা ভাল। কিন্তু চায়ের বর্ণণা শুনে বজ্রাঘাত হলো যাত্রীদের কানে। স্টীমারে একতলা ফেটে পড়ছে ঘর্মাক্ত মানুষের ভীড়ে। স্টীমার ছেড়েছে, প্রভাত তপন আঁধারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে দৃষ্টি শানাচ্ছে। ঐ সেই আয়না স্টীমারের ঘাটে, সূর্য যেখানে ওঠে, পাটে যায় ওপারের ঘাটে। কেউ জানেনা, কিন্তু আমার বোবা অতীতটা

সেই জল-যানের রেলিং ধরে তাকিয়ে আছে ওপারের গ্রামের দিকে উটের মতো মুখ তুলে। আমি এক অদৃশ্য যাত্রী, বিনা টিকিটে অতীতের হাত ধরে অদৃষ্টের ফ্রেমে আমি নেগেটিভ ছবি। জল নিয়ে লোফালুফি চলেছে স্টীমারের চাকায়। ঐ জলোচ্ছ্বাস! **"I ask the ocean, what is your language? Eternal questioning. I ask the sky, what is your language? Eternal silence."** (রবীন্দ্রনাথ) মাঝখানে যাযাবর প্রাণ।

... ক্রমে একটা স্তব্ধতা জমিয়ে আসছে সকলের মনে। "স্টীমার ধরা চাট্টিখানি কথা? ধরি, ধরি, কিন্তু ধরিতে নারি। ধার দেনা করে এসেছি বাপু, শেষে পারাপার না করেই ফিরে যাব?" "টুকরো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। **"While in Rome, behave like Romans**। যস্মিন দেশে যদাচারঃ।" এক বাঙালী সাহেব ঘোষণা করলো। পার্ক স্ট্রীট মার্কা শ্রীমতী বলে উঠলো,**'You must admit there is romance in the atmosphere**।" গঙ্গার বাতাসে মহাপ্রাণী খইস্যো আসছে। "আসল কথা প্রগতি ফ্রগতি কিস্যু নয় ব্রাদার, নিয়তি যেমনি রাখবে। কত মুনি এল, কত ঋষি চলে গেল গঙ্গার ঘাট থেকে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ল না।" সিগারেটের কুটিল ধোঁয়া ছেড়ে আরেক যাত্রী সকলকে বিজ্ঞ করে তুললো। ইতিমধ্যে দেখা গেল গঙ্গাজল ফুটানো গুড়ের চা খেয়ে সকলে চরিতার্থ হয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। — "যেখানকার যা তাই ধোপে টেকে। বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।" একজন ইস্কাবনের সাহেব মার্কা কালো ভদ্রলোক পেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটি টেক্কা ছাড়লেন, "পরস্মৈপদী চালিওনা। রবিঠাকুর নয়, কথাটা তোমার উপযুক্তই বটে। যেখানকার যা অর্থাৎ তোমার বগলটা গলদঘর্ম, সেটাই ধোপে টেকে, অর্থাৎ ধোপা কেচেও কূল পায়না।" ...কাঁচা শশা ফেরী হচ্ছে, তাই দেখে আরেক যাত্রী বলছে, " দাও দেখি দুটো পুরুষ্টু শশা; শশা অতি মহাশয় ব্যঁক্তি। জীবনের সারমর্ম বুঝেছি এবার। একটু লেট হয়ে গেল, এই সহজ সত্য কায়দা করতে। ভুলের মাশুল দিয়ে কত জিনিসই তো চেখে গেলাম, কিন্তু ফায়দা হল না কিছুই। মৎসচর্চা আর নয়, জানটা আঁশটে হয়ে গেল। বিহারের মুখোমুখি এসে সজল হয়েছে বাঙালীর বাঁকা দৃষ্টি। ভাই, কতদিন যে গ্রামের হাটে তরী ভেরাইনি মনেই পড়েনা। উফ্‌, প্রাণটা হু হু করে, জানটা আইঢাই করে। পেটে খেলে পিঠে সয়। পেটে এত কথা ছিল আগে জানতাম না। আম, জাম, কাঁঠালের বাগান। মধু, মধু, মধু। পেটে তাল ঠুকছে। বুঝবি না! সে বড় ব্যথার দান। জীবনের মাঝদরিয়ায় এসে এ কোন ঢেউ উঠল ? বমি করি শহরের তুরুপের তাসে ! (কত এল কত গেল ষ্টীমারের ঘাটে , জীবনের মোহনায় নতুন বাঁক ঘোরাতে। সেই আয়না তাই অব্যর্থ সেয়ানা হাসির করতালি বাজায়।) আর কিছুই না থাক উদার প্রকৃতি তো আছে। আমি মুক্তি চাই না। শুধু গাছের কুড়াবো, মাটির খাব। বগল বাজাবো। অন্তিমে আমার যাওয়ার ইচ্ছা এক্কেবারে নাই। "বুঝেছি কর্তা, বড্ড খিদে

পেয়েছে। ওপারে ঘাটে গিয়ে পুরী খেয়ে ভুক্তভোগী হবেন। মিষ্টি পেঁড়া খেলে জীবনের দৃষ্টি পাল্টে যাবে।"—জানালো স্টীমারের সারেঙ।

এবারে পট পরিবর্তন। সকরীকলি ঘাট। যাত্রীদের অভ্যস্ত স্বভাবের ব্যাকুল ব্যস্ততা আবার হাঁক, ডাক শুরু করেছে। কুলিদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে চায় সকলেই। বাংলার চেনা ভূমি ছেড়ে বিহারের অচিন মাটি। স্টীমারের দড়ি ধরে ডাঙার নির্ভরভূমিতে চরণ ফেলা যেন ট্রাপিজের মরণখেলা। "খোলাখুলি বলছি ভাই, তুমি আমার দেবর বন্ধু। ভ্রাতৃবন্ধনে তোমার হাত ধরে যাব ওপারের ঘাটে। সামান্য সময়ের আলাপ, কিন্তু অসামান্য অবদান "... শ্রীমতিরা টলমল করে জেটি পার হচ্ছেন। সামালো, সামালো ! একটা ধরাধরির কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে। পার্ক স্ট্রীট রমনীর পায়ের হিল জুতো পাটাতনে হোঁচট খেয়ে হেঁচকি তুলছে। "হিলাও মত্, নাও হিলাও মত্, মাতাজি যা রহা; বিবিজি গয়ংগচ্ছ, ফিরভি গিয়া, বহিনজি আভি আয়া, আভি গিয়া, হাওয়া কি মাফিক ...।" **Going, going, gone** । স্টিমারের মুখ নির্বাপিত মর্যাদায় নিরালা অন্ধকারে মুখ লুকালো। সকলের চোখ এখন বিহারভূমিকে সমঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পেটের ক্ষিদে ছুঁচোর কেত্তন শুরু করেছে।

সকরীকলি ঘাটে তিনটি গরু গাড়ি অপেক্ষা করছে বরযাত্রীদের জন্য। হৃষ্টপুষ্ট বলদ, শরীরে রঙিন ঝালর দেওয়া। গলায় ঘন্টার কঙ্কনধ্বনি বাজছে। বর যাবে পাল্কি চেপে, গ্রামের অর্কেষ্ট্রা বাজবে পেছনে। পাইক, বরকন্দাজ আছে। গ্রামের নগ্নগাত্র কালো ছেলেরা মাটির ধূলো উড়িয়ে পেছনে। বরকর্তা ব্যবস্থাপনাটা দেখে নিয়ে ঘোষণা করলেন, "**now we are in the heartland of the cow belt**।"

সেই আয়নার ঠোঁটে সেয়ানা হাসি। গল্পের ছলে কথা বলে, কিন্তু কাহিনীর ছক নেই। ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর খেলাচ্ছে। নাক বরাবর চলেছে সে, যেদিকে দুচোখ ধায়। একটু দাঁড়াও বাপু, বরযাত্রীর দল পেছিয়ে পড়েছে। ওরা ডাঙায় উঠে হাত পা খেলিয়ে নিচ্ছে , কনে বাড়ী চড়াও হওয়ার আগে একটা খেলোয়াড়ী পরিকল্পনা। মেয়েদের দল জড়সড় অস্বস্তি বোধ করছে এই খোট্টাই দেশে। কপালে কত বিভ্রাট আছে, একটা অজানা আশঙ্কা বুকে। গরু প্রস্রাব করল। বিহারী পুরোহিত আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে টিকিসর্বস্ব টাক মাথায় ছিটিয়ে নিল। বরকর্তা চতুর্দ্দিক সরেজমিন তদন্ত করে মেয়েদের গাড়ীতে উঠে বসতে রায় দিলেন,"যা হওয়ার তা হবেই, বিলম্ব করে লাভ নেই" যত্নে গরুদের পাশ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধিয়ে গেল মহিলারা গাড়ীর টোপরের তলায়। সিঁধ কাটবার ভঙ্গীতে যত নিরাপদ দূরে যাওয়া যায়। গাড়ীর শেষপ্রান্তে টঙে চড়ে বসেছেন বরের পিসী। ভারসাম্য রক্ষা করা গেল না। গাড়ী পেছন দিকে ডিগবাজী দিল। ফুটবলের মতো গড়াগড়ি দিল মাটিতে কয়েকজন মহিলা। পিসী আবার হাইকোর্টের জাঁদরেল উকিল। গড়িয়ে যাওয়াটা যেমন তেমন

নয়, পাশবালিশ, তাকিয়া কুড়িয়ে তোলার মতো। পেটে খেলে পিঠে সয়, কিন্তু পিঠে খেলে পরিহাসের অম্লরস হয়। বড় মুখ করে বলেছিলে, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এবার তবে গ্রামের ক্যানেস্তারার সঙ্গে পায়ে পায়ে তাল মিলিয়ে সঙ সাজো।... যাত্রা এগিয়ে চলল গ্রামের সীমানায় গড্ডালিকা ধূলো উড়িয়ে গেরুয়া রঙে রাঙা সন্ন্যাসী রাস্তায়। মুজবর গ্রাম, গোয়াগাচ্ছী গাঁও ছাড়িয়ে গরুর পিঠে মোটরগাড়ি এগিয়ে চলেছে চড়াই উৎরাই বেয়ে। গোঁত্তা খাচ্ছে, যেখানে গাড়ি থামিয়ে গরুরা পাশের কুটিরের ঘাস-বিচালি মুখে টেনে নিচ্ছে। যতই গরুর লেজের সঙ্গে করমর্দন করো না কেন, তার নিজস্ব **priority** আছে। জমিদারীর খাসমহলে ঢোকার আগেই পাড়াপড়শীর পাকা ধানে মই দিতে চায়। নরনারীর বিবাহমিলনে তাড়া নেই তার। যে মাটিতে চাষ সে মাটি দিয়ে বাড়ির দেওয়াল উঠেছে। মাটির কলসী, হাঁড়ি। মাটির বাসনের মতো ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায় এই মৃৎকল্প ক্ষণভঙ্গুর সংসার। আবার আঁধার আকাশের তলায় জীবনের ছেঁড়া সুতো গিঁট পড়িয়ে নেওয়া।

গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়ল বরযাত্রির শোভাযাত্রা। ইতিহাসের ঘেরা টোপে সমাজের অন্তরালে যে মেয়েরা ঘোমটা টেনে মুখ লুকিয়ে থাকে, তাদের কৌতুহলী চোখ সেই দিকে আনাচে কানাচে উঁকি মারছে ভাঙা বাসার ফাটলের ফাঁক দিয়ে। বৃন্দাবনের পথচারী, চলার পথে চলে যাও। হাতে সেই মেয়ের ছেঁড়া কাঁথা, সুঁচ সুতো। বুকের ভেতর অন্যমনস্কতার টানে আঙুলে সুঁচ বিধে রক্ত ঝড়ে পড়ল কাঁথার গায়ে। অশনি সঙ্কেতের মতো। এক ফোঁটা চোখের জলও গড়িয়ে নামল কাঁথায়। সেই মেয়েটি হয়ত সনাতন মেয়ে, কিম্বা তার মা। ঘুঁটে কুড়িয়ে সংসারের চাকা ঘুরিয়ে চলেছে।

হেমবাবুর দুটি সেপাই লাঠি ঠক্ ঠক্ করছে মাটির উপরে, পদভরে হেঁটে চলেছে গাড়ির পাশে। হাতে তৈলাক্ত মোটা লাঠি, হাঁটুর ওপরে উঠেছে নতুন মোটা ধুতি, উর্ধাঙ্গে ধবধবে নতুন ফতুয়া। নিরুপদ্রপ এই গাঁয়ের হাওয়ায় একটা অহেতুক হৈ হৈ রৈ রৈ না করলে হেমবাবুর প্রশান্ত মেজাজ অশান্ত হয়ে ওঠে। বরযাত্রির দল গাড়ির টোপরের তলায় ধিতাং ধিতাং তালে উঁচু নিচু মাটিতে ধিকৃত শরীরে বিকৃত মুখে প্রসন্নতা ধরে রাখার চেষ্টা করছে। বাতের শরীরটা এবার কাত হয়ে পড়ল বুঝি। পথে পথে বেলা বেড়ে গেল। কিষণপুর গ্রাম কাছে আসছে। বাঁশঝাড় বেড়ে চলেছে। গাড়ি একসময় রাস্তার বাঁক ঘুরতেই অদূরে ধরা দিল আমাদের লাল-সাদা দোতলা প্রশস্ত বাড়ি। গরুগুলো এবার গাড়ি টেনে লম্বা দৌড় দিল সেই দিকে। দোতলার বারান্দায় এতক্ষণে সারিবদ্ধ মাথা পথ চেয়ে আছে। বরযাত্রীরা এবার সতর্কে বিধ্বস্ত শরীরগুলো যথাসাধ্য মান-সম্মান বজায় রেখে নড়ে চড়ে গুছিয়ে বসেছে। এবার হাটের ধারে আমগাছগুলির তলায় এসে পড়া গেল। বড়কর্তার পোষা হাতি, হায়দার তার নাম, শিকল দিয়ে পায়ে বাঁধা আছে গাছের গুঁড়িতে। শুঁড়ের

নিঃশ্বাসে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আম গাছের গুঁড়ি তাকে বেঁধে রাখতে ঘাম ঝরাচ্ছে। আহা, অবলা জীব ! তবলা বাজায় হেমবাবুর প্রাণে। শেষবার হাতির পিঠে চড়াও হয়ে , পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেলেন। এখন **lame duck jamindar**। ভোল্টেজ কমে গিয়েছে সংসারে। শোয়ার ঘরে শুয়ে আজকাল গৃহী সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছেন।

হাতি শহরের অতিথিদের আগমনের রাস্তায় শুঁড় আকাশে তুলে সেলাম জানাল। জামাইবাবাজি নাতির বয়স বৈ তো নয়। পাশের ডোবা থেকে শুঁড়ে তুলে নিল পাঁকে ভরা জল, মশা আর মাছি। ছিটিয়ে দিল বরের পাল্কির গায়ে। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে আমরা যেন মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে আছি উটের মতো মুখ তুলে উৎসবের শ্যামল হাতছানির দিকে। কাছারী ঘরে বেশ ভীড় জমে উঠেছে। মা আমার বেয়ারা চেহারাকে ঘসামাজা করে যথাসাধ্য ভদ্রসমাজে উৎরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বেহায়া স্বভাবের কানে আকুতির স্বরে ব্যবহারের বিধি নিষেধ শুনিয়ে দিয়েছেন। বরযাত্রী এসে পড়ল বাড়ীর সামনে। " বর এসেছে, বর এসেছে "।— যেন ডাকাত পড়ার আওয়াজ। শাঁখ বেজে উঠল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো সংসারের বেলাভূমিতে। বড়মা , মেজমা, মা উলুধ্বনি করে উঠলেন। জিভের ডগায় কণ্ঠের পর্দায় অমন তবলা লহরা আজকাল শোনা যায় না। আমি মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে গলা ছাড়লাম। কিন্তু সেটা উলুধ্বনি তো নয় , " গেল গেল " রবে বেসুরো স্বরে কেলো করে দিল পরিবেশটা। ... ঠাকুর্দা আজকাল ব্যথার শরীরে অন্দরমহলের যত্নের মলাট ছেড়ে আমজনতার কাছে ধরা দেন না। কিন্তু নাত জামাই আসছে, তাই আতর মেখে গতর সাজিয়েছেন। ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি। চোখে পুরাতন আমলের রক্তিম মেজাজ ফিরে এসেছে। দুই ধারে দুটি মানুষের কাঁধে হাত রেখে মহাত্মা গান্ধীর মতো খদ্দরের পোশাক চাপিয়ে আসিব কি আসিব না , দ্বিধা-বিভক্ত পায়ে কাছারী ঘরে এসে দাঁড়ালেন। হাতে শক্তি ফুরিয়ে গেছে , শুধু আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলেন। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষেরা বরযাত্রীদের ভুলে গিয়ে দিনমণিকে দীন চোখে দেখে নিচ্ছে অনন্ত শয়ানের পূর্বে। দোষে গুণে মানুষ ছিলেন। কিন্তু চরিত্রে গল্পের মালমশলা ছিল। তাই আজ দুঃখ নেই । এই গল্প কেউ নাই বা পড়ুক। নাই বা হোক নাম, ধাম তো আছে। সরস্বতীর ঠিকানা তো পেয়েছি হেমবাবুর হেফাজতে।

বর পাল্কি থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেমে দাঁড়িয়েছে। গ্রামের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে তালে তালে পা মিলিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ। দলে আছে এক রত্তি কিশোরী মেয়ে। ছোট শরীরে কোন আর্টিস্ট সামান্য মাপের সীমিত রেখায় এত সৌন্দর্য্য ভরে দিল? সেই দিকে তাকাতেই আমার বয়সটা এক হাত বেড়ে গেল। এত আদুরে সেই তুলির টান আমার মতো বাঁদর স্বভাবের কাছে ঘেঁষবে কী? জ্যাঠামশায় শুধান, "রাস্তায়

আপনাদের কষ্ট হয়নি তো? এই অজ পাড়াগাঁয়ে আছেই বা কি , আমাদের আন্তরিকতাটা ছাড়া? " — মনের দুঃখ বুকে চেপে বরের পিসী উত্তর দিলেন, " সে কী কথা , এমন সোনার সংসার! আসলে আমরা শহরকুনো হয়ে পড়েছি। আপনাদের কাছে বাতের মলম আছে কী? রাতে যাতে কাত হয়ে না পড়ি। আহা ব্যস্ত হবেন না। " এবারে এ বাড়ীর বড় পিসী হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, " আপনাদের সকলের চাইতে আমি বয়সে বড় , আজকাল কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। জমিদারীর বাড়ন্ত বয়সে কি ছিল, আর কি না ছিল পড়ন্ত বেলায় চিনবেন না। আমার বিয়ে এ বাড়ীতে প্রথম। গাঁ উজাড় করে কাতারে কাতারে কাতর মানুষ এসে উদর ভরে খেয়ে গেল। এই গাঁ, সে গাঁ, চারিদিকে প্রশংসায় ছি ছিক্কার পড়ে গেছিল।" বড়পিসীর বাংলা ব্যকরণে মাঝে মাঝেই প্রমাদে প্রমোদ হয়। জ্যাঠামশায় চোখ টিপে দিলেন। বড়পিসী শুধরে নিয়ে বললেন ," না না ভুল বলেছি . টি টি পড়ে গেছিল চতুর্দিকে। তা সে কথা ঘরে বসে পরে হবে "— জামাইয়ের চিবুক টিপে বাঁদর ছানার মতো আদর করে বললেন, " এমন দাঁতকপাটি ছেলে দেখা যায় না। না না ভুল বলেছি। চাঁদ কপালি ছেলে।" তারপর চোখের জলে পূর্বস্মৃতির কোলে কাতর হয়ে পড়লেন। ক্রমে গোধূলির আলো নেমে এলো। আমি সেই মেয়েটিকে কণে দেখা আলোয় নজর রাখছি। একটা অশ্রুত সানাই রাগ ও বৈরাগ্য মিশিয়ে সকলের কোলাহল ছাপিয়ে কোন বৈকুণ্ঠের রাস্তায় মাথা ঠুকছে। দিয়া জ্বালাও, **lead kindly light**। একে একে পেট্রোম্যাক্স জ্বলে উঠল, বাইরে মশালের ঝাঁক। আঁধার ও আলো দুটি তুলির রং তলিয়ে দিয়েছে বকধার্মিক সংসারটাকে রহস্যময়ী ঘোমটার তলায়। আকাশে নক্ষত্রের চাঁদোয়া। শীতের সন্ধ্যা। মনের ভেতর উৎসবের গরম।

আহারেন পরিচিয়তে। বরযাত্রীরা আসার পর থেকে দফায় দফায় মাছ ভাজা খেয়ে চলেছে। পেটের সঙ্গে রফা করে জামবাটিতে আয়েস করে পায়েস উদরে তলিয়ে নিচ্ছে। ঠাকুমা চিরকাল পেট পাতলা। সকলের খাওয়ার তদারকি করছেন। "আহা, তোমাদের মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। হ্যাঁগো, কিছু খাইলু ?" সকলের পেটে তবলা ঠুকে চলেছেন।... এদিকে হাটের ধারে আম গাছের তলায় হায়দার এখন বড় একা। ঠাকুরদার সমবয়সী। কলকাতার অতিথিরা পেন্নামটুকুও ঠুকলনা কেউ। শুঁড়ের নিঃশ্বাসে তীব্র বৈরাগ্যের ঝড় বেড়ে চলেছে। বরযাত্রীদের বড় কষ্ট আমাদের গ্রামের ছোট সংসারে। তাই ব্যবস্থা হয়েছে যাত্রার আসর। কলকাতা থেকে পার্টি ভাড়া করে আনা হয়েছে আগের দিন। কাছারীর সামনে মাঠে বিরাট মঞ্চ। প্রেমের ঢঙে রগরগে পালা করা চলবে না। ঠাকুরদার কড়া নজর। যাত্রার স্ক্রিপ্টের ওপরে নিজের হাতে কলম চালিয়েছেন। আক্ষেপ করে ছেলেদের বলেছেন,"তোমরা দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মহিষাসুর বধ পালা আনতে পারলে না?"

ছয়

দুদিন আগে থেকেই দক্ষিণের মাঠে কাঁচা পাকা বাঁশ ফেলা হয়েছে। আর কাঠের পাটাতন। দুদিনের স্বর্গ তৈরী হচ্ছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখি। প্রশস্ত চারিদিক খোলা যাত্রার স্টেজ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশ বেয়ে কত লোক উঠল আর নামল। ইস্কুলের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার ঘাম ঝরানো অঙ্ক—সমস্যা মনে আছে। আর্টিস্টদের জন্য মিডল স্কুলের কমন রুম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিড়ির গন্ধ। চায়ের জোগান দিয়ে হয়রান হয়ে গেল চাকরেরা। হারমোনিয়ামে বেপর্দায় বেপরোয়া পালা গানের ফোয়ারা ছুটে চলেছে। ওখানকার হাওয়া লাগাতে দুদিনেই লায়েক হয়ে উঠেছি আমি। বাবা বললেন, "রিহার্সাল শুনে রাসকেল হয়ে উঠেছ তুমি।" যাত্রা দলের কিশোর ছেলেরা, কেলেপানা ক্যাকলাশ চেহারা, ধোঁয়া খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে আর্টের জাত বজায় রাখছে। মাথায় এক ঝাঁক আদুরে চুল, চোখদুটি দিঘল। আজ রাতে সারা গ্রাম মশাল হাতে পথচারী। এ গাঁ, সে গাঁ। মনের চাপা আগুন যেন ফানুস তুলেছে আঁধার আকাশে। বিয়ের হাওয়াটাই এমন, পেটের খিদে, মনের খিদে দেশলাইয়ের বারুদের মতো ফস্ করে জ্বালিয়ে দিল। কাছারীর চওড়া বারান্দায় বাড়ীর অন্দরমহল আসন পেতে থিয়েটার দেখবে। সামনে বাঁশের সূক্ষ্ম চিকের পর্দা। বৌদের ঘোমটা সরে গেছে। সকলের বুক দুলে উঠছে আরব্যরজনীর এক স্বপ্নময় সন্ধ্যায়। বড়পিসী চোখের জল মুছে , কোমরে ভারী চাবির গোছা সামলিয়ে বললেন,"এ সবই তোর ঠাকুর্দার দান। চলে গেলে সলতেটা জ্বালিয়ে রাখিস বাবা"... দূরে সাঁওতাল গ্রামে মাদল বেজে উঠল। -ড্রিম্, ড্রিম্, ড্রিম্। আদিম সেই স্বর , সভ্যতার প্রথম প্রভাতের প্রারম্ভিক আলাপের ভাষা। সুঠাম যুবার দল, ওদের মেয়েদের কানে এমন সব ফুল আছে যা কলকাতার নিউ মার্কেটে পাওয়া যাবেনা। ওরা আসছে মশাল জ্বেলে মহুয়ার রসে টান টান হয়ে। গ্রামের মোড়ল ও কর্তা ব্যক্তিরা কলকাতার অতিথিদের নিয়ে মাঠে একটা আলাদা সামিয়ানার তলায় সামিল হয়েছেন। মোড়লের গায়ে নতুন ফতুয়া, ভাগ্যিস লাল জুতুয়া ছিল না পায়ে। হাই স্কুলের মাস্টাররাও আছেন , অন্ত জন থেকে আলাদা আসনে সামিয়ানার তলায়।

সাঁওতাল পাড়া এবার জুটেগেল স্টেজের ওপরে। সাঁওতাল নাচ শুরু হল। গ্রাম জীবনের calypso । এদিকে আজ বড়কর্তার চোখে ঘুম নেই। শীতের রাত, হিমের ছোঁয়া লেগে গায়ে জ্বর এসেছে। বিছানায় শুয়ে আত্মজীবনী ডিক্টেশন দিচ্ছেন। আজ ডাক পড়েছে রাঙাপিসীর, লিখে নেওয়ার পালা। ওনার সামনে বসার হুকুম ছিল না কারুরই। ঠাকুর্দার স্কুলে সকলেই দেয়াল ঘেষে দাঁড়িয়ে থেকে দন্ডভোগ করে। ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, বাঁ পায়ে বিশ্রাম নাও। কৃতাঞ্জলি হয়ে ওনার মুখের

কথা খাতায় টুকে যাও। কর্তার ঠোঁট বিড়বিড় করে ইতিহাসের বিনুনি পাকিয়ে চলেছে। " ১৯৪০ সালে মধু মিয়াকে বলেছিলাম তোর গাছের পেয়ারা ইতিহাসে অনেকদূর যাবে। বড় সখের সখা ছিল সে। মুজবর গ্রামে নদীর মুখে ওর বাড়ি। কৈ, সে পেয়ারা খাওয়ালো না তো ? আমি পেয়ারা খাব।" রাঙাপিসী বোকা হয়ে গেছেন। —"সে কী কথা ? আজ উৎসবের বাড়িতে কত রান্না হয়েছে। তাছাড়া আপনার দাঁত পড়ে গেছে, পেয়ারা খাবেন কী করে ? জ্বরটা বেড়েছে কী ?" এমন সময় বাড়ীর সামনের দালানে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে, " বাবুজী।" কিন্তু বাবুজী তো আজকাল বাড়ির বাইরে বেরোন না , দেখা হবে কী করে ?— উনি আমাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "মধু, তোর গাছের পেয়ারা খাওয়ালি না, জানটা ধরে রেখেছি তোর জন্য। তাই আজ গামছা হাতে পেয়ারা ভরে এনেছি।"— ঠাকুর্দার কানে পোঁছে গেল সেই সন্দর্ভ। টলমল শরীরে মেয়ের হাত ধরে দালানে নেমে এলেন। ওনার আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিল , তাই নিজেকে ভোলাতে পারতেন সহজেই। " কাল রাতে স্বপ্নে তোর কাছে গিয়েছিলাম। " এই বলে মধুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রায়বাহাদুরের নাতি আমি। পেছপা হবো কেন ? সেই এক রত্তি কিশোরী মেয়েটি প্রকান্ড থামের আড়াল থেকে আমাকে নজর দিচ্ছে। ওর এক পেলব হাত ধরে ছিটকে গেলাম সিঁড়ির তলায়। একতলা, দুতলা, তিনতলার ছাদে এসে পড়লাম। এখানে আমার বোহেমিয়ান জীবনের কৈশোর কাটে। আকাশে উজ্জ্বল তারাগুলো আতসবাজীর মতো ফেটে পড়তে চাইছে। আরেকটি নক্ষত্র , আরেকটি মৃৎপ্রদীপ আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ছাদে দাঁড়িয়ে আমাদের চোখের সামনে গোটা গ্রামটা একটা খোলা চিঠির মতো। ঐ সেই সন্ধ্যা, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ তবলার ত্রিতাল, ঝাঁপতাল বাজছে। স্বর্গদ্বারে বসে আমরা মর্তের বায়োস্কোপ দেখছি। স্টেজে যাত্রা শুরু হলো। মুগ্ধ জনতার দৃষ্টি সেই দিকে। সামনের দিগন্ত আলোতে ভরে উঠেছে , পেছনে অয়রান অন্ধকার হয়রান হচ্ছে। কেউ জানে না আম গাছের তলায় হায়দরের শিকল এবার খুলে গেছে। অচলায়তন ভেঙে সচল হয়েছে সে। মেঘের মতো শরীরটা তার চলেছে নিঃশব্দ পায়ে। এদিকে এগিয়ে এসেছে, কাক পক্ষীও টের পেল না। পায়ে তার বেড়ালের চলার সূক্ষ্মতা। জনতার পেছনে হায়দার দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখছে নিথর হয়ে। অন্ধকারের শরীরে যেন এক গাঢ়তর ছায়া সে। যাত্রার জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে স্টেজে। অফুরান সেই আলোর ফোয়ারায় হায়দার যেন ফুরিয়ে গেছে। ওর ক্ষুদ্র চোখে আর মগজে কী চিন্তার প্রক্রিয়া চলছে কে জানে !

কে যেন ভীড়ের মধ্য থেকে সটকে বেরিয়ে এল সিঁধেল চোরের মতো। অন্ধকারে বসে কবে এক ছিলিম গাঁজায় সুখের টান দিতে। আজকের রাজকীয় সন্ধ্যায় তমোগুণী গাঁজার টানটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। ধাঁ করে মাটিতে বসে পড়েছে লোকটা। হেলান দিয়ে বসেছে সে হাতির পায়ে ঠেস

দিয়ে। হায়দার কিছু বলল না। ভাবছে বোধহয় , দেখি বেয়াদবিটা কতদূর এগোয়। এবার আরেক সাগরেদ ভীড় থেকে খসে এল আঁধারের অন্তরালে। "স্যাঙাত তুমি একাই টানবে বুঝি, আমাকে বঞ্চিত্ করবে? এক যাত্রায় পৃথক ফল তা কি হয় ? তোর শরীরে সাক্ষাৎ শিবের লক্ষণ। আয় তোর পায়ে পেন্নাম ঠুকি। " স্যাঙাত বসল মাটিতে হাতির পিঠে ঠেস দিয়ে। গঞ্জিকা সেবনে মনে মনে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে দুজনে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন গলা দিয়ে গলে নামছে। ওদিকে স্টেজে যাত্রার সংলাপ এগিয়ে চলেছে। রক্তিম তাল ঠুকছে জনতার ধমনীতে। ঐ সেই সংলাপগুলি কলম চালিয়ে ঝেঁটিয়ে ঠাকুর্দা বিদায় করেছিলেন। ভালবাসার এক রগরগে পালা। সারা গ্রাম সমাজ আজ তাই শুনে **sentiment** এর কোলে মাথা রেখে আঙুল চুষছে।

এবারে আমি আর সেই এক রত্তি মেয়েটি ছুটে ছাদ থেকে নেমে এসেছি। ছোটাছুটি করে আমাদের তরুণ পা ক্লান্ত। এক দিনেই কত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে স্মৃতির কোটরে। এবারে দুই গাঁজারু গান ধরেছে, " বলি, ও হরিরামের খুড়ো, মরবি রে মরবি রে বুড়ো। ভাটার টান ড্যাং, ড্যাং, ড্যাং, জলদি করো গাত্রোত্থান।" হায়দারের এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। শুঁড় আকাশে তুলে আহত প্রাণের তীব্র প্রতিবাদ জানালো সে। গ্রামের আকাশটা যেন চৌচির হয়ে গেল। হায়দার আজ তার ভাগ্যের মাশুলকে শুঁড়ে তুলে নিয়েছে। মুহূর্তে গ্রামের জনতা স্টেজ ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মুহূর্তে এত আলো, এত আয়োজন ফুৎকারে নিভে গেল। ক্ষুদ্র মানব মন, বৃদ্ধ হাতি। হায়দারের আর ঠাঁই নেই সেখানে। রইস আদমি আর নেই কেউ। ছুটে চলেছে সে, ময়রা পাড়া পার করে, ধোবা পট্টি, স্কুল, মেথর পল্লী ছাড়িয়ে। সংসারের দুয়ার ভেঙে আজ সে বিচ্ছিন্নতাকামী প্রাণী।

সাত

ঠাকুরদার শয়নকক্ষে আত্মজীবনী তখন যৌবনের পাতায় এসে পৌঁছেছে। হাতির পিঠে চেপে তখন সাহেব, মেমসাহেবের সঙ্গে শিকারের সন্ধানে শোভা পাচ্ছেন। এমন সময় ঐ কার বৃহংণ ওনার উত্তরে জানলার বাইরে? উত্তরে খোলা প্রান্তর ভেঙে ছুটে চলল হাতি। ওই দিকে চার গুহা, ডাকাত চলার রাস্তা। হেমবাবু চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। হায় হায় করে তাঁর জ্বরার শরীরটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল বুঝি পুত্র হারানোর শোক লেগেছে বুকে। একে একে ছেলেদের নাম ধরে ডেকে পাঠাচ্ছেন। হায়দারের মাহুত ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে, এক সিপাই পেছনে বসে। হাতির সন্ধানে ছুটে চলল তারা। হাতে শিকারীর টর্চ। অন্ধকারের বুক চিড়ে উধাও ঘোড়ার গতি। হিমেল হাওয়া চাবুকের মতো লাগছে গায়ে। বাবা উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করলেন। এই আওয়াজ হায়দারের অচেনা নয়।

যদি শুনে ফিরে আসে পুরাতন অভ্যাসে? ওই দিকে দূরে ফুলহার নদী, তার ওপারে ডিল্লী দেওয়ান গঞ্জ। দ্বিতীয় ভিটে। হায়দারের গতি সেই দিকে। কিন্তু নদীর চর খুঁজে নিরাপদে ওপারে পৌঁছতে পারবে কী ? চরা বালিতে পড়ে গেলে কী হবে?

হেমবাবুর ফোকলা দাঁতে পেয়াড়া খাওয়ার বাসনা অচরিতার্থ থেকে গেল। আজকের ঘটনা ওনার জীবন উপন্যাসের পরিকল্পনাতে ছিল না। ঠাকুরদার আত্মজীবনীর ভাষা—মালঞ্চে আজ ঝড়ের হাওয়া। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ শশী। বাতাসে ধুলো। কালিমাখা মেঘের ঘন ভ্রূকুটি অশনিসঙ্কেত করছে। বাড়ির লোকেরা ধমনীর তাল শুনে টি প্ টিপ্ প্রহর গুনছে। আমি অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে আবার ছুটে গেছি তেতলার ছাদে, হায়দারের পেছনে দৃষ্টির তীর ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য। আমার ছায়া-সঙ্গিনী হয়ে ছুটে গেছে সেই কিশোরী মেয়েটি। কনকনে বাতাস আর অশান্ত মেজাজ, দুইয়ে মিলে দাঁত কপাটি লাগার জোগাড়। জিজ্ঞেস করলাম,"তোমার ভয় করছে?" সে শুধু বোবা ধরার স্বরে উত্তর দিল,বু-উ-উ। পশ্চিমের হাওয়াকে দেহাতে বলে পছিয়া। সারা দিন অন্দরের অবগুণ্ঠনকে কানে কানে সাধন দেয়, "পালাও পালাও" ভাঙা হাটের শমন জানায়। আজ রাতে বিবাহ বাসর কানায় কানায় চোখের জলে ভরে উঠেছে। বড়পিসী ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন। ... কী আছে ঐ উন্মুক্ত বোবা উত্তর প্রান্তরে ? ধনমনিয়া, চারগুহা, কামাথ, কন্‌খর নদী, জঙ্গল মহল। সেই জঙ্গলে চিতাবাঘ, বনশুয়োর, নীল গাই, বিষাক্ত সাপ। দেড়গুণ সাইজের বুনো মোষ সমস্ত জীব জগতের শরীরে শিং ঠুকে চলেছে। নদীতে কুমির ঘাই দেয়। জঙ্গল মহলে হায়দারের পিঠে চেপে হেমবাবু সাহেব, বিবি, গোলামদের সঙ্গী করে শিকার করেছেন যৌবনে। সঙ্গী ছিল জজ সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও। ইংরেজ আমলে নীল কুঠি ছিল। অসময়ে মেঘের গর্জন কেন? স্বপ্নের বলাকা উড়ে গেল দুঃস্বপ্নের কালো রাতে।

কিন্তু হেমবাবু জখম হয়েছেন বটে, খতম হননি। ওনার প্রকৃতিস্থ হতে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। এসে বসেছেন বারান্দার আরাম কেদারায়। এক কালে এর চাইতেও বড় সঙ্কট, উৎকট বিপদ পার হওয়া গিয়েছে। ফিরে এসেছে অভিজ্ঞতার হাতে পেটানো শক্ত ব্যক্তিত্ব। লণ্ঠনের আলো-আঁধারে ওনার মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে, যেন মেঘের পাহাড় জমেছে। কলকাতার অতিথিরা এত সব অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি। ওনার সাবেক মেজাজটা এবার সবাক হয়ে উঠল। ডাকো লেঠেল আর সেপাই-সর্দারদের। অনেকদিন অব্যবহারে যাদের আজ মরচে পড়েছে শরীরে। বর্তমানের মলাটের তলায় লুকানো ছিল জমিদারির বাঘ নখ। ওরা এসে দাঁড়িয়েছে দালানে। হেমবাবু অতীতের গায়ে হাতড়াচ্ছেন— সংসার-সীমান্তে কতটুকু শক্তি বজায় আছে? বর্শা আর লাঠি। ঘরের লক্ষ্মী। এরা এ বাড়ির নিমক খেয়েছে বংশানুক্রমে। লড়েছে, আর গড়েছেও সংসারটাকে। আত্মজীবনীর সশস্ত্র চেহারাটা

এবার ডায়েরির পাতা থেকে উঠে এসেছে। সেপাই সর্দার সামনে এসে দাঁড়াল। বিণীত প্রণাম।

ঠাকুর্দা বললেন," হায়দার চলে গেল। গৃহলক্ষ্মী তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। ও স্বভাব চঞ্চল। ওর মাথায় গজমতি আছে, মুখে গজদন্ত। অনেকেরই লোভ আছে ওর ওপর। মত্ত হাতি মানুষ মারতে পারে। আমার এক দায়িত্ব আছে আশে পাশে গ্রামের ওপর। সে আর ফিরবে কিনা জানি না। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, সেই শক্তি আমার নেই। ওকে খুঁজে বেড়াও, যেখানে থাক, যতদুরেই থাক। ফেরাতে না পারো, চোখের আড়াল করা চলবে না। লেঠেল সর্দারকে ডাকো।" লাঠিয়াল এগিয়ে এসে লাঠি মাটিতে শুইয়ে রেখে প্রণাম করল। " ভেবেছিলাম তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোরা আমার দুর্দিনের দামাল বন্ধু। আমার ওই অবোধ ছেলেকে ফিরিয়ে আন্। যে আমাকে হায়দারের খবর প্রথম দেবে তাকে দেব দো বিঘা জমিন।" এই দেওয়ার অর্থ দেনা-পাওনার অভিধানে পাওয়া যাবেনা। ওরা জানে কত মরমী এই দান। উনি সকলের দিকে তাকিয়ে শেষবার অদ্ভুত চড়া গলায় বললেন, "যাও!" আমার কানে সেটা শোনাল **martial call 'shoot'**। জমিদারির দামাল রথ কৃষ্ণপক্ষের রাতে মশাল জ্বালিয়ে, পা হেঁটে, ঘোড়া চড়ে গ্রামের গলিতে, চষা মাঠে, উধাও দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়ে জাল পাতল।

ঠাকুরদার আত্মজীবনীর ডিকটেশন এবার বন্ধ। ওনার শোয়ার ঘরে রাঙাপিসী মেঝেতে বসে লণ্ঠনের আলোতে কী লিখছেন? টুক্‌সি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল,"পিসী, তুমি কী লিখছ ?"— "আজকের দিনটা, এই যা দেখলে, শুনলে, সব লিখে রাখছি। তোমার নামটাও টুকে রাখলাম খাতায়, টিকে থাকবে অনেকদিন " সেই ডায়েরী রাঙাপিসী খাতা ও সুন্দর এক কলম তুলে দিয়ে বলেছিলেন।— "বাবা তোমার জীবনী লেখ।"ছোট মেয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারেননি। শক্ত মানুষ ছিলেন, তাই নরম জমিতে লড়াই করতে পারতেন না। বাড়ির মেয়েদের কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের মেয়েদের দিকে একটু বেশী টান, ছেলেদের বৌদের সম্মান ও মর্যাদার পেছনে কড়া নজর। কেবল নাতিরা ছিল বুড়ো কত্তার **blind spot**। ঠাকুরদা রাতকানা আর নাতিকানা। আজ সন্ধ্যায় আবার সংসারের হাল ধরেছেন। উৎসবের বাড়ি আবার হাঁক ডাক করে উঠল। ঠাকুরদার চোখে কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না। " নাতিগুলো কেন প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পড়ে না ? আমরা বাপের জন্মে কেউ ধুতি ছাড়িনি। " বাবা আমার হাত ধরে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

—নাও, ধুতি পড়ো।

—না,আমার লজ্জা করে, ওটা খুলে যায়।

—তবে কী তুমি হাফ প্যান্ট পড়ে হাফ নেকেড ফকির হয়ে বিয়ে বাড়িতে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবে?

আমি হাত ছাড়িয়ে সটান দৌড় দিলাম। বাল্যের স্বাধীনতা বাহুবলে নয়, দৌড়েই রক্ষে করা যায়। ছিটকে গেলাম দক্ষিণের বারান্দায়। বাবা ইংরেজ গোরা সৈন্যের মতো করে ধাওয়া করলেন। ঘরে দেওয়ালে ঝোলানো ছিল ঘোড়ার চাবুক। হাতে তুলে নিয়ে হাওয়ায় সপাং সপাং চালাচ্ছেন। আজ যেন হায়দারের বিরহে গায়ের জ্বালা আমার পিঠে জুড়োতে চান। আমি ছুটে গেলাম উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বারান্দা দিয়ে। এমন সময় মেজ জেঠিমা মাঝখানে এসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তাল কেটে দিলেন। আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। "ঠাকুরপো, তুমি কোনদিন কারো গায়ে হাত তোলনি। তুমি অজাতশত্রু। কিন্তু আজ তুমি কেন স্বধর্মে বিধর্মী হবে?" বাবা এবার সত্যিই লজ্জিত। ইতিমধ্যে আমার ছায়াসঙ্গীনী গুটি গুটি সেখানে পৌছে গেছে। — 'টুকসী, শুঁটকি, থুড়ি তোমার ভয় করছে?" আবার বোবা ধরার স্বরে উত্তর এল, বু-উ-উ। ঘরের মধ্যে এক বিশাল বল্লম দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। জমিদারির এই নরমে গরমে সংসারের মেজাজ চোরা বালির মতো ভয়ঙ্কর ঠেকছে তার।

আজ রাতে বিয়ে বাড়ির খ্যাঁটটা ভালোই জমল। ছোট পিশেমশাইয়ের খাওয়া শুরুতে স্লো, পরে ভোঁ দৌড় দিয়ে ভাঁড়ারকে শশব্যস্ত করে তোলে। প্রথমে খাবারের আসনে বসিব কি বসিবনা, দ্বিধাজড়িত পায়ে মন্দগতিতে ফন্দি আঁটেন। আমি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছি এই অল্প আহারে। গন্ডাচারেক লুচি দিও, চপ কাটলেট দুচারখানা। ফিশ কাটলেট ফাউ দিও। ডিমের ডেভিল ফ্রেন্ডলী ম্যাচ। ওনলি রিগ্রেট রান্নার মেনুটা ছাপা হল না। আজকের ক্ষুধা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের। খেতে বসে মাংসের গায়ে মাত্রাতিরিক্ত ব্রম্মাহত্যা করে চলেছেন। ঝোলের রং কামাতুর। একটা প্রকান্ড সাইজের হাড় দাঁতে চিবোতে গিয়ে কায়দা করতে পারছেন না। — হার মানা হাড় পরাবো তোমার গলায়। ওনার সামনের সারিতে বসে বরকর্তা দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না। ভ্রূ যুগল জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে কেঁপে কেঁপে ফেঁপে উঠছে।

আজ রাতে হাওয়াটাই খাওয়ার। — জামাইয়ের পাতে প্রকান্ড সাইজের কাতলার মুড়ো। কাতর হয়ো না ভাই, শ্যালীরা বলছে। "দেখি তুমি কেমন বাঘের বাচ্চা। একদিন সংসারের মাথা হবে তুমি, সকলের মস্তিষ্ক চর্বণ করবে সেদিন। দেখো আমাদের ঠাকুরদাকে। পাঠশালায় দ্বিতীয় শ্রেণী পার করতে পারলেন না। ক্ষীণজীবী শরীরে অসার ঘিলুর এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ওনার বাবা অর্থাৎ কর্তা দাদু, তাঁর হাবা ছেলের জন্য চার বেলা মাছের মুড়ো বিধান করলেন। লেখা আছে ডায়েরীর পাতায়। তাই এত বছর পার করে দিয়েও ঠাকুরদার শিয়রে টাক পড়ল না। নাতিরা পাকা চুল তুলতে গিয়ে হতাশ হল। স্মৃতিশক্তির গায়ে জ্বরা ধরল না এতটুকু। আজ তিনি রাঘব বোয়াল। সংসারের টুকিটাকি হিসেব ধরে রেখেছেন চুম্বকের মতো। উদার পরিবারে দেদার সন্তান জন্ম দিলেন তিনি।... আরও কত কিছু। মাছের মুড়ো। প্রভাত

কালে ঐ একটি নিদানের ফলে এত বড়ো আত্মজীবনী পেশ হল।"

উৎসবের বাড়ীতে খাওয়া যখন হাওয়া কাঁপিয়ে চলেছে, সংসারটা লুকিয়ে চোখের জলও ফেলছে যতক্ষণ,ততক্ষণে হায়দার পৌছে গেল মাঝরাস্তায় কামাথের ফসলের গোলায়। খাবার উদরাস্থ করল অনেকটা, ছড়ালো বেশী। এটা তার দীর্ঘ পদযাত্রার প্রথম চরণ বা **base camp** । তাই রসদ ভরে নিতে হবে পর্যাপ্ত ভাগে। হেমবাবুর পেয়ারের হাতি শেষবার নিমক খেল তাঁর। বড়কর্তা সেদিন মুখে অন্ন তুললেন না। হায়দারের মাহুত মৌলাবক্স ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে সেদিকে ছুটে আসছে। হায়দার সরে দাঁড়াল এক বিশাল ঝোপের আড়ালে। পায়ের তলায় একটা ডাল ভাঙার আওয়াজও হল না। মৌলাবক্স ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে গেল, অন্ধকারের গায়ে হাতড়িয়ে পলাতক পথিকের সন্ধানে। দূরে নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে। অরণ্যের আহ্বান। হায়দারের জীর্ণ বয়সে আজ পিঞ্জর ভাঙার শক্তি ফিরে এল। এলোমেলো চিন্তার ধারা মাথা তুলে আঁধার আকাশে এক তারা খসে পড়ার যাত্রাপথ লক্ষ্য করছে। আলোর মালা উত্তর আকাশে রেখা টানলো। ডিল্লী দেওয়ান গঞ্জের গন্তব্যস্থল ছেড়ে ফুলহার নদীর এপার ধরে এগিয়ে চলল সে। জঙ্গলমহল শতপ্রাণীর গলায় তাকে ডাক দিচ্ছে। ফুলহার নদী আর কন্‌খরের জলধারা মহানন্দার সঙ্গমে গিয়ে পড়বে। আরও দূরে সে পথ আঙুল দেখাচ্ছে , পূর্ণিয়া ছাড়িয়ে অয়রাণ অরণ্য। বিভূতিভূষণের "আরণ্যক" গল্পের বৈহার আর লবটুলিয়া। অরণ্যের বাণী জঙ্গলের প্রাণীকে আদিম স্বভাবের ডাক দিয়েছে সেদিন। কিষণপুর পড়ে রইল বহুদূর পিছনে , ইতিহাসের পাতায় , ডায়েরীর খাতায়। দিন গেল, মাস অতীত হলো, হায়দার ততদিনে হয়তো তরাই অঞ্চলে পৌছে গেছে। ভুটানে যার জন্ম হয়েছিল, বিহার তাকে আমৃত্যু ধরে রাখতে পারলো না। হায়দার চলে গেল, কেটে গেল তার সঙ্গে গ্রামের এক যুগ। একই সঙ্গে এল **Zamindary Abolition Act**।...

আট

হেমবাবুর জীবনের নটে গাছটি মুড়িয়ে গেল। এইখানেই গল্পের শেষ রজনী হতে পারতো। কিন্তু বাধ সাধল আমার ছেলে। ওর শরীরে নীল রক্ত বোধহয় ফিকে হয়ে অবশিষ্ট আছে। " বাবা আমাকে কিষণপুর নিয়ে চলো। ঠাকুমার পালঙ্ক তুলে নিয়ে আসবো।" — চয়ন বলল। শুধু আয়নায় মন ভরছে না তার। ওর জেঠুর মুখে শুনে গ্রাম সভ্যতার পলিমাটি জমেছে তার চৈতন্যে। বহু বছর পর ওর সঙ্গে ফিরে গেলাম পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে। ভাঙা বাসার সবটাই সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলল আমার গল্পের রত্ন সন্ধানে। সঙ্গে ওর জেঠুও আছেন, গ্রামের আঁধার আকাশের

তলায় বসে স্মৃতির ঝুলি হাতড়িয়ে চলেছেন। বয়স্যের যত স্মৃতি, কনিষ্ঠের ততশত কৌতূহল। এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না। শুধু গল্প বলা ? কলশটা শূন্য তাই বেশী আওয়াজ তুলি। গল্পের কড়ি গুনে ধ্যানের জপমালা ঘুরিয়ে চলি। চয়ন খুঁজে পেতে জোগাড় করলো কুমীর আর লেপার্ডের চামড়ার টুকরো। হেমবাবু হায়দারের পিঠে চেপে শিকার করেছিলেন। জোগাড় হলো ওনার লাইব্রেরী থেকে অযত্ন অবহেলায় পড়ে থাকা চারশো বছর পুরানো তালপাতার বিভিন্ন পুঁথি।

গ্রামের কোল ঘেঁষে উঁচু পীচের রাস্তা ছিল একসময় রেলস্টেশন ধরার জন্য। সেই রাস্তা আজ গঙ্গার ক্ষুধা মেটাচ্ছে। পাশের গ্রামটাও নদীর ভাঙনের হাত ধরে ইতিহাসের পাতায় ছুটি নিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে গেলাম সেখানে, নিয়তি যেখানে গ্রামের রাস্তাকে ঝুটি ধরে গঙ্গাবক্ষে চোবাচ্ছে। **Land's end** । ভাঙনের খাদের সামনে আমরা দুই প্রাণী অবশিষ্ট কালের শেষ সীমানায়। অনেক নীচে গঙ্গার জল স্রোত পাকাচ্ছে , অশিষ্ট ক্রোধে। পেছনে আদিম কালের পছিয়া হাওয়া কানে কানে সাধন দিচ্ছে, "পালাও, পালাও।" চয়ন ক্যামেরা তুলে ধরেছে চোখের সামনে। সামনে তার এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। খালি গায়ে পৈতে, পরিচ্ছন্ন ধুতি। অশীতিপর বৃদ্ধ, কিন্তু টান টান বুক। চোখের চশমা ঘোলাটে হয়ে গেছে, তার একটা কাঁচ ফাটা। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে বিহারের মানুষের এক প্রান্তিক ছবি।

ফটো তোলা শেষ হলো। এবার সেই বৃদ্ধ সজল গলায় হিন্দীতে বলল "আমি নগেন্দ্র চৌধুরী। এই গাঁয়ে আমাদের অনেক পুরুষ বাস। হেমবাবুর পরিবারকে আমরা চিনি। যেখানে দাঁড়িয়ে আজ ফটো তুললেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আপনার ঠাকুরদার বাবার সৎকার আমি দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স আঙুলের সমান।" ইতিহাসের পদচিহ্ন গ্রামে আর কোথায় কোথায় লুকানো আছে কে জানে?

সেই আয়নার ঠোঁটে তাই সেয়ানা হাসি, চোখে জল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আজকাল নানান মুখভঙ্গি করে ছেলে দাড়ি কামায়। মেয়েটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে নিজেকে দেখার আশ মেটাতে পারে না।

আজ আমার ছুটি। ভাঁটার টান, ড্যাং, ড্যাং, ড্যাং, জলদি করো গাত্রোত্থান।

প্রকৃতির ইতি-করণে গুরুজির কৃতকর্ম

এক

"প্রকৃতির পাঁচালী" লেখা চলেছে কলমের ধুনুচি নৃত্যের তালে তালে, ভক্তির রসে ধুয়ে, ভৈরব হরষে সকলকে সচকিত করে। শনি ও লক্ষ্মীর পাঁচালী আজকাল বাজারদরে জাত্যাভিমান লাভ করেছে। আমরা এই "প্রকৃতি পুরাণ" আপামর জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করতে বিশেষ ব্যকুল। তাই দাম সস্তা করা হল। পাঁচ সিকী। এই সামান্য অর্থ শিকেয় তুলে না রেখে যদি এই নতুন পুরাণ কিনে ফেলেন তাহলে মানুষের হুঁশ হবে। আমাদের ইচ্ছে ছিল শতাংশে দাম রাখা-৯৯ পয়সা, যেমন



বাটা কোম্পানি জুতোর দাম রাখে। কিন্তু বর্তমানে খুচরো পয়সার সঙ্কটজ্ঞানে সেই মত পরিত্যাগ করা গেল। পশ্চিম বাংলার তিন সাড়া জাগানো পুরুষ ভগবান

শ্রীচৈতন্যদেব, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, আর শ্রীবটকৃষ্ণ (বটগাছ অতি সনাতন কিনা। বর্তমানে আমরা বটকৃষ্ণের রাজত্বে বেশ আছি। রামকৃষ্ণের যেমন কথামৃত, বটকৃষ্ণের তেমনি কথাসার প্রকৃতির পাঁচালি। পরম ভক্তির সঙ্গে সকালে তিন কাপ চা সহযোগে চর্চা করা নিয়ম। আনুসঙ্গিক আকর্ষণ হিসেবে বেতারে এফ. এম. অনুষ্ঠান চলতে থাকলে এই পাঁচালী পাঠ সহজিয়া ভাবের মতো সহজপাচ্য হয়ে ওঠে। সেই সময় যদি শুকনো ঘরে উষ্ণ বিছানায় বসে জানালার বাইরে বর্ষার সুন্দর রসাতল দৃশ্য দেখা যায়, তাহলে বিশেষ আহ্লাদ হয়। ভেজা কাক দেখলে মনে হয় "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন না"? রাস্তার সব ইতর প্রাণী, এমনকি ঘেয়ো কুকুরটাও নতুন কৌতুহলে ভাবনার দিগন্তে এসে লেজ নাড়ায়। এমন দিনে কাবে বলা যায়? তেলেভাজা, আরেক কাপ চা। কলকাতার রাস্তায় জল কাদা বাঁচিয়ে চলার ব্যর্থ চেষ্টা দেখে মনে হবে, আহা, প্রকৃতির কী প্রেমময় লীলা, নইলে এই বিপর্য্যস্ত পথচারীরা বর্ষার জলে স্নেহাষিক্ত হচ্ছেই বা কেন? একটা চিকন প্রেম মনের কোণে গজিয়ে উঠে। এই প্রকৃতি-পুরাণের প্রধান কর্মসূচী গাছ কাটো, ঘরে আনো। গাছ তোমার হতে পারে, আমারও হতে পারে। একটু সকৌশল অনুনয় বিনয়, ভীতি প্রদর্শন—যার ফলে আমাদের অখণ্ড গাছ খণ্ডরূপ ধারণ করে বটকৃষ্ণের আশ্রমে



কেন চোখের জলে ভিজিযে দিলাম না...?

চালান হয়ে যায়। যে গাছ ধরণী ভেদ করে আকাশের দিকে শাখা মেলে তাকে ধরাশায়ী করাই বাবাজির দীর্ঘ পঁচিশ বছরের স্থির প্রয়াস।

বনস্পতির ভাঙনের গান শুনে গুরুদেবের সবুজ অবুঝ মন শিশুর মতো দেয়ালা করে, ব্যালা বাজায়। বাংলার ভাগ্যাকাশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা, তখন এই কলিযুগে এক পরশুরাম গাছের বংশ নির্বংশ করে চলেছে। ঈশ্বরবিধীত ভবলীলা অন্য রাস্তায় চালান দিয়ে প্রকৃতির সংসারে টিপ্পনী কাটেন তিনি। গাছ তার নিজের স্বভাব ছেড়ে আপন বাপের নাম ভুলে গিয়ে গৃহত্যাগী হয়, বাবাজির সংসারে সংসারি হয়ে হরেক নামে পরিচয় পায়। এদের নতুন নামে কুকুর-পাখি, মানুষ, পৃথিবী, ভালবাসা, জলসাঘরের মদালসা শিল্পী, জীবনসতরঞ্চের সাহেব, বিবি, গোলাম ইত্যাদি পোষা হয় বাবাজির আশ্রমে। বাবাজি কলাপ্রেমিক। শিল্পের সকরুণ কৌতুকে গাছের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়, কলাপ্রেমিক মানুষের সমাগমে সরগরম হয়ে ওঠে গাছের শহিদমঞ্চ! চাক্ষুষ না দেখলে আপনার প্রত্যয় হবে না। মরা হাতি লাখ টাকা জানা ছিল, মরা গাছ লাখ টাকা জানা ছিল না।

দুই

বটকৃষ্ণের আশ্রম আনন্দনিকেতন নামে এক গ্রামীণ শহরে। লোকপ্রিয় দাদুর দোকানের ঢিল ছোঁড়া দূরে ঠিকানা। এখানে গাছ পূজা করা হয়। আনন্দনিকেতনে সর্বত্র বনস্পতি রয়েছে। আশ্রমে কোনো গাছ নেই। নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে? এই জজেমানা কথা অনুসরণ করেই বাবাজি আশ্রমের শূন্য স্থানে পূর্ণতার বাউল গানের আয়োজন করেন। আউল-বাউল, মণ্ড মাদল কত কী যে তাল ঠোকা হয় চব্বিশ প্রহর হরিনাম সংকীর্তনের মতন। ভুড়ি ভুড়ি মুড়ির ঠোঙার সমান ভজন পড়া হয়। তেলেভাজার সাহায্যে সেবা করা হয় বিশিষ্ট অতিথিদের, তৈলাসিক্ত করা হয় হোমরাচোমরা মানুষদের। নীরব শ্রোতারাও বাবার প্রসাদ পান। চিত্ততোষ চা আসে মাটির ভাঁড়ে। এদের ওজনের ভার না থাকলেও সহাস্য বাক্যালাপে আসলে এরা চটুল ভাঁড়।

আশ্রমের মুখর আকাশ বাতাসে অচিন পাখিরা তখন সারি বেঁধে দূর পথযাত্রী, গোধূলির লগ্নে ক্লান্ত আকাশে সেই সময়ে একে একে তারা দেখা দেয়। রাঙামাটির পথ ধরে এবার গরুর গোষ্ঠ যাত্রা। আশ্রমিকদের সংখ্যা তখন হঠাৎই কমে যায়, কর্পূরের মত উবে যায় কোথায়। তারা কোন পথে ফিরে গেল? জানা গেল না। এত গরুই বা কোথা হতে এসে পড়ল? এদের মুখ চেনা চেনা ঠেকে, দিনের বেলা আশ্রমে দেখছি না? দিনের বেলার চেলা সে যে, সন্ধ্যাবেলার গাভী। গরুর মিছিলের সম্মুখভাবে তখন গোষ্ঠপাল স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এদিকে নিশি না পোহাতে

আনন্দনিকেতনের সাজানো বাগানগুলিতে হনুমানেরা চড়াও হয়। বাঁদরের শিল্পরুচি দেখা দেয় কলাভক্তি রূপে। শোনা যায় এরা আশ্রমিক বানরসেনা।

প্রকৃতির মেয়াদ শুরু থেকে শেষ হয়। বটকৃষ্ণ শেষ থেকেই শুরু করতে চান। প্রকৃতির মরণ থেকে আগাম লাভ আদায় করতে অগ্রহী। বনস্পতির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলে তাঁদের ব্যাজার মুখে সজ্জিত সাজে মাল্যদান করেন। প্রকৃতির উল্টোপুরাণ। বীর হনুমান এক লাফে গন্ধমাদন পর্বত তুলে এনেছিল। বাবাজি বনস্পতির নান্দনিক রহস্য কব্জা করেছেন। তাতে অবশ্য প্রকৃতিকে মেরে ফেলা যায়, জীবন দেওয়া যায় না। গাছ ধরার খাঁচাকল। লাফ দেওয়ার শক্তি না থাকলেও, হনুমানের মতে অশ্চর্য অনুমানশক্তি আমাদের আশ্রমের আচার্যদেবের আছে। অতঃপর "আমি কী হনু রে", বলে আচার্যদেব ঘোষণা করেন। আশ্রমের যত চেলা ও চামেলিরা তাকে ঘিরে থাকে



আশ্রমিক বানর সেনা

তারা "বটেই তো, বটেই তো" বলে পৃষ্ঠপ্রশংসা করে। তবে কিনা হনুমান গাছের খায়। তাই তাদের বলা হয়। শাখামৃগ। বটকৃষ্ণ গাছের খায়, মাটিরও কুড়োয়। বাবাজির পৌষ মাস, গাছের সর্বনাশ। দীনবন্ধু দয়ালহরি ঘুম দিয়েছেন।

যে-ব্যাক্তি কাঠকে কাঠ বলে মানতে চায়না সে বাবাজির মন্ত্রমুগ্ধ আকাটশিষ্য। শ্মশানের কাঠ আগুনে জ্বলে। কিছু কাঠ বাসভূমিরও কাজে লাগে। কিন্তু কিছু সর্বহারা কাঠ আছে যারা শিল্পের সকরুণ কৌতুকের কাজে লাগে। এরা অনাসৃষ্টির ভাঙা রতন। তোমার আমার মন ফানুস। আমাদের গুরুদেব শাখায়িত-মানব। গেছোবাবা। সুকুমার রায় লিখেছিলেন ছিল হাঁস, ছিল সজারু, হয়ে গেলো হাঁসজারু। ছিল বক ও কচ্ছপ, হয়ে গেল। আমাদের বাবাজীবন গাছেরই বর্ণসঙ্কর। গাছ যে গাছ নয়, আসলে সে শিল্পের খাতিরে সকৌতুক পুতুল, এই পৌত্তলিকতাই যে তার অসল ধর্ম-এই গোড়ার কথাটাই আমাদের শিল্পগুরু দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রমাণ করে চলেছে। ঢাক গুড়গুড় আওয়াজ সহকারে। গাছের কৈবল্যপ্রাপ্তি। তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে আশ্রমের ঠিকানা সমেত গাছের সৎকার সমিতি গড়ে তোলা হয়েছে। প্রকৃতির ভবন-ভাবনা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে যুতসই সরকারি, বেসরকারি সংযোগ স্থাপন করে চলেছে। বনস্পতির বাণপ্রস্থের জন্য শিল্পনিপুন শয্যা তৈরি হবে সেখানে। এক প্রকার চাষা-সুন্দর গ্রামীণ বাৎস্যলতা পেয়ে বসেছে আশ্রমের আশেপাশে। যা হারিয়ে গেছে তাকে নতুন করে হারানোর আনন্দ জাঁকিয়ে বসেছে। একটা ভবন তৈরি হবে। তার শুভলগ্নে নারকেল ভাঙা হল। প্রকৃতির দান নারকেল, ঝুনো বুদ্ধি যার, নীল আকাশের কোলো শোভা পায়। তার কপাল ফাটিয়ে শিল্পীদের ভাগ্যাকাশে নতুন দিগন্তের প্রতিশ্রুতিকর অনেক চেঁচামেচি হল সেদিন। শিল্পচার্য আশ্রমগুরু তখন নিজের গুরুভারে শ্রান্ত। এদিকে সামগান করা হচ্ছে ভগবানের কাছে কৃপা নির্ভর আব্দারে। শিল্পাচার্য তখন মাটিতে শুয়ে দিগন্তে মেলে দিয়েছে দুই পা, হেলাভরে অমাদের প্রবীণ জনসমাগমকে দেখাচ্ছে পদটিকা। তার সাধক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তখন তুড়ীয় আনন্দে ঘুমিয়ে পড়েছে। তীব্র রসের তাড়নায় তিনি ভাবনাক্রান্ত। তিনি পাগল-সুন্দর। ভুঁইফোড় শিল্পী। গাছের জন্মলগ্নে যেমন ভুঁইফোড় স্বভাব থাকে, তেমনি একরকম গেছো প্রতিভা তাকে অঙ্কুরিত করে চলেছে।

বটকৃষ্ণ গাছকে করে নীরব কাতর শ্রোতা। কাব্যরসে কাবু করেন তাদের। জুড়ি-বুটির শরীরের ভাস্কর্যে নাড়িভুড়ি উদঘাটন করেন। তবে কিনা গাছের শরীরে হস্তক্ষেপ করেন না কদাপি। আশ্রমের মন্ত্র "খোদার খাসির গায়ে ছুরি চালানো চলতে পারে, কিন্তু খোদার কাঠের গায়ে খুদগারি নৈব নৈব চ।" নিজের হাতকে কষ্ট দেন না, কলঙ্কিত করেন না কখনও। বনস্পতি স্বেচ্ছায় গুরুদেবের কাছে অত্মসমর্পণ করে দধীচির প্রেরণায়। তাঁর দিব্যকীর্তির ফলে ইচ্ছাপুরণ দেবী প্রতি রাত্রি-ভোরের সন্ধিলগ্নে তাঁকে গাছ পুতুল উপহার দিয়ে এসেছেন। দিকে দিকে সেই খবর রটে যায় টেলিফোনে। ইচ্ছাপুরণ দেবীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের সুড়ঙ্গদ্বারে নিবিড় শলাপরামর্শ চলে,-কার বাগানে অধখানা নির্জীব শুকনো কাঠ ধরাশায়ী হয়ে রয়েছে। হুড়দুম, দুমদাম বাবাজি ছুটে যায় সেখানে, হুলো বেড়ালের মতো আধখানা মালপোয়ার

সন্ধানে। কোনো কাঠগুদামে গাছের আদ্যশ্রাদ্ধ করা হচ্ছে তার ঠিকানা পেয়ে ছুটে যায় সেখানে। কাঠ গুদামের মালিককে সকাল-সন্ধা মলিন করে তোলেন বন্ধুত্বের অতিশয্যে। তারপর গুদাম থেকে বুড়ো কাঠ, ঝুনো কাঠ, ধারী কাঠ, সখা কাঠ, সখী কাঠ, বাহারি কাঠ চালান দেন আশ্রমে। গুদামের মালিককে শয্যাশায়ী করে ফেলেন নিজের আকর্ষণে। সে তখন চোখ আকাশে তুলে অসার শরীরে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চরণ করে, "গাছই সর্বশেষং। এতদিন কেন চৈতন্য হয়নি? ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল যে! কাষ্ঠং হরণং গচ্ছামি, আশ্রম বোষ্টম ভবামি, বটকৃষ্ট চরণং চেলামি।" ততক্ষণে অবশ্য গাছ গচ্ছিত হয়েছে আচার্যের বগলে, বগল বাজাচ্ছেন তিনি। বিকলাঙ্গ গাছ। যে বনষ্পতি পথিককে ছায়া দেয়, মানুষের সংসারকে ফলবতী করে- সেই গাছও মানুষের খেলাঘড়ে কৌতুকের বহ্নিশিখা হয়ে দাঁড়ায়। তাল তমাল বনরাজি। সেই বনরাজি এসে মেশে নীল অকাশের মেঘরাশির সীমানার সঙ্গে।



বটকৃষ্ট

প্রকৃতির এই বিশাল সংসার। অরণ্য প্রকৃতির উদ্দাম, উধাও রহস্যের সঙ্গে দু-চোখ বেঁধে কানামাছি খেলা করে চলেছি আমরা।

বাবাজির বাহারি গাছপুতুল অবালবৃদ্ধবনিতার কাছে রসপ্রিয়। কোনো ভনিতা না করেই বলা যায় সে কথা। একটা পারিবারিক মেলবন্ধন হয় সকল বয়সের মধ্যে। "দাদু খায়, নাতি খায় থিন এরারুট্ বিস্কুট।" হৃষ্ট মনে ফিরে যায় সকলে গাছের গৃহপালিত পোষা চেহারা দেখে। গাছের মূলকাণ্ডে দেখা যায় অচার্যদেবের অরণ্যবিজয়ের পতাকা। অরণ্যদেব তিনি। গাছের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা তার গৃহস্থ জীবন। সুখে-দুঃখে এদের সঙ্গে সপত্নীক ভালবাসা, বিপত্নীক কাতরতা, অপত্য স্নেহ, নবারুণ লজ্জা, কখনও তারা সখা কখনও তারা সখী কাঠ। গুরুদেবের চিন্তার গায়ে তাদের টুক্সী কেটে যায় ইচ্ছাপূরণ দেবী। অকাশবাণীর এফ এম অনুষ্ঠান শুনিয়ে ঘুম ভাঙানো হয়, নিজে ঘুমিয়ে পড়েন সঙ্গীতের ভরপুর তানে। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝে লুকোচুরি খেলা চলে এদের সঙ্গে।

. . . বটকৃষ্ণ নট্যকোম্পানিতে যোগ দিলেন সেদিন। গেছোবাবা সব গাছেই চড়াও হয়। নাটকের মঞ্চে শক্ত করে মাচা বেঁধেছেন তিনি। কাঠ এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে নির্ভিক শিকড় গেড়ে দাঁড়াল। কাঠ দিয়ে যোগ-বিয়োগ করে জীবনের কঠোর কাহিনী শোনালেন তিনি। কেউ কেউ কাষ্ঠ হাসি হাসল। বাদবাকি দর্শকের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছিল শোনা যায়। পুরাতন বটের সনাতন সাহিত্য শুনিয়েছিলেন সেই সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানের শেষে আশ্রমের চামেলিরা আশার কথা শোনাল ঃ—

"বাবাজির সাধক অঙ্গে লতাপাতা গজাবে, সেই ভবিষ্যৎ পুণ্য দিনটি এল বলে। সকলে অপেক্ষা করুন।" বনস্পতির নিরামিষ সাহিত্য-ভোজনে অনেকেরই নাকি পেট ভরেনি সেদিন। কয়েকজন অম্লোদগার করেছিল। বাবাজি উৎসাহিত হয়ে দর্শকের ধৈর্যকে ধন্যবাদ জানালেন। "আসছে বছর আবার হবে", এই ধরণের বদ্ধপরিকর প্রতিশ্রুতি জানিয়ে গেলেন সকলকে।

কোনো তৃণমূল গজায় না আনন্দনিকেতনে বটাবতারের চোখের আড়ালে, বিনা হুকুমে। প্রবাদ আছে আশ্রমপ্রহরীরা নিশীথ রাতে মাথা উল্টে গাছ থেকে বাদু-ঝোলা হয়ে থাকে। গাছকে উল্টে দেখা আশ্রমের দর্শন। গাছের উল্টোপুরাণ। তেরাত্রি ঝুলে থাকলে প্রহরীদের চৈতন্য হয়, বটকৃষ্ণের চেলা হিসেবে অশ্রমিক "সভ্য" মর্যাদা পায়। নতুন গাছ দেখলেই শীর্ষাসনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শিবনেত্র হয়ে সেলাম জানায়।

ভাগ্যহীন গাছপ্রাণ,
গলায় লম্বি গুরুজির নাম,
গাছের জন্ম—অধিকার
বাবাজির স্বাক্ষরের তরে সয়ে অপেক্ষাভার।

উজ্জ্বল হাসির পায়রা

এক

কৈশোরে মাতুলালয়ের স্মৃতিচারণ অনেকেই করে থাকে। আমারও মনের এক জানালা খোলা সেই দিকে। দক্ষিণ কলকাতার অনুপম সুন্দর ঢাকুরিয়া লেকের কাছে লেক টেরেসের ভাড়া বাড়িতে অবসর জীবন যাপন করে গেলেন আমার দাদামশায়। শুনেছিলাম দেশ ভাগের সময় দাঙ্গা তাড়িত হয়ে সুন্দর ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন কিছু সেলামী দিয়ে। গৃহস্বামী মেয়ে-জামাই একই কারণে বিপন্ন হয়ে প্রার্থী হয়েছিল, কিন্তু সেলামী দিতে সক্ষম নয় তাই এই প্রস্তাবে তার মন গলেনি। দাদামশায়ের ছয় ছেলে, পাঁচ মেয়ে নিজেদের পরিবার সহ প্রথমে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করলেন এই নিবিড় অস্তানায়। বাড়ির পরিবেশ ছিল উজ্জ্বল, মুখর। জীবনের খোরাক ছিল ঝলমলে কৌতুক। হাস্যরস পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কথায়, ব্যবহারে, এমনকি পোশাকেও ধরে রাখা পরিবারের নিপুণ বৈশিষ্ট্য ছিল। বলব সেই কথা। অবশ্য অদৃষ্ট পুরুষ নিজেও মানুষের সঙ্গে অকরুণ কৌতুক করেন, বোধহয় খেলা-ভাঙার খেলা করেন। রসবোধ কেউ শেখায়না। নিজের মেজাজেই কোন এক পরিবারে ভর করে। রসের ভূত মাথায় চাপালে দুঃখের দিনেও মন হাল্কা হয়ে যায়।

বাড়ীর বিপরীতে ছিল বজরঙ ব্যায়ামাগার। এখনও আছে। ইদানিং সেখানে বেশ জাঁক ক'রে বজরংবলির পুজো হয় মন্দির তুলে। দক্ষিণা আয় হয় বেশ। সেই পরিমাণে শরীর চর্চা হয় কিনা সে প্রশ্নটি মন্দিরের ভীড়ের আড়ালে ধুপ-ধুনায় ধোঁয়াটে থেকে যায়। গোড়াতে অবশ্য শরীর চর্চার এই মন্দিরে অনেকে নিয়মিত শরীর পাত করত, বীর হনুমানের মতো শালপ্রাংশু চেহারা ছিল তাদের। আমাদের অতি পরিচিত ছিল চুনীদা। রোজ নিয়মকরে বিকাল পাঁচটায় অখড়ায় নেমে পড়ত, বিহারী এক পহলওয়ানকে নিয়ে লোফালুফি করত। পালোয়ান বেচারা ছিল কুস্তীর মাইনে করা ওস্তাদ। বিকেল পাঁচটায় চুনীবাবুর গলার হুঙ্কার শুনে পাড়ার সচকিত লোকেরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত। শিষ্যের হাতে গুরুর এই দুর্গতি দেখে অনেকেই বুদ্ধিমানের মতো কুস্তীর আখড়া সন্তর্পণে এড়িয়ে চলত। শেষ পর্যন্ত চুনীদার দিগ্বিজয় যাত্রা শেষ হয়েছিল অপ্রত্যাশিত ভাবে। বার্ষিক কুস্তী প্রতিযোগিতা। চুনীবাবুর প্রতিদ্বন্দি কর্পোরেশনে সামান্য চাকরী করে। বাবড়ী চুল, কবিতা লেখার শখ আছে, তবে সংস্কৃতে। ভগবান স্বাস্থ্য ভালই দিয়েছেন। চুনীদার হাতে বলীর পাঁঠার মত নধর। কুস্তী শুরু হ'লো। এক লহমায় চুনীদার লৌহকপাট বজ্র আলিঙ্গনে সেঁদিয়ে গেল সে। পরের দৃশ্য অভাবনীয়। চুনী পালোয়ানের আর্ত চিৎকার, খিল খিল হাসি, কাশ্মীরের খিলনমার্গ ধ্বসে পড়বে বুঝি। "আমাকে রক্ষা করো, ছোঁড়া আমারে কাতকুতু দিয়া গঙ্গাযাত্রা করাইবে, আমি তো আর নাই। এই পোলাপানের মাথায় শয়তানের বুদ্ধি। অই, অই, আমাগো প্যাটে চুমা খাইতাছে। ওরে ডাক্তারের মানা

আছে—আমার বড় হাসি পায়। হাসি থামান যায় না।"

..."ছোড়া, আখড়ার নিয়ম কানুন জানা নেই? আমারে হাসায়ো না—আমাগো কান্না পায় যে! কে তোরে এই অপকর্ম শেখাইল, আমার পোলাটা নিশ্চয়। যেমন বাপ, তেমনি পোলা আমার।" চুনীবাবু পরম বিক্রমে মাটি নিল, ভূমিকম্পের মতো প্রকম্পিত হ'লো শরীরটা। আমরা দর্শকের শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে প্রথমটা ভ্রম করলাম নক্সা হচ্ছে বুঝি। হয়তো ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। চুনীদা একেবারে চিত। নবাগত কুস্তীগীর এবারে কানে কানে চুনীদাকে কী যেন গূঢ় তথ্য জানাল। চুনীদার হাস্যযন্ত্রণা কালবিলম্ব না করে একেবারে প্রশমিত হয়ে গেল, দমে গেল সম্পূর্ণ। "কী কইলে? স্পীচ দিতে হবে, ফেয়ারওয়েল স্পীচ? ইংরাজীতে পারুমনা। আমার তিন পুরুষ ইংরাজী কয় নাই। তার আগে অমন ভাষা আছিল কিনা জানা নাই। আমি বাড়ী যামু, আমার ঘাম আইতাছে। সুড়সুড়ি সয়ন যায়, কিন্তু ইংরাজী, সে বড় লজ্জার ব্যাপার।" সেই দিন চুনী পালোয়ান, অনেক লড়াইয়ের সাক্ষী, আখড়া ছেড়ে চলে গেল বীরের আসন শূন্য করে। পালোয়ানী ছেড়ে রসের কড়াই চাপিয়ে বসল বড় রাস্তায় দোকান



নিয়ে। মিঠাইয়ের দোকান। যারা সারা দিন গুলতানী ক'রে দিনটাকে জাহান্নামে পাঠায়, আবার রসের যোগান দিয়ে চলল চা ও তেলেভাজা সহযোগে। আমরাও দোকানে গেছি, অম্লরসের উদ্গার ক'রে ফিরে এসেছি ভুক্তভোগী হয়ে। ক্রমশঃ চুনীদার পালোয়ানী গঠনটা উদরস্ফীত ময়রাপানা হয়ে [illegible] দেখাত।

দুই

আমার দাদামশায়ের বাড়ী শনি-বাসরীয় ও রবি-বাসরীয় কোলাহলে কল্লোলিনী হয়ে জমে থাকতো। সপ্তাহান্তে আত্মীয়রা দিনাবসানে পালতোলা নৌকোর মত নোঙর



ফেলত সেখানে। দরজায় চটি জুতো ছত্রাকার। কার সম্পদ কে তুলে নিয়ে গেল পায়ে, ফেরার পথে তা ঠাওর করা যেত না। কার পাদুকা কে পায়ে বহন করে এনেছিল, সেই গোড়ার কথাটাই জানা ছিল না যে! এমন হরণকারী চরণবিদ্যা পায়ের তলায় হেলাফেলা করত তারা। তেমনি জামা কাপড়ের একটা বিভ্রান্তকারী এ-গায়ে, সে-গায়ে যাতায়াত ছিল অনায়াস ক্ষিপ্রতায়। মনে পড়ে আমি তখন ইউনিভার্সিটীতে পড়ি। নিয়মিত ক্লাশ চলে কফি হাউসে। হাত খরচের বড় জরুরী প্রয়োজন, নইলে বান্ধবীদের নিয়ে পূর্বরাগের হাতে খড়ি হয়না, তাদের বীরাঙ্গণা ক্ষুধা মেটানো যায়না। ভবিষ্যত সংসার বড় অন্ধকার ঠেকত। ছোটমামা আছে বিজ্ঞাপন অফিসে, বেশ বিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত চেহারা। পোশাকে-আশাকে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে চলে আমাদের হ্যাংলা দৃষ্টির সামনে। ছোটমামা প্রশ্রয় দিয়ে বললে "আমার অফিসে একটা ইন্টারভিউ দে, মার্কেট সার্ভে করা হবে টেম্পরারি হাতে"। ঘোষণা করে অফিসে গেল সে। কিন্তু আমার তো চাকরী সন্ধানী উপযুক্ত জামা নেই। তবে নরনাং মাতুলক্রমঃ। তারই এক জামা গায়ে চাপালাম, হলদেপানা গরদের সার্ট, বেশ জামাই শ্রী খোলে। গায়ে চড়িয়ে মামার মনের কথা খানিকটা বোঝা গেল। মাথায় চপচপে তেল মেখে, মধ্যিখানে সিঁথি টেনে ঘর্মাক্ত ললাটে উপস্থিত হলাম অফিসে। সঙ্গে আমার ছাত্রবন্ধু। এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাই আমরা। অসামান্য দীনতায় ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে উপস্থিত হলাম ঝড়ে পড়া ভগ্নতরীর মতো। ও হরি! সামনে ছোটমামা সিগারেট ধুমায়িত করে চলেছে জটিল জ্যামিতিতে। পাশে এক অগ্নিশীখা, কালো কুন্তল চুল, ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে চলেছে। মহিলার নাম

খেয়ালি নন্দী। অমরা দুই বন্ধু নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো আমাদের একমাত্র কোয়ালিফিকেশন জানালাম যে আমরা বেকার। আমাদের সামনে হর-পার্বতীর আসন টলল, খেয়ালির খেয়ালে বিচার হ'লো কোয়ালিফিকেশন সত্যিই জোরালো। অস্থায়ী চাকুরী মঞ্জুর। রাস্তায় এসে আনন্দের জোয়ারে সিগারেট ধরালাম, গায়ের জামা আগুনের ছেঁকায় একটু ছিদ্র হ'লো। অফিস থেকে ছোটমামা ফিরে এল গনগনে মেজাজে। চটে বলল, "যে জামাটা খেযালী আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল, সেটা পড়েই তার সামনে গেলি হনুমানের মতো। চাকরীও হয়ে গেল, আমার ইয়ে, মানে প্রেষ্টিজ ডুবিয়ে। এখন থেকে কী আমারই প্যান্ট শার্ট চড়িয়ে অফিসে যাতায়াত হবে"? তাই শুনে আরেক মাতুল মন্তব্য করল, "তোর চেয়ারেই অফিসে গিয়ে বসবে হয়তো, বলা কি যায়"?

জানিনা আজ গল্পের মেজাজে সেদিনকার পরিবেশ ধরে রাখতে পারছি কিনা। সেদিনগুলি ছোটবেলার পলাতকা ঘুড়ির মতই চলন্তিকা কালের পাঁজরে লুকানো নির্বাসিত বেদনা। এখন আমি ভাবনার, তেপান্তর মাঠে। ছোটমামার অগ্রজ রুনুমামা, গোপনে নাম দিয়েছিলাম ক্লাসিকাল মামা। কারণ উচাঙ্গ গান ছাড়া অন্য গান তৃণসম দগ্ধ করে দিত। এই সব কথা নিয়ে নিয়মিত বচসা ছোটমামার সঙ্গে। কথা কাটাকাটির তুবরী ছুটত, বিশেষ ক'রে ভাতের থালায়। রুনুমামা বলল, "আধুনিক গান পান বিড়িওয়ালাদের মানায়"। ছোটমামা অমনি জবাব দিল, "কেন, তোমাদের বড়ে গোলাম আলি যখন গায়, তিরছি নজরিয়াকে বান, তখন অশ্লীল শোনায় না?" বড়পিসীর ছেলে ভানুদা। রুনুমামার সমবয়সি। মামা-ভাগ্নের চতুর রসিকতা আজও কানে বাজে। ভানুদার মস্ত শরীর, বারবেল ভাঁজা চেহারাটা। রুনুমামা ফর্সা, সাফ-সুরত, হাওয়াতে চলে হাল্কা মানুষ। খানিকটা সাহেবিয়ানা আছে মেজাজে। ভানুদা ব্যায়াম সেরে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাতে তুলে নিত খোলা ভোজালী। গান ধরত, "শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।" গানের তানের সঙ্গে রুনুমামাকে গ্রাস করত কঠিন আলিঙ্গনে।... ক্লাসিকাল মামা বিয়ে করলেন। তাঁর শর্ত ছিল শ্বশুর বাড়ী এমন হওয়া চাই যারা মার্গসঙ্গীত পছন্দ করে। বিয়ের দিন বড়যাত্রীর গাড়ী চড়ে আমি ও ভানুদা চলেছি। বিয়ে বাড়ীর কাছাকাছি কানে এল সানাইয়ের ভরপুর তান। মামা নড়ে চড়ে বসে বলল, "পরিবারটা বেশ, নারে ভানু? রুচি আছে স্বীকার করতে হবে।" ভানুদা উত্তর দিল, "ক্রমশঃ প্রকাশ্য।" প্রসন্নমনে গন্তব্যস্থলে এসে পড়লাম। এদিকে 'বর এসেছে' ডাকে ডাকাত পড়তেই সানাই বন্ধ, মাইকেশুরু হ'লো হিন্দী গানের সুরে ব্যান্ড। আমরা বজ্রাহত। ওদিকে গোদের ওপর বিষফোড়া। রুনুমামার হাটার তালে ব্যান্ড স্বচ্ছন্দে তাল মিলিয়ে চলেছে। ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার। কিছুতেই এই তালের ফাঁদ কাটিয়ে উঠতে পারছে না বরের অড়ষ্ঠ পা। ভানুদা আমার কানে কানে বলল, "হাঁদা, কিস্যু বুঝিসনা, সানাইটা ওদের বায়না করা, আমার ব্যান্ড ভাড়া করা।" নরানাং মাতুলক্রমঃ, কিংবা একটু বেশী বটে!

আমার বহুল মাতুলের অতুল কথাসাহিত্য মনে ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। জীবনের রঙ খানিকটা ফিকে হয়ে গেছে কিনা। আপন মামা ছাড়া নাতিদূর সম্পর্কের মামারাও আছে। পরিহাস সাহিত্যের প্রতিবেদনায় তাদের আত্মত্যাগ কম নয়। এমনি এক তপন মামা, এয়ারফোর্সে ছিল মিলিটারী গোঁফ মজবুত শরীর, অবসর সময়ে অরবিন্দের বিশাল ইংরাজী বই পড়ত, যাতে আমাদের দাঁত ভেঙে যেত। একটু বোহেমিয়ান ছিল। একদিন ভগবানের দান সবকয়টা কাঁচা দাঁত তুলে আসল বীরের মতো। কেন না বড়ভাই দাঁত তুলতে কাপুরুষতা দেখাচ্ছে। (আমাদের পারিবারিক ডাক্তার সন্দেহ করত মামারা সকলেই কমবেশী পাগল-সুন্দর)। যাইহোক, ঘটনাটা শ্রী অরবিন্দের প্রভাব বা তাঁর পরিহাস ভেবে বহুকাল অরবিন্দের পথে পা মাড়াইনি। তপনমামার সহোদর ভাই কালিমামা আমাদেরকে ছোটবেলায় শোনাত অবিকল হেমন্তের কণ্ঠে শচীন কর্তার। একবার নাকি বেতার জগতের সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান সূচীতে দুজনের নাম উল্টেপাল্টে গিয়েছিল, আর তাঁরা গলা পাল্টে গেয়েওছিলেন। কলিমামার মুখে শোনা।

তিন

বড়মামার কিছু কাহিনী বহুল প্রচলিত আছে। টুকরো ঘটনা, তাৎক্ষণিক গল্পের ফানুষ হাওয়ায় ভাসানো। জনপ্রিয় গল্পের মতই নানান মুখে প্রশ্রয় পেয়ে চিত্রিত হয়ে উঠেছে সেগুলো। প্রথম গাড়ী কিনল শোনা যায় সাতশো টাকা দিয়ে। শখ হ'ত সকলকে অরোহণ সুখ দেবে। আমরা সেটা এড়িয়ে চলতাম সযত্নে। সেটা আসতে দেখলে নীচু হয়ে গাড়ী তলায় তলিয়ে দেখতাম কোন দ্বিপদ প্রাণী পেছন থেকে ঠেলে আনছে কিনা। গাড়িটার আবার এই ধরনের আয়েস ছিল, প্রায়ই হ'ত সে ধরনের বিপদ। একমাত্র রুনুমামার ভারী ইচ্ছে ছিল গাড়ীটা চালায়। বড়মামা সেটা দিতনা। একদিন সকালে দাড়ি কামিয়ে অফিসে যাওয়ার আন্দোলন করছে। উদার সুরে ছোটভাইকে ডেকে বলল, "রুনু, গাড়ীটা গ্যারেজ থেকে নিয়ে আয়তো।" বলা বাহুল্য, এই সুযোগ সদ্ব্যবহার করা উচিত। রুনুমামা ফিরল গাড়ী ঠেলে ঘাম শরীরে। বলল, "দাদা, স্টার্ট নেওয়া তোমার গাড়ীর ধাতে নেই।" জ্যেষ্ঠভ্রাতা অম্লানবদনে জবাব দিল, "চলবে কেমন ক'রে, কাল ব্যাটারী খুলে রেখেছি যে"!

কিছু গল্পে আছে চিকিৎসা সংকট ঘটিত। দাঁত নড়েছে,-ব্যাথার যন্ত্রণায় মামা কষ্ট পাচ্ছে। ডাক্তার মামার পরিচিত। কিন্তু মামা কেবলই এড়িয়ে যায়। দাঁত তোলায় বড় ভয়। একদিন মরিয়া হয়ে বধ্যভূমিতে যেতে হ'ল। সঙ্গে আমাকে নিল। ডাক্তারের চেম্বারে তখন রুগী, আমরা পাশের ঘরে,-ঝড়ের হাওয়ায় ঝরা পাতার মতো বসে আছে বড় মামা। এখন সময় পাশের ঘরে আর্ত চিৎকার, 'বাবাগো'। মামা এক পা

বাড়াল নিষ্ক্রমণের জন্য। ডাক্তার ছুটে এসে, পরাস্ত করলে তাকে। রুগী বয়স্কা মহিলা। দাঁত তোলার পরে সান্ত্বনার সুরে বললে, "কষ্ট তেমন কিছু হয়নি। পয়সা দিয়ে দাঁত ওঠালাম। একটু আহা উহু করতে পারবনা?" এবার মামাকে যেতে হ'ল ভেতরে। নানান প্রশ্নে উত্যক্ত করে তুলল ডাক্তারকে। "...এত যন্ত্রপাতি কী দরকার। এগুলো কী না হ'লেই নয়...", ইত্যাদি। ডাক্তারও উত্তেজিত হ'য়ে বকবক ক'রে চলেছে সমানতালে। তারপর অনেক অধ্যবসায়ে রুগীকে ম্যানেজ ক'রে ঝুঁকে পড়ে দাঁত তোলার উপক্রম করেছে সে। মামার আর্ত চিৎকার "বাবাগো।" ডাক্তার স্তম্ভিত হয়ে বললে, সে দাঁতে হাতও দেয়নি।—"ডাক্তার তুমি আমার বাঁ পায়ে বুড়ো আঙুলে ব্যাথা দাঁড়িয়েছ।"—এবার রুগীর কাতর। ডাক্তার ঘোঁত ঘোঁত করে পেছিয়ে এসে এবার দ্বিতীয় চেষ্টা করল আক্রমণের ভঙ্গীতে। দাঁত উঠে এল, রক্ত উঠলনা। শুকনো কাজ। ডাক্তারের মুখও শুকনো। শুধু একটা জিজ্ঞাসা বেরিয়ে এল, **"bloodless coup?"** মামা ঘোষণা করলে **Anemia**; দাঁত দেব, কিন্তু রক্ত দিতে হবে এমনতো শর্ত নেই।" ফ্যাকাশে মুখে তড়িঘড়ি ডাক্তারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে গাড়ীতে চেপে বসল। আমি বললাম, আশ্চর্য্য কাণ্ড। বড়মামা এবার থলি থেকে বেড়াল বার করলেন। "ছেলেবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার দাঁত ভেঙেছিল। সেই থেকে একটা বাধানো দাঁত ছিল। ভূল করে সেটাই উঠে এসেছে। এখন ব্যাথা নেই। বাড়ী চল।"

...কলকাতায় সাধারণ, অসাধারণ, হাতুড়ে সব ধরনের ডাক্তারের সঙ্গে খাতির জমায় মামা। এক সন্ধ্যায় পাড়ার ডাক্তারের কাছে যাওয়া হ'লো। এক মারোয়ারী ভদ্রলোক তার হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে এনেছে। ছেলেটি একমাস হ'লো বেশ হাঁটতে শিখেছে। কিন্তু আজ কেবলই দু-পা হেঁটে গড়িয়ে প'ড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ডাক্তার রোগের কারণ ধরতে পার। তাকে দক্ষিণা দিয়ে শুকনো মুখে পিতা ও পুত্র ফিরে যাচ্ছে। এমন সময় মামা নামাল ছেলেটিকে তার বাবার কোল থেকে। হঠাৎ তার পরনে ছোট প্যান্ট টান দিয়ে খুলে ফেলে আবার সেটা পরিয়ে দিলেন। বাচ্ছা এবার অনায়াসে দিব্বি হেঁটে চলল। সকলে চমৎকৃত। কেমন করে সম্ভব? মামা ফাঁস করল, ছেলেটির দুই গোদা পা প্যান্টের একটা গর্তে প্রবেশ করেছিল, তাই এই দুর্বিপাক। মারোয়ারী ভদ্রলোক বললেন "মেরা **fees** বরবাদ হয়ে গেল।"

স্কুলে **country mouse** আর **town mouse** এর কাহিনী জেনেছিলাম। আমার মাতুল **town mouse**। পড়াগাঁয়ে যেতে তাঁর কিছুতেই ভরসা হয়না। আমার পিতামহ থাকতেন বিহারে পূর্নিয়া জেলায় এক গ্রামে। অতঃপর বড়মামার মুখেই শোনা পরবর্তী কাহিনী। "তোমার ঠাকুর্দা অনেকবার আমাকে লেখালেখি করাতে নিরুপায় হয়ে একবার যেতে হয়েছিল তোমাদের বাড়ীতে। প্রাণ পকেটে নিয়ে ঐ সাপখোপের জায়গায় সাতদিন কেটে গেল। বেদম হেঁটে আর প্রচুর খেয়ে কাহিল

হয়ে পড়েছিলাম। এবার বোঁ করে কলকাতায় ফিরতে পারলে হয়। ফেরবার আয়োজন হ'লো। উনি বললেন, 'বরুণ, তুমি হাতি চেপে ষ্টেশনে যাবে।' কাছারী ঘরের সামনে খোলা মাঠ। প্রকাণ্ড এক হাতী এনে দাঁড় করানো হ'লো সেখানে। পোষা হাতী, কিন্তু স্বাধীন মেজাজে চলে, ওঠা, বসা, চলা তার আপন ইচ্ছে মতো। হাতীতে সওয়ারী হওয়ার আগে ধুতিতে মালকোঁচা দিলাম। বল্লমসহ কয়েকজন সেপাই হাতিকে ঘিরে দাঁড়াল। যাতে সেটা বাড়ীর ভেতরে ঢোকার উপক্রম না করে। মাহুত বহুত ডাঙশ চালাল, হাতীও শুন্যে শুঁড় ঘোরালো। তারপর হঠাৎ খেয়াল মতো বসে পড়ল। জয় মা কালী, বলে হাতীর পিঠে নিজেকে সঁপে দিলাম। হাতী রওনা দিল। বাড়ী ছেড়ে আমবাগানের মধ্যে। ষ্টেশনের রাস্তায় যাওয়া তার রুচি হ'লনা। পিঠে সওয়ারীরা শুয়ে পড়েছে। গাছের ডাল সর্বাঙ্গে আঁচড় দিচ্ছে। এবার এক ডোবায় হাতী নেমে দাঁড়াল, বোধহয় স্নান করতে চায়। শুঁড় দিয়ে জল তুলে সকলকে স্নান



করালো। দূরে স্টেশনে ট্রেন বাঁশি বাজাচ্ছে, ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। গ্রামের অতিথি শহরে ফিরবে, তার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছে। হাতীও বুদ্ধিমানের মতো এবার স্টেশনের পথ ধরল উল্টোপথে এক মৌলবী আসছে ঘোড়ায় চেপে। হাতীকে দেখে সসম্ভ্রমে নেমে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়াকে এক চাবুকের অঘাত দিয়ে নিজে দৌড়াল মাঠের মধ্যে। ঘোড়াও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পালিয়ে বাঁচল। হাতী চলেছে গদাইলস্করী চালে, গলায় ঘণ্টা বাজছে, ক্রমে স্টেশনে এসে পৌঁছে দিল আমাকে।

এবার কয়েক মিনিট অধীর প্রতীক্ষা,-হাতী বসবে কতক্ষণে? শেষে অবশ্য দয়ার সাগর ঐ অবলা প্রাণী মুক্তি দিয়েছিল। কলকাতায় ফিরে তোমার দাদুর চিঠি পেলাম, 'বরুণ, তুমি ভগবানের কৃপায় নির্বিঘ্নে স্টেশনে পৌঁছাতে পেরেছিলে। তারপর হাতী সাতদিন পরে বন-বাদাড়ে ঘুরে বাড়ী এসেছিল, মাহুত ফেরে পায়ে হেঁটে।'

চার

কৌতুকের রঞ্জন বড় মামার কর্মজীবনেও পাওয়া যায়। কিছুটা সে বাস্তব সত্য, অনেকটা কল্পনার তুলিতে তাকে খেলিয়ে তোলা। পেশাতে তিনি চিত্রশিল্পী। প্রথম জীবনে প্রতিকৃতি আঁকবার বায়না পাওয়ার জন্য ঘুরত খদ্দেরের বাজারে। এই অনুপ্রেরণায় একদিন উপস্থিত হল হাই কোর্ট প্রাঙ্গনে। দেখলো মামলা চলেছে দুই ভাইয়ের মধ্যে। বাবা জমিদার, উইল করে সম্পত্তির সিংহভাগ দিয়েছে বড় ছেলের নামে। ছোট ছেলের উকিল নালিশ করছে, "ধর্মাবতার, উইল হয়েছে অন্যায়ভাবে। জমিদার মশায় সুড়সুড়িতে কাতর হয়ে পড়েন। **He has a fatal afflication to the act of titilation**। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কাতুকুতু দিয়ে তাকে উইল লিখতে বাধ্য করেছে বড় ছেলে।" ছোট ছেলের সঙ্গে আলাপ হতে সে সাগ্রহে বলল বাবার একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিতে, যাতে বাবার মন পাওয়া যায়। ঠিকানা নিয়ে পরদিন মামা গেল বর্দ্ধমানে। গ্রামের মধ্যে জমিদারী কাছারী, হল সেখানে অতিথি। ছোট ছেলে আপ্যায়ন করল। কিন্তু মুস্কিল, কর্তামশায়কে সামনে বসিয়ে তার ছবি আঁকা যাবেনা। প্রাতে তিনি হাওয়া খেতে যান। তারপর তৈলমর্দন, আহার, এবং দুপুরে নিদ্রা। বিকেলে আবার হাওয়া খেতে যান, সন্ধ্যাবেলা বাবা কি করেন ছেলে নিজমুখে বলতে লজ্জা পেল। রাত্রে নিদ্রা। অগত্যা স্থির হ'ল ছোটছেলের মুখ এঁকে তাতে এক রাশভারী গোঁফ বসিয়ে দেওয়া হবে। তাহলেই বাবা এ ছেলের মুখ সেই ছবিতে সামিল হয়ে যাবে।

...সাতদিন ধরে ছবি আঁকা চলল। অন্দরমহলে মাঝে মাঝে জমিদারের হাস্যযন্ত্রণার কাতর আওয়াজ শোনা যেত। ফিরে আসার দিন জমিদারের সঙ্গে মধ্যাহ্নের আহারের আমন্ত্রণ এল। খাবার ঘরে পিড়ি পেতে খাওয়ার রেওয়াজ। বড়কর্ত্তা এলেন। পরনে ফিনফিনে শান্তিপুরী ধুতি — পেটে চর্বির ঢেউ হিল্লোলিত। আসনে বসে প্রচুর ব্যঞ্জন সাজিয়ে মাঝখানে বিরাজ করছেন তিনি। ছোটছেলে তথৈচব। কিন্তু নাকে এল কাদার গন্ধ। কর্তা বললেন, দ্বিধা করবেন না, গ্রামের সব খাবার টাটকা। এবার ছোটছেলে কাদার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চন করল। জমিদার গিন্নী তদারক করছেন, ঘোমটার আড়ালে মাথা নেড়ে তিনিও সায় দিলেন। কর্তার খাস চাকর হঠাৎ তাঁর পেটের খাঁজে হাত চালিয়ে আবিস্কার করল এক কচুরীপানা।

পুকুরে স্নান করতে নেমে অঙ্গে তুলে এনেছেন। এদিকে পরিচারকের আঙুলের স্পর্শে হিল্লোলিত হ'ল তাঁর শরীর, ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলেন। খিলখিল শব্দে হেসে অজ্ঞান হয়ে গড়িয়ে পড়লেন মেঝেতে।

... একবার এক কুকুর পোষা হ'ল। করপোরেশন চিঠি দিল কুকুরের জন্য লাইসেন্স কেন করা হয়নি জবাব দাও। কুণ্ঠিত ভাবে মামা গেল সেই অফিসে। দারোয়ান দেখিয়ে দিল হল ঘরের মধ্যিখানে বড়বাবুর দিকে। একটি গল্পচক্রের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে সে। অনেকে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। রক্তকরবীর নাটকের হচ্ছে। শম্ভু মিত্র দূর্গের আড়াল থেকে বলছে, "নন্দিনী, এখন বিরক্ত করোনা। এখন দেবতার পূজার সময়।"...

তৃপ্তি মিত্র বলছে, "রাজা, দেবতার অপেক্ষা করার সময় আছে, মানুষের নেই, দরজা খোলো।" এমন সময় পাশে দাঁড়িয়ে বড়মামা বলল "স্যার।"—নাটকে ছেদ পড়ল। ভ্রকুটি করে বড়বাবু বললে, কী চাই?-"আমার লাইসেন্স চাই।... না মানে, কুকুরের লাইসেন্স চাই ... কুকুরের আমি...।" সমবেত জনতা মুগুর পেটানোর মতো বলল —"ছি, ছি, কিসের মধ্যে কী কথা?" বড়বাবু ফেটে পড়ল, "আপনারা শিক্ষিত লোক, বাড়িতে বিপজ্জনক জন্তু পুষেছেন, অথচ লাইসেন্স করেননি, জানেন ওটা **man-eater** হয়ে যেতে পারে? আপনার কুকুর তুলে আনা হবে"। আবার রক্তকরবীর পালা শুরু হ'ল। মামা পরাস্ত হয়ে ফিরে আসছেন। দারোয়ান ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল "দশটা টাকা দিন, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" টাকা হাতে দারোয়ানের সঙ্গে আবার ভেতরে চলল।

আউট্রাম ঘাটের-এর ধারে স্টেট ব্যাঙ্ক। সেখানে তীরের গতিতে মামা ছোটাপুটি করছে। টাকা তুলবে, আর দুই মিনিট পরে **Cash Counter** বন্ধ হয়ে যাবে। চেক লিখেছে। কিন্তু একটা ভুল্ল বেরিয়েছে তাতে। মুস্কিল-আসান যে ভদ্রলোক বসে আছে হলঘরে এক কোণায় বুদ্ধের মত। টেবিলের প'রে এক বিড়াল চোখ বুজে বসে আছে। ভদ্রলোক তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। চুম্বকের টানে মামা সেখানে এসে অনুরোধ করলে, "আপনার সই পেলে টাকা তুলতে পারব।" বেড়াল এক চোখ তুলে তাকাল। ভদ্রলোক অতিকষ্টে হাতে কলম তুলে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই উদ্যত কলম হাত থেকে পড়ে গেল। মামা বললে, "কী হ'ল স্যার।"-"দেখছেন না, গঙ্গায় বান এসেছে সকলে দেখতে যাচ্ছে,—।" ঐ কথা বলেই ভদ্রলোক ছুটল বারান্দার দিকে। সেদিন মামা খালি হাতে বাড়ী ফিরে এল।

বড় মামা আর্ট কলেজ থেকে গোল্ড মেডেল নিয়ে পাশ করে প্রথম জীবনে তেল রঙে প্রতিকৃতি আঁকল অনেক নামি দামী লোকদের। তার চিত্রকর জীবনের প্রভাত-সংগীত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহেব, বিবি, গোলামের তাসের দেশে সাধনা লাভ করেছিল। এদের সুবাদে হরেক রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। একবার এক বাঙালি ধনী

ব্যবসাদারের পক্ষপুটে আশ্রয় পাওয়া গেল। নাম হরিতকি পতিতুণ্ডি। ডালহাউসি পাড়ায় ভদ্রলোকের অফিস। সামনে বড় অক্ষরে লেখা আছে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। মহিলা সেক্রেটারি-সতীলক্ষ্মীর মতো চেহারা, মামাকে নিয়ে গেল অফিস ঘরে। লম্বা ঘর, জায়গা জুড়ে লম্বা সুপরিসর টেবিল। শেষের দিকে ঘোরানো চেয়ারে ঘোরালো এক ব্যক্তি, দেখে মনে হয় ক্ষুদ্রকায় নেপোলিয়নের জোরালো সংস্করণ। তরুণ আর্টিস্টকেদেখে সে বলল, "তুমি বরুণ মৈত্র? খাসা চেহারা তোমার, প্রতিশ্রুতি আছে তোমার মধ্যে। তুমি মুণ্ডু আঁকতে পারো? আমার বাবার মুণ্ডু আঁকতে হবে।"

—আজ্ঞে আমি **potrait** আঁকি।

—ঐ একই ব্যাপার। তবে একটা শর্ত আছে। তুমি আমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট মানতেই হবে। সুতরাং আমি যা করতে বলব নির্ভয়ে তাই সেরে ফেলবে। কোন তক্ক করা চলবেনা। নির্ভয়ে কাজ করো, উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলবেই।

—স্যার, আমি রাজি।

—তবে যাও, এঁকে ফেল বাবার ছবিখানা, দাঁড়িয়ে থেকে দণ্ড দিও না নিজেকে।

---কিন্তু আপনার বাবাকে দেখলাম না, ছবি আঁকব কী করে?

—হক্ কথা, তোমার বুদ্ধি আছে, সিদ্ধিলাভ করবে তুমি। কিন্তু বাবা তো জীবিত নেই।

—বাবার ফটো আছে কী?

—"এটা একটা জজে মানা কথা বলেছ। এই নাও একটা চিঠি লিখে দিলাম। ঠিকানা দেখে চলে যাও। সেখানে গেলে একটা ফটো দেওয়া হবে তোমার হাতে। পাওয়া মাত্র আমার কাছে চলে আসবে।"

তাই হ'ল, বরুণ গেল সেই ঠিকানায়। পাঁচতলা বাড়ী। লিফ্‌ট্ উঠছে নামছে। তিন তলায় যেতে হবে। কিন্তু ভারী মুস্কিল, লিফট্ থামছে পাঁচতলায়, উপেক্ষা করে যাচ্ছে অন্যান্য তলাতল। মামা ভেতরে, কিন্তু পাঁচতলা ব্যতিরেকে অন্য কোথাও লিফটের দরজা খুলছেনা। পাঁচতলায় আরেক সমস্যা। সেখানে এক **alsatian** কুকুর আছে লিফটের দরজা আগলে, দন্তবিকশিত ক'রে পেট থেকে এক অপার্থিব ঘড়ঘড় শব্দ বার করছে। এই অপরূপ সমস্যার জটাজাল কাটিয়ে কাহিনী কী করে এগোয়? তবু অসাধ্যসাধন ক'রে মামা এল তিনতলায়। গৃহস্বামির হাতে চিঠি দিয়ে সংগ্রহ করলেন একখানি ফটো। গৃহস্বামি এ্যাডভোকেট, মন্তব্য করল "বাবার ছবি আঁকা হবে বুঝি? বাবা ছিলেন হাই কোর্টের জজ। জানতাম আমার বাবার ছবি একদিন কোর্টে টাঙানো হবেই"।

পরের দিন পতিতুণ্ডির অফিসে কাহিনী এগিয়ে চলল। সে বলল, "বরুণ, তুমি এই ফটোর প্রথমে ড্রাফ্‌ট্ আঁকো পেন্সিল দিয়ে।"—"কেন?" মামা প্রতিবাদ করল।—"তক্ক করবে না, আগেই বলেছি। একটা পেন্সিল ছবি আমাকে এনে দেখাও,

সঙ্গে এনো উডপেন্সিল আর রবাট্ (**rubber**)।" পরের দিন বড়মামা **draft** নিয়ে হাজির। ছবি দেখে পরিতুণ্ডি উচ্ছ্বশিত প্রশংসা করে উঠল।—"খাসা হাত তোমার। কিন্তু কী জানো? ছবিখানা ফিফটি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে।"—"কিন্তু স্যার হুবহু ফটো যেমন,"-মামার প্রতিবাদ। "তর্ক করা চলবে না একেবারেই। এক কাজ করো, ছবিতে আছে গোঁফজোড়া মিলিটারি মেজাজে ওপরের দিকে খোঁচা মারছে। সেটা রবাট্ দিয়ে মুছে ফেলো। এবার গোঁফ আঁকো নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে, যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেনা।" সেইভাবে ছবির সংস্কার করা হ'ল--"এইবার ছবি সিক্সটি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে", পতিতুণ্ডির মন্তব্য। "এখানে দেখছ চোখ জ্বলজ্বল করছে, ভ্রযুগল যেন ছুরীর মত বঙ্কিম। মুছে দাও ভাই, মায়া করোনা। সরু করে ভুরু



টানো। চোখের মধ্যে যদি একটা ভিজে বেড়াল চেহারা আনতে পারো তবে বুঝব।" বড়মামা যথাসাধ্য তাই করে দিল। পতিতুণ্ডির উক্তি, "ছবি এইট্টি পার্সেন্ট ঠিক হয়েছে। ছবিতে চুল ব্যাকব্রাশ করা আছে, নির্ভয়ে সেটা মুছে দাও। তারপর চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলিয়ে দাও দেখি লক্ষ্মীছাড়া?" বড়মামা চটে বললে, "আমাকে লক্ষ্মীছাড়া বললেন যে বড়?"

—"না না, আমি বললুম লক্ষ্মী ছোঁড়া।" ছবিতে নতুন করে চুলোচুলি হওয়ার পর ভদ্রলোক আহ্লাদিত হয়ে শিল্পীর চিবুকে আদর ক'রে বলল, "আমার শেষ আব্দারটি রাখবে? ছবিতে দেখছ শরীরে কোট টাই। উড়িয়ে দাও। এবার চড়াও গলাবন্ধ নেহেরু কোট।" শিল্পী সবকয়টা গর্হিত হুকুম পালন করে চলেছে। শেষে পতিতুণ্ডি পাশের ঘর থেকে চিৎকার করে ভাইকে ডাক দিল, "হারু, দেখে যা এটা কার ছবি?" হারু ছুটে এল। কাছা গোছাতে গোছাতে সোৎসাহে বলে উঠল "এ যে

বাবার মুণ্ডু, কোথায় পেলি মাইরি?"

—"এই আর্টিস্টকে দিয়ে আঁকালুম।" এবার মামা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তবে এই ফটো কী আপনার বাবার না?"

—"কে বলেছে আমার বাবার ফটো? এটা আমার বাবার বন্ধুর মুণ্ডু। বাবার চেহারার সঙ্গে মিল আছে, ফিফটি ফিফটি। এবার বলো তোমার পারিশ্রমিক কত? কী বললে, দুই হাজার টাকা। সামান্য চটের ক্যানভাসের আবার এত দাম হয়? তুমি কী ডাকাত!" মামার প্রশ্ন, "আপনার বাবার ছবির মূল্য দেবেননা?"

—"বাবার মুণ্ডুর এত দাম?"...

পাঁচ

আমার হরেক মাতুলের মাঝখানে একজন রাবীন্দ্রিক মামা আছে। কিনল রবীন্দ্ররচনাবলীর খণ্ডাকারে সামগ্রিক সংগ্রহ। বইয়ের মরক্কো মলাট। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী প্রকাশনা। নতুন প্রকাশের ছাপাখানার সুবাস এঁটে রয়েছে পাতায়। গন্ধে, স্পর্শে শিহরণ জাগায়। সগর্ব অধিকার মামার। এদিকে এক সমস্যা, হাতে বই পেলেই বিছানায় শুতে ইচ্ছা করে। মাথার বালিশ, পায়ের বালিশ না পেলে রবিঠাকুরকে যুৎসই মনে হয়না। কিন্তু সমস্যা একাধিক। মামার আবার পেটগরম হ'লে শয্যা কন্টকিত বোধ হয়। জল খেলেও অম্লশূল হয়। মধ্যপ্রদেশে বালিশ চেপে ধরলে পেট ফেঁপে ওঠে। এতদিক সামলে রবীন্দ্ররচনাবলি বুকের ওপর মেলে ধরে মন দিতে হয়। কিন্তু পড়বে কী? ভক্তিভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বুকের ভেতর, দুচোখ সজল হয়ে ওঠে। প্রথম পাতায় রবিবাবুর ছবি দেখে মামার মনটা পেট্রিয়ট হয়ে ওঠে। কী বিশাল ব্যাক্তিত্ব! বিস্ময়কর স্বগোতক্তি বেরিয়ে আসে, বইয়ের ভেতর দ্বিতীয় পদক্ষেপ করবার আর অবকাশ হয়না, অদ্বিতীয় ছবির আকর্ষণের ফলে। ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নেওয়ার আগেই চোখ জুড়ে ঘুমের ষড়যন্ত্র আসে। নিদ্রায় লুপ্ত হয়ে সাহিত্যের ভাঙাহাট হতে অত্যল্প সময়ে। খোলা বই বুকে ছড়িয়ে থাকে। ...ক্রমশঃ রাত থমথমে হয়। কারা যেন সব কথা কয়, মামাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, কালনেমির লঙ্কাভাগের মতন। পেটগরমের শরীর রাতে ফেঁপে ওঠে। বইচাপা বুকটা রাতে হাহাকার করে এঠে, "বাঁচাও বাঁচাও"- ডাকাত পড়ার আর্তচিৎকার তার গলায়। রবীন্দ্রনাথকে বুকে-পিঠে মানানসই করবার, অথবা মানুষ করবার চেষ্টা মামার হাতে এগিয়ে চলে এইভাবে।

রবীন্দ্রনাথ সকলের গুরুদেব। রবিঠাকুরের কবিতার মালঞ্চে উড়ে মালী হওয়ার যোগ্যতাটুকু আমার নেই। সাহিত্যের হিতাহিত বুদ্ধি আমার আজও চৈতন্যে এলনা। আমি সেই রবীন্দ্রিক মামার ভাগ্নে, সকাল সন্ধ্যায় বই পড়বার জন্য বায়না করতাম

তার কাছে। বইগুলির একরকম শুচিস্মিতা নিবেদিত ভাব আছে, পবিত্রতা ও শুচিবাই মানতেই হয়। ভাগ্নের চরিত্রের ঠিক ঠিকানা নেই।

মন্টুমামার গল্প এতক্ষণ বলা হয়নি। ইনিও রুচিতে ক্লাসিক্যাল। গানের তানে ভরপুর মানুষ। যখন তখন গানের ঝরণাধারায় স্নান করছেন - **at the drop of a hat**। পাখীর ডাকের মতই স্বতোঃৎসারিত তার তানের ঝঙ্কার। ছোটবেলা থেকেই মানুষটির সঙ্গীতমুখর স্বভাব। **All this life's a song**। তালিমের অপেক্ষা না রেখেই মার্গ সঙ্গীতের তলাতল খুঁজে চলেছেন। গানের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে তবলায় সঙ্গত। তবলিয়া আর কণ্ঠ শিল্পীর দ্বৈত ভূমিকা একাই পালন করে চলেছেন। এই রকম অনন্দ - প্রাণ মানুষের সঙ্গে কিশোর ভাগ্নেদের জমত ভাল। স্বভাবটা স্নিগ্ধ, সাহচর্যে জীবনের গুরুভার হাল্কা হয়ে যায়। প্রতিদিনই যেন পিকনিক। ছুটির ঘণ্টা বাজছে তার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। এদিকে আবার পরিহাসের ছোঁয়াচে রস জোগান দিয়ে চলেছেন সকলকে। অর্থ তার হাতে খেলনার মতো, অবলীলায় আসত, ততোধিক ক্ষীপ্রবেগে খরচ হয়ে যেত। এও এক জীবনদর্শন। "যদি হায় জীবন পুরণ নাই হ'ল তব অকৃপণ করে", তবে কী হাতে পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? সঞ্চয় করোনা, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানকে অনাহারী রাখা চলবেনা। বর্তমানটা যে বড্ড জরুরী। আমি দুরাশায় বুক বাঁধিনা, অনাগত ভবিষ্যতের মজুরী খাটিনা। আগাম দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেল।

মণ্টুমামার যেমন দরাজ, দেদার স্বভাব, অর্থাৎ চরিত্রটা যতখানি চওরা শরীরটাও ততখানি ছিল মজবুত। ব্যায়ামবীর, নিখুঁত শরীর-শিল্পী, দেহটাকে এক গ্রীক ভাস্কর্যের মত করার চেষ্টা ও তৎপরতা। সময়ের অপচয় না করে সর্বদা স্ব-শরীরে টুকটাক নির্মাণের কাজ করেই চলেছে। জানলায় লোহার গরাদগুলি মামার করমর্দনে বেঁকে চুড়ে করুণ ব্যঙ্গরূপ ধরেছে। বাড়ীর প্রত্যেকটা চেয়ার কাঁধে কাঁধে চড়ে বেড়াচ্ছে তার। বসবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছেনা। ভাগ্নেদের পিঠে বসিয়ে ডনবৈঠক দেওয়া হচ্ছে। বাঁদর ছানার মতো লেপ্টে রয়েছি তার পিঠে, কুৎকুতে চোখে। মা-মাসি পড়ার কথা বললে আলমারীর মাথায় মামা বসিয়ে দিচ্ছে আমাকে, পা দোলাচ্ছি আমি, নিচের দিকে তাকিয়ে বাঁদরের মতো ভেঙ্চি কাটছি। স্বহস্তে বাদাম-পেস্তা বাটছে মামা নিজের জন্য, ভাগ্নেকেও খাওয়াচ্ছে শরীরটাকে লায়েক করবার জন্য। মন তার বর্তমানে থাকত না, ঘোরাফেরা করত আরব্যরজনীর দেশে। মামার কাছে কল্কে পেতে হলে পিঠে সুড়সুড়ি দিতে হবে ; তা'হলে হারুন-অল-রশিদের গল্পের ডালি খুলে যেত। গল্প বলার সুরে ভাগ্নে-ভাইপোরা সাপের মতো কিলবিল করে মামার পাশে জড়ো হ'তাম। গল্পের উত্থান-পতনে কয়েকটা মাথা দুলতে থাকত। মন্টুমামার দর্শনবোধে কোন আফশোস নেই, একটি ব্যতিরেকে। নস্যির ডিবের গায়ে আঙুলের ডগায় তবলা লহরা তুলে স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসে, "হতাম যদি জমিদারের ছেলে,

দশটা পাঁচটা অফিসের পাট থাকত না। গান-বাজনার তালিমটা দস্তুর মতো হত, ব্যায়ামের খোরাকিটাও ভালরকম জুটত।" উপযুক্ত সঙ্গীতের ওস্তাদ আর আখড়ার পালোয়ানের সন্ধানে উড়ু উড়ু করত তার মন।

একবার ইচ্ছা হ'ল পার্ক সার্কাস ময়দানে সার্কাস দেখে আসি। রবিবারের সকাল, মামা চলল টিকিট কিনে আনতে। আমি সঙ্গ দিলাম ল্যাংবোটের মতো। কিন্তু সার্কাসের তাঁবুর সামনে এক মাইল সমান লড়াকু লাইন। মামা লাইনে দাঁড়িয়ে শরীরটাকে **fine** করতে চায়না, দেহটা মন্দির কিনা। আমি রণে ভঙ্গ দিলাম, কিন্তু মামার উদ্দেশ্য অন্যরকম। তাঁবুর সামনে বহু পুলিশ ঘোড়ার পিঠে জাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটা দেখলেই মনে হয় বধ্যভূমি। জামার আস্তিন গুটিয়ে, বাইসেপ ফুলিয়ে আমার দলনেতা লোহার কোলাপ্সিব্‌ল গেটের সামনে হাজির হ'লো। অম্লানবদনে পুলিশ সার্জেন্ট্‌কে বলল, "সার্কাসের ম্যানেজারকে একবার ডাকুন তো। অমি মনোহর আইচের আখড়া থেকে আসছি। বিশ্বশ্রী, চেনেন তো? আমি প্রধান শিষ্য, বুকে হাতি তুলি।" ভেতরে খবর গেল, ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে হাজির। "আপনার সার্কাসে বুকে হাতি তুলবার আর্টিস্ট অছে কী?"—মামার প্রশ্ন। উত্তর, "হ্যাঁ স্যার আছে বৈকী, লঙ্কাস্বামী অয়েঙ্গার।" মামা অধৈর্য্য হয়ে বলল, "সেরকমটা নয়, যে বুকে হাতি তোলে, আমি তাকে শুদ্ধ বুকে তুলি কিনা! বুকে পিঠে মানুষ করি হাতিদের, লোফালুফি করি তাদের নিয়ে।" ম্যানেজার সসম্ভ্রমে দুপা পেছিয়ে দাঁড়াল। আমি এদিকে ভয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছি মাটিতে, মামার বেপরোয়া সংলাপ শুনে। চটিজোড়া হাতে তুলব কিনা ভাবছি। মামা বলে চলেছে, "এই যে দেখছেন আমার ভাগ্নে। সবে মনোহর অইচের আখড়ায় টিকি বেঁধেছে। এখন শরীর বলতে কিছুই নেই, টিকটিকির মতো দেখতে, সবে হাফ্‌ আখড়াই। ভবিষ্যতে আমি যাকে বুকে তুলি, সে যে হাতিকে বুকে নেয়, সবশুদ্ধ তুলে নেবে।" এতক্ষণে আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। আমাদের ধরে নিয়ে সার্কাসের অকুস্থলে ফেলে দেবে নাতো? মা-মাসীর কাতর মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল ; স্পষ্ট দেখলাম হাতিকে বুকে নিয়ে বসুন্ধরার প'রে শুয়ে জলছবি হয়ে গেছি, গলায় বিদায়ের মালা। হাতির পিঠে ম্যানেজার বসে দর্শকের দিকে চুম্বন ছুঁড়ে দিচ্ছে। চারিদিকে দর্শকের হাততালি। মণ্টুমামা আমার শরীরের ভগ্নাবশেষ খুঁজে পাচ্ছেনা, কারণ আমি জলছবি হয়ে গেছি যে! কিংবা মামা হাতীর শুঁড় থেকে ঝুলে পড়ে হাওয়ায় হামা দিচ্ছে। ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই স্যার?" মামার উত্তর, "গোটা দুই ফ্রী পাস, সামনের সারিতে। বুঝতেই পারছেন আমি **artist**। লাইনে দাঁড়িয়ে টিকেট কাটা আমাবে মানায়না।" দুটি পাস নিয়ে আমরা বিজয়গর্বে বাড়ী ফিরলাম। সন্ধ্যাবেলায় মন্টুমামা সাজগোজ করে মুখে পাউডার মেখে সার্কাস দেখে এল। সঙ্গে আমিও গেলাম, ছোটমামার কাপ্তান জামা পড়ে।

মণ্টুমামার কনিষ্ঠ ভাই রতনমামা এক ঝলমলে ব্যক্তিত্ব। মাথায় কোঁকড়ানো আদুরে চুল, মুখ বুদ্ধিদীপ্ত, চটপটে টগবগে কথা বলা, লম্বা **pencil sharp** শরীর, সাদা রঙে আঁকা তনু। মন্টুমামা যদি ব্যায়ামে শরীর পাত করে, রতনমামা মন্তব্য করে সেটা **bonded labour**। প্রথমজন ক্লাসিক্যাল, পরের জন আধুনিক গান পাগল। প্রথমজন বাড়ীতে থেকে ব্যায়ামের বাড়বাড়ন্ত করে। অপরজন পাড়া



বেড়ায়। ছোটমামা বাড়ীতে পক্ষীআহার করত, কারণ অফিসপাড়ায় তার খাদ্যের বিজয়যাত্রা। মিল ছিল ঐ একজায়গায়। জীবনের বেদনাকে দরদ দিয়ে পরিহাস রসে পরিবেশন করায় দুজনেই ওস্তাদ। এই একটা জায়গায় দু'জনের জীবনদর্শন মিলে যেত বংশানুক্রমিক নিয়মে। রতনমামার জীবনদর্শন ছিল জীবনের পেয়ালা উজাড়

করে ভোগ করা, **to drink life to the lease**। তাই বাড়ী ফিরতে গভীর রাত হয়ে যেত। সারাদিন ঘুরে বিজ্ঞজনদের আপন করে, তাদের মাঝখানে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করার পরে, রাতে বাড়ীর সুপ্তজনকে জাগিয়ে ফিরতেন মাথা গরম করে। মন্টুমামার রোজ দায়িত্ব ছিল অনুজ ভাইকে গোপনে বাড়ীতে ইন করানো। প্রধান অন্তরায় ছিল আমার দিদিমা (ডাকতুম দিদা)। রাত দশটায় সদর দরজায় ছিটকিনী তুলে দিতেন। এবার দরজার সামনে চোর ধরার ফাঁদ পাততেন স্বহস্তে। (এদিকে ছোটমামা তখনও বাড়ী ফেরেনি)। দরজার সামনে বালতি উপুড় করে রাখা হ'ল, তার ওপর রাখলেন শীল ও নোড়া, থরে থরে সাজানো হচ্ছে তাসের প্রাসাদ ; এবার



চড়ানো হ'ল চাকি ও বেলুন, তার উপর বসল হামান দিস্তা। ক্ষণভঙ্গুর এই প্রাসাদ। ছোঁয়া মাত্র আর্তনাদ করে ভেঙে পড়বে। এবার তার ওপর সাজানো হ'ল কয়েকটি ভারী থালা। কংস্যধ্বনির কান ফাটানো ফাঁদ তৈরী হচ্ছে। শব্দভেদী বান ছোঁড়া হবে চোরের দিকে। আরো আছে। উপস্থিত হ'ল জলভরা কাঁচের গেলাস। সিক্ত এক পিচ্ছিল ফাঁদ। নিজের হাতের নিপুণ ব্যবস্থাপনা তারিফ করছেন দিদা। দাদু বেঁচে

নেই, তাই চোরের জন্য বন্দুকের অভ্যর্থনা করা সম্ভব ছিলনা। দিদা তাই যথাসাধ্য আপন বুদ্ধি খরচ করতেন, নারীর স্বকীয় স্বভাবগুনে। (মন্টুমামা আড় চোখ দেখছে **hurdle race**-এর বহরটা)। ক্রমে বাড়ী শান্ত হ'ল, দিদা শুতে গেলেন বিছানায়, সঙ্গে নিলেন কাঁসর ঘন্টা। দরকার হ'লে পাড়াপড়শী জাগিয়ে তুলতে হবে। ঘোষণা করে গেলেন, "রতন ছেলে আজ বোধহয় বাড়ী ফিরবেনা।" ... **Grandfather clock** এক সময় রাত বারোটা বাজিয়ে দিল। গঙ্গায় জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল। মন্টুমামার চোখে ঘুম নেই। এবার ঝেঁপে বৃষ্টি নামল, রসাতল জীবন সংসার। সদর দরজায় তিনবার টোকা। মামার চাপা সঙ্কেতধ্বনি। **Tiptoe** মন্টুমামা গেল দরজার কাছে। পরম ধৈর্য ও স্থৈর্য নিয়ে নামাচ্ছে গেলাস, থালা, হামানদিস্তা, চাকিবেলুন, নিঃশব্দে একটা একটা করে **hurdle** উত্তীর্ণ হয়ে চলা। এবার দরজা খুলে রতনমামাকে ইন করানো গেল। আবার যথাস্থানে যথাযথ সাজিয়ে রাখার পালা নিঃশব্দে, সর্বদা দম বন্ধ করে। দুই ভাই **tiptoe** শোয়ার ঘরে এল। সবই হ'ল, কিন্তু শেষ যাত্রা সফল হ'লনা। দিদা পাশের ঘর থেকে বললেন, "রতন ছেলে এত রাতে বাড়ী ফিরল!"

পরের দিন সকাল হ'ল। দিদা অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ, কিন্তু দিনের বেলা সেটা টের পাওয়া ভার। সূর্যের তাপ বাড়ছে, দিদা উত্তরোত্তর গরম হচ্ছেন ; দিনরবি যখন মধ্য গগনে, তখন তিনি গনগনে, বাড়ীতে পা ফেলা যাচ্ছে না এত উত্তাপ। বুড়ো আঙুলে ভর করে হাঁটাহাটি করতে হচ্ছে। সংসারের ওপর অভিমান, কারণ সকলে বারবাড়ন্ত হয়ে পড়েছে। দিদার উপদেশ নতুন প্রজন্মের কাছে মাঠে মারা যাচ্ছে। দিদা পূজোয় বসেছেন। রূপোর সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ আড়ষ্টপ্রায় হয়ে বসে আছে। দিদাকে অভয় দিতে ভয় পাচ্ছে। পাশে তাঁর বৃদ্ধা মা নিঃশব্দে জপ করছেন বসে। ছোটমাসী আমার হাতে দশটাকা গুঁজে দিয়ে বাজারের ফর্দ বোঝাচ্ছে। রতন মামার রোজ অফিসে যাওয়ার তাড়া থাকে। অফিসের চেয়ারটা বুঝি বেদখল হয়ে গেল এই দুশ্চিন্তা তাড়না করে চলেছে। স্নানের ঘরে ঢুকেছে, সজোরে জল ঢালবার আওয়াজ। মন্টুমামা যোগাসনে বসেছে। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়বার আওয়াজ। আগন্তুক ছোটমামার অফিসের সহকর্মী। অগত্যা তাকে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানা ঘরে,- মন্টুমামা যেখানে শীর্ষাসনে স্থির হয়ে আছে। ভদ্রলোক তাই দেখে অস্থির হয়ে বললে, "আমি এখন যাই।" মন্টুমামা শীর্ষাসনে অনড়, অটল, সেই অবস্থায় অতিথিকে বসতে অনুমতি দিল। "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার প'রে"। অতিথি লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে। মামা কুশল আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এবার শরীরটা ধনুরাসন, ময়ুরাসন, ভূজঙ্গাসনে স্থানান্তরিত হয়ে চলল, এবং একই সঙ্গে অতিথির সঙ্গে সদালাপ।....

এমন কত কী যে সংসারে হয়। দীর্ঘকাল অতীত হ'ল। সংসার সীমানার বাইরে

স্টেজের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি আমি, পেনে তাকিয়ে ভাবনান্তরের নতুন মানদণ্ডে নতুন পরীক্ষায় যাচাই করছি সেই ফেলে আসা দিনগুলিকে। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খুঁজে পাচ্ছি, যারা পলে পলে যোগান দিয়ে গেছে আমাকে অনাগত ভবিষ্যতের স্মৃতিসম্ভার। লিখে চলেছি। লেখার কলম আমাকে খেলিয়ে নিয়ে চলেছে সেই দিনগুলির খেলোয়ারি মনোভাবের দিকে। স্মৃতির আলোয় গল্পের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। আমার গল্পের সলতে পাকানোর কাজটা সকাল বেলা তারাই সেরে দিয়েছিল।

কবিতা চুরি

আমার গৌরী, তন্বী, ষোড়শী নীলরক্ত ইংরেজি কবিতাগুলি একজন ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে পশ্চিম বাংলার পর্ণকুটিরে, তাদের নামিয়েছে বেঙ্গল অপেরাতে। ভাবলেও শয্যা কন্টকিত হয় যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে মানদা-সুন্দরী। মালদার আমের মতই ফলবতী করে তাদের জাঁকিয়ে তুলেছে নিজের বাগিচায়। কে এই অপকর্মটি করলে ? -অনল চক্রবর্তী। এক ফেনিল চক্রান্ত করে। আমার ফ্যালফ্যালে অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েই। বেশ মাই ডিয়ার গলায় ফকির বানিয়ে রেখে গেল, নিজের ফন্দি-ফিকির দিয়ে। শান্তিনিকেতনে এক মেহফিল-সন্ধ্যায় বাড়ির ছাদে আমার মানস-পুত্রীদের পেশ করেছে, কথা বলিয়েছে বাংলা ভাষায়। বাউলদের সঙ্গে আমার ফিরিঙ্গি মেয়েদের ধিঙ্গি নাচ নাচিয়েছে। আমি তখন শুনেছি রাস্তায় ঝরা পাতার মতো লুটিয়ে পড়ে। লুট হয়ে গেছে সব। সেই অনাসৃষ্টি সন্ধ্যায় আমি ল্যাম্পপোষ্টের শরীরে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ভাঙা পোতের মতো। ভাগ্য ভাল হাতের কাছে দড়ি ছিলনা। নইলে জীবনটা নিয়ে বেশী দরাদরি না করে সেখানেই ঝুলে পড়তাম। আমার তখন ভারী ইচ্ছে হচ্ছিল শরৎবাবুর ভগ্নপ্রেম উপন্যাসের মতো আমাকে কোলে টেনে নিয়ে রাজলক্ষ্মী আমাকে সজলচোখে পাঠ করুক, তার হাতে তৈরি লুচি পায়েস খেয়ে গায়ের জ্বালা উদগার করে দেই। তাকে ভ্যান ভ্যান স্বরে আমার ভগ্নহৃদয় ভেঙে জানাই। আরও ইচ্ছে হচ্ছিল পাইকারি হারে সব বঙ্গবালাদের শরৎপিপাসা আমার জীবন-উপন্যাসকে বুকে চেপে ধরে চরিতার্থ হোক। সেই হতাশ-সন্ধ্যায় বেশ একটা পরকীয়া ভাব মনে জেগেছিল।

অনলবাবুর এই কবিতা অপহরণ, বাবুয়ানির বিরুদ্ধে গুরুতর **abduction** এর মামলা আনা যায়। আজকাল হাতে নিয়ে দড়ি, অন্য হাতে কলমে ফৌজদারি মামলার নালিশ লিখি। কাউকে বিশ্বাস করা যায়না, বিষেশ করে মজারহাটের মামাদের। মামী অবশ্য খাওয়ান ভালো। ভাতে লুচিতে রাখেন পথহারা কাব্যলুণ্ঠিত পথিকদের ; মামা ঝুলি, পকেট হাতড়ে শখের লেখাগুলো, মায় বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত খসিয়ে নেয়। মামার বাড়ি থেকে এই ভাগ্যহীন মানুষেরা মানুষেরা হামা দিয়ে বেরিয়ে যায় উদভ্রান্ত শিশুর মতো। আমার মতো মাঝখানে সিঁথিকাটা নির্দোষ কবিদের মজারহাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারে অনায়াসে। চব্বিশ পরগনার চব্বিশ হাটে কবিদের হাড়গোড় কেনা বেচা চলেছে, এ কথা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

তাছাড়া বলিহারি, আমার কবিতার ষোড়শী ছুঁড়িরা। বেবাক হাঁটা দিল মজারহাটে, ফিরেও তাকালনা একবার। একবার জেদ করল না গাউন ছেড়ে অঙ্গে শাড়ি নেওয়ার আগে। **Governess** রেখে ইংরাজি উচ্চারণ, সমুদ্রপারের আদবকায়দা শিখিয়েছিলাম, গরিব মাইনে খরচ করে। কাকস্য পরিবেদনা। ফিরেও চায়না। লিপস্টিক মাথা লাল ঠোঁটে বাংলা কয়, কাজল দেয় চোখে, আলতা পরা পদমর্যাদায় মল বাজিয়ে হাঁটে। রসের ঘরে সূক্ষ্ম হাত সাফাইয়ের কাজ, ধারালো কলম দিয়ে কবিদের ধরণী দ্বিধাবিভক্ত করে দেওয়ার এই যে হাত-যশ, এ ব্যাপারে চক্রবর্তী মহাশয়ের কৌলিন্য আছে। রবিঠাকুরের পরেই নাতিদুরে তার আসন। কবিগুরু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসেবে তার জন্য সংরক্ষিত করে রেখে গিয়েছেন। কবিগুরুর উদ্যাম হরণ-তৎপরতা সে নিত্যই আরতি করে চলেছে। তৃণমূল কবিদের কর্ণমূল টেনে চলেছে বারে বারে—যুগে যুগে সম্ভবামি হয়ে আসছে ভারতের বধ্যভূমিতে। এই হরণকারী যবন কবিরা। জনশ্রুতি আছে রবিঠাকুরের জাতভেদ, ভাষাভেদ ছিলনা, ছিল না কোন অরুণি বা কার্পণ্য, বিশ্যবরেণ্য সাহিত্যের ভাণ্ডারে ক্ষিপ্র হস্তান্তর চালানোর কাজে। এই হরণলীলা নাকি কবি চুড়ামণিদেরই সাজে!

শোনা গেল অনলবাবুর কাছে আরও বেশ কিছু সাড়া জাগানো চাঞ্চল্যকর যুবতী কবিতা ও কিশোরী ছড়া আছে, নিজের সই সহকারে দস্তখতি শীলমোহর দিয়ে বেশ জাঁক করে যত্নে রাখে তাদের। বেশ নামডাক আছে তাদের, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে সেদিনের অকুস্থলের চারপাশে, যেখানে ভরাডুবি হয়েছিল আমার। মাঝে মাঝে মনে জাগে, একবার সৎসাহস করে এদের তুলে আনলে কেমন সাজা হয়? ঘর পালটাপালটি করে। পাল্কি চেপে নিয়ে যাওয়া অবশ্য সম্ভব নয়, শাঁখ বাজানো, উলু দেওয়া চলবেনা। এক সাঁওতালি পদ্ধতিতে হরণ করতে হবে। হর্ণ বাজিয়ে নয়। শুনেছি এই ব্যাপারেও অনলবাবুর বিশেষ পারদর্শিতা আছে। তবে দুর্ভাবনা হয়। এদের বংশ পরিচয় জানা নেই ; অন্য কোনো লাঞ্ছিত কবির বাঞ্ছিত রচনা রাস্তা ভুলিয়ে নিজের হারেমে এনে সুদে আসলে ভোগ করছে কিনা জানা নেই। শেষ পর্যন্ত আমাকে চোরের ওপর বাটপাড় বলে ধরিয়ে দেবে না তো তোমাদের কাছে - অকপট বিনয়ে? মাইক নিয়ে আমাকে অমায়িক কথাবার্তা শোনাবেনা তো। শুনেছি তার চালচলন বোঝা ভার। শেষ পর্যন্ত আমার কাব্যকুল বাঁচাতে গিয়ে চিনে জাপানি, হনললু ভাষায়—কিংবা আরও কোনো দূরে আফ্রিকার গভীরে **Bushman**দের ভাষায় কবিতা লিখতে হবে নাকি? আশা করি এই সব ভাষার সঙ্গে অনলবাবুর চেনা পরিচয় নেই। চৈনিকস্পৃহা তাঁর নেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ইংরেজি ভাষাকে এমন চক্ষু শানিয়ে দেখে যে লজ্জা নিবারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমরা জানি কেউ কেউ কেউকেটা মানুষ জীবনানন্দের কবিতার আগাচে কাগাচে, বেলা অবেলায় ঘোরাফেরা করে। একটা গোবেচারা চেহারা তাদের, গ্রামীণ

কৌতূহল নিয়ে চর্বণ করে কবিতাগুলো, জাবর কাটে সারাবেলা। যেন গ্রাম বাংলা পূর্বে চেখে দেখা হয়নি, তেমনি একটা কৌতূহল তাদের। একটা বাউলিয়া উদাস তাকানো তাদের, দেউলিয়া অন্যমনস্ক চেহারা। বাঙলার ধানসিঁড়ি, পেঁচা, ইঁদুর ইত্যাদি আর যতসব ইতর প্রাণী কবির জীবে প্রেমে ধন্য হয়েছিল তাদের জন্য কী হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই ভক্তরা? গ্রামের আশমান জমির সমান বেশ একটা রাশভারি মেজাজ দেখা যাচ্ছে জীবনানন্দের একশো বছর পরে। আসল ঘটনা তবে ভেঙে বলি, নিজের স্বাক্ষর পরিচয় লুকিয়ে, গুহ্য কথাটা তবে খুলে জানাই। (আমাকে তোমরা গণপ্রহারের জামাই করো না ভাই)। বনলতা সেন আর অরুণিমা সান্যালের পেছনে এক জাল পেতেছে এরা। অনলবাবুর নীল রহস্যের এক মন পসন্দ্ ফাঁদ।



বনলতা সেন আর অরুণিমা সান্যালের পেছনে এক জাল পেতেছে...

খোঁজাখুঁজি চলছে ঘরে ঘরে, দেশে বিদেশে। একটা বড় ধরনের ধর্ষণ পারদর্শিতা এর আড়ালে রয়েছে। এক ধরাধরির কর্মব্যস্ততা চলেছে ধরাতলে। তবে কিনা একটু অসুবিধা আছে। ব্যাপারটা একটু বড় আকারের বাড়াবাড়ি। কানাকানি হওয়ার আশঙ্কা আছে। পুকুর চুরির সম্ভাবনা কম। জীবনানন্দের একশো বছর পরে কাগজে, ম্যাগাজিনে জোর ভাষণ হচ্ছে কিনা! একটা কোলাহল শুরু হয়েছে মায়ের কোলে শিশুর মতো। অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকালে বিকালে বনলতার কুশল খবর জানতে চাইছে। "বনলতা" একটা কিংবদন্তি সাইজ লতাপাতা বিস্তার ক'রে এক দুর্লভ ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছে। আমাদের কোমরের জোর কম পড়ে যাচ্ছে। আসল-নকল ঠিকানা ভেদাভেদ সনাক্ত করা যাচ্ছে না। জীবনানন্দ বেঁচে বর্তে থাকলে তার অস্তিত্বকে নিরানন্দ করে তোলা যেত সুকৌশল প্রশ্নবাণে। আতরমাখা করমর্দনে তাঁর

মুখ দিয়ে বেফাঁস বার করা যেত যে, নায়িকা তাঁর কোথায় এলোচুলে শায়িতা আছেন আমাদের পাপচক্ষুর আড়ালে। কবির ট্যাঁক খুলে পকেট হাতড়ে পুরোদস্তুর সার্চ করা যেত —সন্ধান মিলত হয়তো, শ্রীমতী সেনের সোনালি ঠিকানাটি।

জীবনানন্ত সেবাকেরা সব পারে। বনলতার অকর্ষণে অমাদেরও যে দুর্বুদ্ধি ললিত লবঙ্গলতার মতো চেকনাই চেহারা হয়না, বঙ্কিমচুলের টেরিতে বুরুশ চালাই না তা নয়। আয়নায় নিজের ঝড়ের মূর্তি দেখিনা তাও নয়। তবে কি না ওদের লোপাট বুদ্ধি আমাদের ক্ষুদ্র মগজে আসেনা। অনলবাবু হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে পাত্রস্থ হতে চায় বনলতার আকর্ষণে। উত্তম পাত্র তিনি চক্রবর্তী বংশীয়। তাঁর সেন-মতি হয়েছে। চানক্য সেনের মতো খবরাখবর রাখছে, নাড়ীনক্ষত্র তার নখদর্পনে। এই "সেনাসক্তি" পুলিশ দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবেনা। উকিলের পরামর্শ নিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না। আমরা শুনেছি উকিলসাহেব বনলতার প্রতি গুপ্তপ্রেমের সম্রাট। নিজের সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞাবহ তল্পিবাহক হলেও বিয়ের দ্বিতীয় সুযোগ পেলে উকিলের মলাট পরিত্যাগ করে টোপর ধারণ করবে। এদের সৎসাহস আছে, তাই অসৎ প্রেমে ছোটে। আমরা তৃণমূল কবি বিশ্বস্ত নির্বোধ। আমরা সুযোগ বঞ্চিত নির্লোভ, বাধ্যতামূলক ভাবে আনাড়ি। আমাদের বনলতা নেই। তৃণভোগী, নিরামিষ কাঁটা গাছ চিবানো ছাড়া, রক্তাক্ত ঘর্মাক্ত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।



কবিতা চোর

কলমের ষড়যন্ত্র

এক

মুখে যে কথা বলবার সাহস হয়না, অথবা যে কথা শোভা পায়না, কলম সেখানে লিখে চলেছে অব্যাহত গতিতে স্বাধীন সাধনায়। কলমের শাণিত কথায় তরবারিও ভোঁতা হয়ে যায়। **Pen is mightier than sword**। কলমের ষড়যন্ত্র কাউকেই সমীহ করে না। ভাষা নৈর্ব্যক্তিক, বিচার বিভেদ নেই, ব্যক্তিবিশেষে রুচি, অরুচি নেই তার। তুমি, আমি ভাষার শব্দযজ্ঞে আমিষ ভোজ মাত্র, কিম্বা বাক্য পরম্পরার নট ও নটী। লেখনীর রঙ কালো। কলঙ্কের কালি দিয়ে পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে ধরিত্রীকে সমান্তরাল করে চলেছে ; সকল মানুষ, দেবতা — এমনকি লেখক স্বয়ং কলমের অঙ্গুলী সঞ্চালনকে সেলাম করে। এর চালচলন, আদব-কায়দা ভিন্ন—অভিন্ন সমাজসংস্কারের বাইরে সে। সম্পূর্ণ স্বাধীন সে এই পরাধীন জীবন রঙ্গভূমিতে। লেখনির ভাষা তার আপন স্বর্গ, নরক সৃষ্টি করে চলেছে, বহন করে চলেছে জীবনের এক কালো কালির আলোছায়া। আমাদের চেতনা ভাষারই ছায়া-সংস্করণ। সত্য ও মিথ্যার রূপক মূর্তি তৈরী হয় ভাষার মায়াজালে। ব্যাকরণে অনুস্বার, বিসর্গ না রইল যদি, তবে ভক্তি মার্গের সাধন, ভজন চিত্তের রসনায় ধরাই দিল না। মায়া দিয়ে ভাষার কায়াহীন শরীর তৈরী। সর্বাধিক বকবক করে কে ?—সাহিত্যিক। কথাভ্যাস, বা অতি কথনের বদ আচার তার চঞ্চল কলমে। অযুত নিযুত কথা বোঝাই করে চলেছে দৈনন্দিন। তার পর সাহিত্যিকের মায়া কান্না,

‘ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ছোট এ তরী,
আমারই সোনার ধানেতে ইহা গিয়াছে ভরি।”

এই লিখিত শব্দের গুরুভার চাপিয়ে দেবে ইতিহাসের হেফাজতে। তার পর তোমরা ভবিষ্যত কালে তার হেপা সামলাও। সাহিত্যিক বড়ই টিকটিক করে গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালে।

কলমের গর্ভফুঁড়ে সাহিত্যিকের জন্ম। পাঠকের গৃহে সাহিত্যের লালন পালন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ইতিহাসের বিধানে সাহিত্য হয়তো পাঠকের স্নেহাশ্রয়ে পৃথিবীর সঞ্চিত গর্বের অধিকার লাভ করবে। নয়তো জন্মের পরেই গল্পের নটে গাছ মুড়িয়ে গেল। নির্জন ঘরে বসে নিঃসঙ্গ নিবিড় বাক্যসাধনা। ভাষার স্রোতস্বিনী কল্লোলিণী

প্রতিধ্বনি বুকের তন্ত্রীতে বাজে। বাহ্যতঃ যার প্রকাশ নেই, চিত্ততলে তার চারণ ভুমি। অধরা, অথচ সকলেই ধরা পড়ে তার ইন্দ্রজালে, ধার করে নিয়ে যায় দৈনন্দিন জীবনের চিন্তার বিপণী। **In the begining the word was with God**। জীবন সৃষ্টির বীজ মন্ত্র। শব্দব্রহ্ম। অতিজাগতিক পরাচিন্তা কী মানব জীবনের গল্প কাহিনীর ভাঙ্গা-গড়ায় মীমাংসা করা যায়? তাই দেবী সরস্বতীকে আরাধনা করো। "হে দেবী, ভাষা দাও। আমার বাচাল জিহ্বায় আরোহণ করো পৃথিবীর কুল ভাসিয়ে নিয়ে যাই ভাষার বিস্ফোরণে। আমাকে ভাষা-প্রবঞ্চিত করোনা দেবী, অনাহারী রেখোনা অমৃতময় বাণী হতে। ভাষা-নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ করো। একবার হাতে দাও তোমার শব্দের গোলা-বারুদ, তারপর আমার অল্প বুদ্ধি দিয়ে মানুষকে গোলাম করে রাখি। সরস্বতীর প্রশ্রয় যতদিন পেলাম না ততদিন সব কথাই অনর্থ হয়ে গেল। আমার হবু সম্ভাবনা নিরম্বু উপবাসী রয়ে গেল কথার পিঠে কথা, তস্য তস্য পিঠে সহস্র হাজার কথা...ধাপে ধাপে স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে দেবলোকের দিকে সশব্দ অভিযানে। ভাষার কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে মহাকোলাহল করে দেবতার আসন টলিয়ে দিচ্ছে। এদিকে দিল্লীতে এক গীর্জায় মস্ত আকারে লেখা আছে **" The greatest gift of god is silence"**। ভাষার স্কন্ধে বসুধা। দৈনন্দিন ঘটনা যেখানে নাগাল পায়না, অমিতশক্তি কথা সাহিত্য অবলম্বন করে কল্পনার অমরাবতীতে পৌঁছান যায়। ভাষার প্রেরণা প্রত্যাশিত হচ্ছে আকাশের বাণী শুনবার জন্য ,বলবার জন্য। কথার মন্ত্রবলে দীক্ষিত লক্ষ জীবন। চৈতালী মেঘের স্বপ্ন। আকাশের নীলাঞ্জন মেখে নাও দৃষ্টির পল্লবে, টানো ছবি হৃদয়ের তুলিতে। **By the dilation of the heart**।



নীলাভ প্রচ্ছন্ন লীলায় দুই চোখ ডুবিয়ে নাও, সাঁতার দাও সঞ্চারী মেঘের যাত্রাপথে। বিশ্বকর্মা এসেছিল জীবের সংসারে কারিগরী নির্মাণ করতে। ভাষার মেঘদূত এল অনন্য সত্বায় কল্পলোক সৃষ্টি করতে। কথার অমোঘ শক্তি দিয়ে ভাষায়িত মানুষ, শব্দায়িত জীবন বিন্যাস।



আমার বাচাল জিহ্বায় আরোহণ করো

Great words as majestic doors open,
as refuge from the tide of times,
outside the fields are open, for
any deeper design to delight.

শব্দের চাবি দিয়ে রুদ্ধ কপাট খুলে দিই, সামনে গভীরে শুনি সমুদ্রের তটভঙ্গের জলধ্বনি।

দুই

তর্কালঙ্কার শব্দ চুড়ামণি কথায় মালায় বিভূষিত হয়ে ভাষণ শক্তির মল্লযুদ্ধে নেমেছে,— রাজপথ জনপথ নিয়ন্ত্রণ করছে মুগ্ধ শ্রোতাদের আকর্ষণে। হাজরা পার্কে আজ বেজায় ভীড়। কাতারে কাতারে শ্রোতা হাজিরা দিচ্ছে সেখানে। আরেক দিকে

ময়দান প্রাঙ্গণে পায়ের আঙুল টুকু রাখবার জায়গা নেই। রাজনৈতিক নেতা সিংহ গর্জন করছে সেখানে মানুষের দিকে কল্যাণী সদিচ্ছা জানিয়ে। ভাষা দিয়ে পোষ মানাচ্ছে শ্রোতাদের। মাইক যোগে শব্দের গোঁত্তা। হিটলারী স্টাইলে কাহিল করছে।....তেমনি ভীড় জমেছে লন্ডনের **Hyde Parke** এ। **Hide** করা অর্থাৎ আত্মগোপন করার উপায় নেই। — **Pitt, Disraelli,** অথবা **Lloyd George** বক্তৃতা করছেন। সরকারের তখ্‌তে তাউত, ক্ষমতার আসন টলে উঠছিল বাক্যনির্ঘোষে। কিংবা লালকেল্লার সামনে ইতিহাসের গরম ধূলো উড়ছে দেশনেতাদের কথার বশীকরণে। উতরোল জনমানস। মস্তিষ্ক চর্বণ হচ্ছে তাদের। বাক্যের অগ্নিগোলায় ইতিহাস আত্মসমর্পণ করবে এবার। ভাষা বিপ্লব এল ঐ। উচ্ছ্বাসের রামধেনু জনমানবকে কামধেনু করে তুলেছে,— ধুয়ে দিচ্ছে তারা দেশবিধাতৃদের পায়াভারী চরণ।

In the mould of man his words
as solid stable sound ,
language that has teeth to grind ,and
saliva to channel sense in brain ,
appease the hunger of mind
.... yet so often these very words churn deep
the devil's design



সরস্বতী হংসরূপী বাহন হওয়ার হিংস্র বাসনা

and fund the track of times,
in the dance of human passions and avowals.

ওপরে শেষের লাইনগুলো দেখলে স্পষ্ট হবে যে ভাষা বড় প্রলয়ঙ্করী হতে পারে। অহংকার তার শ্রীমুখে। যারা সেই কেলেঙ্কারীর অবতার হয়ে ভাষা-তর্জনী দেখায়, তাদের কাছ থেকে অহরহ বহুরূপী পালাবার ফন্দি করি আমি। এই স্বনির্বাচিত

অবতারদের ভাষাচুম্বন বড়ই সাংঘাতিক। একবার এক আচার্যদেবকে সাক্ষাৎ করে এক রির্পোটার নিবন্ধ লিখেছিল। "আচ্ছা আপনার কী একটা **committment** আছে এমন কিছু করবার যাতে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর আসন টলে যায়, কিংবা ঢলে পড়ে? তেনাদের সঙ্গে ঢলাঢলি করবার খুব ইচ্ছে কী আপনার? ধন্য ধন্য রবে ধন্যাঢ্য হতে চান কী? কোন আচার্য্য পদে গুরুদায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন কী? (আপনি কি অগুরু মাখেন গুরুদেব?) অন্য কাউকে সেই দায়িত্বে বরণ করে নেবার অভিপ্রায় আপনার একেবারেই নেই কী? দেবী সরস্বতীর হংসরূপী বাহন হওয়ার হিংস্র বাসনা আপনার বুকে আল্পনা টেনে চলেছে বুঝি? অল্পে রুচি নেই কী একেবারে? কলারূপী কেলেঙ্কারী অনুপ্রেরণা আপনাকে অহরহ বার্তা পাঠাচ্ছে! কলার সঙ্গে রতি করবার সুমতি হয়েছে কী? নবীন মতো এক সবুঝ প্রতিভা আপনার প্রবীণ শরীর পুলকিত করে তুলেছে কী? এক জ্বালাময়ী প্রতিভা শত মুখে ফেটে বেরুচ্ছে বুঝি? আপনাকে কীসের পিপাসা চেপে ধরেছে? আপনার ন্যাংটো বাসনাটা কী (না খুলে) বলবেন? কী বললেন, আপনি মুলে আঘাত করতে চান, সমুলে টেনে নামাবেন আমাদের সকলকে? পূর্বসুরীদের মুখোশ খুলে দেবেন? মুখে চুনকালি বুঝি! একি প্রলয়ঙ্কর আব্দার আপনার ? এই কী আপনার খোশমেজাজ? আমাদের খোরপোস রাখবেন না, এই সিদ্ধান্ত ! এই দুনিয়ায় একাই দখলদারি নেবেন? আপনার তল্পিবাহক কুশীলব বানরসেনাদের উদ্দেশ্যে এই বুঝি আজ্ঞা জাঁহাপনা ? তোমার কর্মকাণ্ড লঙ্কাকাণ্ড সমান সমুজ্জ্বল। আমরা অতি সামান্য সিকিভাগ মানুষ। আমাদের জীবন ভূর্জপত্র, বাতাস তাড়িত। লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষ তোমার সামগান ধরেছে। তুমি নির্ভীক, নির্লাজ, পাগল - সুন্দর। তুমি বদ্ধপরিকর, পাঠান মোগল। তুমি তাকিয়ায় ঠেস দাওনা, পান মুখে দিয়ে জাবর তুমি কাটো না। এই ভবসংসারে আমাদের ভাঙা হাটে তোমার বৈভব যৎকিঞ্চিত হরিলুট দাও বাবা— আমরা কুড়িয়ে বাঁচি।

ভারতের অনিশ্চিত গর্দভভার লাঘব করবার জন্য তুমি কর্ণাবতার হয়ে আমাদের কান টানছ। পূর্বে আমরা ছিলাম গাধা। তোমার বিধানে এখন লম্বকর্ণ হয়ে তোমার কাছে ব্যা—করণ শিখছি। তোমার নতুন নিদানের অবতারণায় আমাদের ভবতারণের চেষ্টা করেছ,—চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ। ইতিহাস পেছনে মুখ থুবড়ে পরে রইল। তুমি বাসুদেব, মানুষের বাসভূমিতে লাঙল দিয়ে চলেছে। আমরা তোমার করতালির সংখ্যাগনণা।"

—ভাষার নামাবলী জড়িয়ে নাও সর্বাঙ্গে ! ব্যাকরণের ছাই দিয়ে ছেয়ে দাও শরীর, সেই রহস্যের দীপালিকা মেলে ধরো নিজের দীক্ষিত বরতনুতে। ভাষার মহাসাগরে চৈতন্যের ঝিনুক কুড়োই—তারই তটভূমিতে মানুষের পদটিকা। Whispering shores of man ।ভাষা- বিধৌত বাক্য তরঙ্গের ভাঙাগড়ার কথা

শুনি জীবনের সমুদ্রসৈকতে। কথার তরণী ভাসাই, চেনা দেওয়ালের বাইরে অচিন ভুবনে। ডুবুরী মানুষ-প্রকৃতি, লবণাম্বু জীবনের স্বাদ। কথার অতলান্ত আহ্বান।

"It seemed my own heart heard,
inland the sorrow of the sea,
what voice of the salt sea,
calls me so insistently,
echoes, echoes ,night and day -
come,come away."

অথবা আমি আকাশচারী, তাকাই খোলা বাতায়নে। কথার আলপনা আঁকি সঞ্চারী মেঘের স্রোতে। ভাষার আষাঢ় মেঘ ঘনিয়ে এল আশমানের চওড়া বুকে। মধ্যযামিনী কাটলনা —উজ্জয়িনীর উদ্দেশে বাক্য ব্যকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু কলম কী অবসন্ন হয় না কখনও? জ্বরা সে জানে না কী? মানুষ সুলভ দুঃখ যন্ত্রনা হয় না? চিরযৌবনের ধ্যানে সে কী মগ্নমুখর? সময়ের ধূসর বাতাস হরণ করেনা তাকে? উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্বশীর মতোই স্থির শশী কী সে?—আঁধার আকাশে একনিষ্ঠ জীবন প্রেমিক? কলম বাহন ক'রে রচনা করি ভাষা বুদ্বুদ। চলেছি ভাষাপথে আকাশচারী বিহঙ্গের সারিবদ্ধ চলার গতিতে। সময় আমাকে রচনা করে চলেছে। ব্যায়ের স্রোতে। নাকি আমি মহাকালের অনুপ্রেরণায় বিগত ইতিহাসকে নিয়ে মালা গেঁথে চলেছি সনাতন সুরে।

তিন

Much of man's history has been palmed off as letters। সাহিত্য একপ্রকারে জীবনকীর্তি। ব্যবহারিক জীবনের সাফল্যের মাপে হয়তো নয়। চিঠিপত্রও সাহিত্য। সকলের জন্য না হলেও ঘনিষ্টমহলে মূল্যবান সংযোজন। জীবনের পাদটিকা। তাৎক্ষণিক সৃষ্ঠ, জীবনের চলার ছন্দে স্বজনের উষ্ণ করস্পর্শে চিঠির আনন্দ-বেদনা হয়ে ওঠে গন্ধে উদাস। পালতোলা নৌকার মতোই নিয়ে যাতায়াত করে অন্তরের অন্দর মহলের সঞ্চিত সম্পদ। চলার মুহূর্তেই তার প্রাণের নির্যাস। সভ্যতার কোনো দিকনির্ণয় করার কোনো দায়দায়িত্ব তার নেই। — সে যেন ঘুম ঘোরে স্বপ্ন জাগরণ।

Human language imprints upon the total surface of the man's sensibility ,more than any other human faculty। মনের সবকয়টা জানালা খুলে দাও—গান, ছবি, নাটক, নৃত্য। কিন্তু ভাষা সর্বদ্বারে **mediate** করল ,জানাল তার বিচার। **The mediative word sits on judjement, intervenes through the coloured lamps of language on pure dance, music and emotions of graphic art -------a text**

that is co-extensive with the entire life of human experience । ভাষা সংস্কারের বেড়াজাল। **(cobweb of man's history)**। বাঙ্‌ময় জীবন পালনের এই অভ্যাস, কথার আরামকেদারায় বসা, তাকিয়া মনে করে তর্কাতীত বিশ্রাম নেওয়া।

চৈতন্যের সুদূর প্রসারী ওঠাবসা। কথার হুকুমে শরীর চালনা, আমাদের আদবকায়দা, অভ্যাস সবটাই ভাষাশাস্ত্রের ফরমায়েস মতো। ভাষাবৎ সমাচরেৎ। জন্মের প্রথম শুভলগ্নে জাতকের আর্ত ভাষা, "ওঁয়া"। এটা জৈব স্বরধ্বনি মাত্র, নিতান্তই প্রাথমিক— আশ্রয়হীনের মাতৃকামনা। **The first primordial contact with the world, its shock and stimulus**। জীবনের এই উন্মেষ লগ্নে আরেকটি কথা উচ্চারণ হল—মায়ের আদরের ডাক। অথচ আবহমান কাল ধরে কেউ স্মরণ করতে পারেনা যে, মা তার সন্তানকে বিশেষ কোনো কথায় প্রথম ডেকেছিল।... শিশুর পৃথিবীতে আজ প্রথম দিন। পরিবারের সকলের আজ এক ধাপ পদোন্নতি হল। কত মানুষ এল। এল প্রিয় ভাষাগুলি, সম্বোধনের বৈচিত্র্যে ধনী পরিবার। দাদু, দিদা, বাবা, মা আরও কত! প্রতেকেই নিজের নাম- ধ্বনি নিয়ে নতুন করে বুক বাঁধল এই কল্লোলিনী সংসারস্রোতে। সংসারে সকলেই নতুন নামভূমিকা পেলেন। পরিচয়ের নবতর সংস্করণ। কিন্তু সমস্যাও বাড়ল। নবজাতকের নাম না দিলে পৃথিবীর ভাষা সম্ভারের ভারসাম্য রক্ষা হবে না। পরিবার কী এতই দীন যে শিশুকে নামের দ্বারা শিকার করা যাচ্ছে না? অনামি ছিল ভালই, যে যা মন চায় নিত্য নতুন নামে মন ভরিয়ে নিতে পারত। কিন্তু পরিবার এতই ব্যাকরণ সচেতন যে শিশুকে এক নামে এক ডাকে হরণ করতেই হবে। নতুন অতিথির উদ্দেশে নামের ভীড় জমেছে, নামের নামাবলী সচকিত করে তুলেছে তাকে। নামাঙ্করণের মান-অভিমানের পালা চলেছে গুরুজনদের মুখর কথায়। মুখর আকাশে নামের আতসবাজি এক এক করে কেরামতি দেখিয়ে নিভে যাচ্ছে ব্যর্থ চেষ্টায়। শেষকালে অনেক কথা খরচ করে নামের আকাঙ্খিত আশ্রয় মিলল। নামের পিঞ্জরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এক সময় ছেলেমেয়ে গেল স্কুলে। স্কুলজীবনের চত্বরে সাহিত্যতিমিরে আমিও দিশাহারা হয়ে পড়তাম। বুঝতেই পারতাম না কেন কবিরা বনস্পতির উচ্চশাখায় পাখী বা ফুল নিয়ে প্রগলভেতা করে গেল। কবিতার শব্দতরঙ্গ, বাক্যের লহরী, ও ধ্বনির হিল্লোল আমার চাষা-সুন্দর মনে পরীক্ষার ঘন্টা বাজিয়ে দিত। ক্লাসে বসে দিন গুনতাম দীনতার মূর্তিমান চেহারার মতো-শেষের সে দিন ভয়ংকর। সব ছাত্রের মনেই বিশ্বাসযোগ্য কারণে সন্দেহ জাগত যে, কবিরা কোনোদিন স্কুল পরীক্ষায় লেখেনি। আমরা ব্রাত্য রয়ে গেলাম সম্মানজনক নম্বরের অনাদায়ে। রবীন্দ্রনাথ স্কুল ছেড়ে করে ছাত্র-কুলের কুলটাদের হয়ে. এক হাত নেওয়ার জন্য আরেকটা স্কুল খুলে বসলেন। শুনেছি তিনি বাক্যের বর্ণাশ্রম খুলেছিলেন - আম্রকুঞ্জের তলায়-গাছের

সামনে; **poetry of its source** । অরণ্য প্রকৃতির বুকে ভাষার মহাসঙ্গম আরও বেশ জাঁকিয়ে বসল। বসুন্ধরার কান হল ঝালাপালা। উত্তরকালে পরীক্ষার পাঠ্যক্রম দ্বিগুণ হল, আরো দুর্গম হল পরীক্ষায় পাশ করা।

ক্রমে বয়স বাড়ল। শোনা গেল কাঁচা বয়সে ভাষা আজকাল সাবালক হয়ে উঠেছে। হৃষ্টপুষ্ট চেহারা তার। কচি ঢ্যাঁড়শ যেমন সরেস, সবুজ, চাষীর ক্ষেতে ডাগর ডোগর দেখা যায় - তেমনি বেড়ে উঠেছে সে। তেমনি প্রাণ ভাসানো মসৃন চেহারা তার। **Lady's finger** যেমন লোভনীয়, নমনীয় গোপনীয় আকর্ষণ। লাউয়ের ডগার মতো লক লকে ছিপছিপে তনুটি তার। ডাগর ভাষায় চিকনগালে মুহূর্মুহু পাউডার মাখাতে ইচ্ছে জাগছে। কচি করে আদর করে দিতেও সাধ হচ্ছে। ভাষা উন্মেষের কচি সংসদ। নতুন গোঁফে যেমন, নবীন প্রেম জাগছে, ভাষার প্রগলভ রাঙা ঠোঁটে। প্রেমিক চোখ, কামুক চেহারা ভাষার কথাবার্তায়। একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে ভাষার ভঙ্গীতে। খানিকটা জ্যাঠামো দেখা দিয়েছে ভাষার ভ্রুভঙ্গীমায়। রহস্যঘন ধরণধারণ ভাষায় ধরা পড়েছে। ভাষার বুকে প্রজাপতিরা আলপনা এঁকে চলেছে।

লক্ষ্যসন্ধানী বাক্যশর অনাদি কালের ধনুতে টংকারিত হচ্ছে। জীবনকে কাহিনী আকারে. ধারাবাহিক পেশ করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ কথার মালাকার হয়ে সক্রিয় বাঙ্ময় জীবন কাটালেন। লিখলেন, "এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।' 'এই কথা বলামাত্র কলমের কালি না শুকোতেই গড়গড় করে বেশ কয়েকটি ছত্র লিখে ফেলে নীরবতার অঙ্গীকার ভাঙলেন। কথার অনিবার্য শিকার আমরা - যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ বাক্যের আশ্বাস।

...এতক্ষণ কথার তরণী ভাসিয়েছিলাম মাঝযমুনায়। তরতর করে স্নিগ্ধ আমেজে আমার কাগজের নৌকা কলমের দাঁড় বেয়ে মগজে ভাটিয়ালী সুরের তান তুলেছিল। বহুকালের ব্যবধান দুস্তর চিন্তায় বড় সুন্দর কলমের আমীর সেজে বিশ্রাম বোধ করছিলাম। ছোট ছোট চিন্তা রাগিণীর মীড়ের কাজ করছিল। জীবনের ভাষা-মূর্তি দেখে চলেছি। প্রাণের সূতিকা গৃহ থেকে বহুরূপী ভাষা আরোহণ করে জীবনের প্রত্যাশাকে স্বয়ংবর সভায় নিয়ে এসে ব্যক্তির আশা আকাঙ্খাকে আলো বাতাস দিচ্ছিলাম।

হঠাৎ পালের বাতাস নেমে গেল। এখন উল্টোবাগে হাওয়ার মুখ ঘোরানো।

" কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে,
কথার সে ভার নামারে মন
নীরব হয়ে শোন দেখি শোন,
পারের হাওয়ার গান বাজে কোন বীনার তারে।"

(রবীন্দ্রনাথ)

গোড়ায় ঘোড়াভ্যাস

এক

ছেলেবেলায় আমাদের খেলার টাট্টু ঘোড়া চাপবার অভ্যাস ছিল। দোকানে পাওয়া যেত। যারা তা পেত না, তাদের ছিল একটা নিরীহ লাঠিকে দুপার ফাঁকে বসিয়ে নিয়ে ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটে চলা। জিভ দিয়ে টাক্‌রায় আওয়াজ করতাম ছুটে চলার কদম তাল। আসল ঘোড়ার পেছনে ঘোরাঘুরি না করে নিজেকেই ছুটিয়ে আনতাম মাঠে, ঘাটে সগর্বে সকলের দৃষ্টির সামনে। একরকম ঘোটক স্বভাব ও খচ্চর বুদ্ধি আমাদের পেয়ে বসেছিল। গুরুজনেরা অশ্বডিম্ব নাম দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের ভীম প্রতাপ তাতে কমেনি। সত্যিকারের জন্তুটি হলে হয়তো পেতুমনা তাকে। ছুটে পালিয়ে যেত আমাদের ছোট্ট নাগালের বাইরে। খেলার সাথী হত না সে। তাই খেলাঘরের এই রূপক জন্তুটির দরকার ছিল আমাদের কল্পনার ভার সম্ভার চাপিয়ে দেওয়ার তরে। Horse's sense মানে যাই হোক, মানুষের নানান হবু সম্ভাবনার পেছনে কাজ করে একটি ঘোড়ার সমর্পিত প্রাণ। Behind every man there is a horse। কলিকাতার বাবু কালচার তো ছিল সবুজ ময়দানের ধারে সাদা জুরি ঘোড়ার ফিটন গাড়ি চড়া। ফুরফুরে ফিটপাট রেওয়াজ। ঘোড়দৌড়ের পেছনে বাজি হেরে পরবর্তী প্রজন্মকে ঋণী করে রেখে গেছে নেশার ফাল্গুনি আনন্দে। মানুষের মনের এই অদ্ভুত ভাঁজ। ঘোড়া দেখলেই বাজেয়াপ্ত করতে হবে তাকে। অশ্ববলে বলিয়ান মানুষ। ঘোড়ার পরাধীনতার পেছনে নানান যুক্তি আছে। অন্যের স্কন্ধে কায়েমী হয়ে জাঁকিয়ে বসা প্রাচীন অভ্যাস। অন্যের চরণকে নিজের রাস্তায় —নিয়ে এসে ইচ্ছে মতো চালানো।

বুড়ো সমাজটার এই এক আদিম অভ্যাস। ঘোড়ার পিঠে ভদ্রাসন ছেড়ে নামবার নাম নেয় না কেউ। সিন্দবাদের পিঠে এক বুড়ো অচলায়তন হয়ে চেপে বসেছিল। চেপে বসে চাপ সৃষ্টি করার খবর হামেশাই কাগজের সম্পাদকীয় কলমে দেখতে পাওয়া যায়, দেশবিদেশের কুশল সংবাদে। এটা রাজার নীতি কিনা । চাণক্যসম শাণিত বিদগ্ধ কূটনৈতিক চাল। শ্রেণী সংগ্রাম অপরাপর শ্রেণীর গলায় লাগাম পড়িয়ে আগাম লাভ লোকসানের সুবিধাজনক শর্ত বজায় রাখার সুকৌশল রণনীতি। রাজসূয় অশ্বযজ্ঞ, অযোগ্য হয়েছ কী সভ্যতার এক বিরাশিক্কা লাথির ওজনে

ইতিহাসের অন্ধ গলিতে নির্বাসিত হয়ে নির্বাপিত মর্যাদায় পড়ে থাকবে। ঘোটক সদৃশ আমাদের মানবসভ্যতা, অশ্বোচিত চরিত্রবান আমরা।

ছোটবেলায় এতটা কাণ্ডজ্ঞান অবশ্যই ছিলনা। আজ ভাবি মনে ছবি ও কবিতার জানালায় খেলাঘরের এই রূপক জন্তুকে, সচল করেছিল যে আমাদের শরীর ও মনের পাখনাকে। বহু ভাইবোন ছিলাম আমরা ঠাকুরদাদার উদার পরিবারের। দেদার ছিল বাল্যসখা। ভগবানের বিভ্রান্তিকর কীর্তির সচল দৃষ্টান্ত ছিলাম আমরা। সকলেরই পায়ে অশ্বক্ষুর লাগানো, ঘুর্ণি হাওয়ার মতো ছটফটে ভণ্ডুল মতিগতি। রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া সাদা ডানায় সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে আসত। শরতের আগমনি আশা-আকাঙ্ক্ষা হাওয়ার গতিতে ভাসিয়ে নিয়ে চলত। পূর্ণ ছুটির অবকাশ কল্পনার রঙে কত বর্ণালী ছবি এঁকে চলত। অবশ্য সেই ছুট মনে মনে অটুট থাকত বেশীরভাগ সময়, গুরুজনের পাহাড়ের আড়ালে। কিন্তু মনটা অনাহারী থাকতনা, মুক্তির স্বাদ-আহ্লাদ পাওয়া যেত। সঞ্চারী হৃদয়। আসল লুকানো সত্যটি অবশ্য ছিল নিজের পা দুটি। তারাই সারাদিন ঘোড়ার পেছনে কল্পনার অত্যাচারে ঘুরে মরত।

সারা সকাল শিশু ছোটাছুটি করেছে। এখন দুই পা বেদনায় ক্লান্ত, নড়তে চায়না। Home task - এর ফাঁকে ছুটির ছারপোকা পেয়ে বসেছে আরেকবার। চুলকিয়ে চলেছে ক্রমাগত। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছে ভাঙা চাঁদের আড়ালে। চোখের পাতা ইস্তফা দিতে চাইছে! ঘোড়ার আস্তাবল বুঝি এবার ফাঁকা। পালিয়ে গেছে দিনের শাসন ফাঁকি দিয়ে তেপান্তরের মাঠে। চাঁদের আলোয় ছুটে চলেছে তারা। সকালবেলার চেনা মুখগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যার ম্লান আলোতে— যাদের ঘোড়া ঠেকত, সুযোগ বুঝে সুবিধে আদায় করা যেত যাদের সরল স্নেহের দুর্বলতায়। সবকয়টা অশ্ব হৃতসর্বস্ব হয়ে এবার মায়ের কোল আলো করে চেপে বসা। সারাদিন পথ ঘুরে পাথেয় হারিয়ে মায়ের আস্তাবলে ফিরে আসা। Rock thc cradlc mother । মায়ের কোলে লঘু দোলায় জীবন কত নরম ও উষ্ণ। তখনও শিশুর পা দুখানি কোলে প্রবল বেগে ছট ফট করে চলেছে। অশ্ব চালনা করছে সে। বহুকাল পরে মা ও বাবা যখন নেই, জীবনের একই দোলনা খরবায়ুর দোলা লেগে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠবে, সংসারের ভেলা বুঝি ভেসে যাবে অকুল পাথারে। শিশুসাথী ঘোড়া খোঁড়া হয়ে যাবে অদৃষ্টের তস্কর- আক্রমণে। শেষের যাত্রা নিজের পায়ে বহুদুর পথ চলা, একটি চরণ বাবা অপরটি স্বয়ং মা, জীবনটাকে বহন করে চলেছে।

সারা জীবনের ঘোড়াভ্যাস শিল্প, কলা, সাহিত্যেরও গোড়ার কথা। আসলে কিন্তু ঘোড়া কিছুই টানে না, মনের ভূল মাত্র, তুমি টানো তাকে। শিল্প কিন্তু মানুষকে বহন করছেনা, শিল্প বিজয়ের কেতন মানুষ নিজের কাঁধে বহন করে চলেছে হ্রেষারবে হৃষ্ট চিত্তে। বহ্নিমান এক বহন ইচ্ছা মনে সাড়া জাগাচ্ছে। ঘোটকাবতার। আবাল

বৃদ্ধ বনিতা এই গোড়ার অভ্যাস ছাড়তে পারে না, ভনিতার আড়ালে। আসলে খেলবার অভ্যাসটা খেলিয়ে চলেছে নিজেকে। খেলোয়ারি মানবমন! বয়সকালে বুদ্ধির গোড়ায় দুর্বুদ্ধি গজিয়ে উঠেছিল ঘোড়ার। ঘোড়ায় চাপা অভ্যাস অব্যাহত থাকল। এবার বিশ্বরূপ দর্শন মনের গাছে কুঁড়ি হয়ে এক ক্রোড়পত্র লিখে পাঠাল। একটা ঘোটক পরিকল্পনা। নিজ কাঁধ ছেড়ে অন্যের স্কন্ধে শোভা পাওয়ার ইচ্ছে আর চাপা রইলনা। বেশ শক্ত-সমর্থ, যাকে বলে বৃষস্কন্ধ হলে ষোলকলা ইচ্ছে পূর্ণ হয়। এতদিন সেই চেষ্টাই করে এসেছি। যাকে বলে to take you for a ride। কখনও সফল হলাম, কখনও লাথি খেলাম। অনেক সংগ্রাম- অভিজ্ঞতায় টের পেলাম যে সকল মানুষকে ঘোড়া- জ্ঞানে চড়াও হওয়া সভ্যতার মূল চেষ্টা। এই যুদ্ধেই ইতিহাসের সকল চড়াই-উৎরাই। এই ধরণের বিশেষ আচার ব্যবহারে মানুষ কোনদিনই অর্বাচীন ছিলনা। চিরকালটাই আকাল কেটেছে অশ্বের ইতর প্রাণে। শিশুর অপটু অভ্যাস উত্তরকালে অত্যন্ত চতুর, দুরদর্শী জটিল বুদ্ধি হয়ে চিত্তশুদ্ধি করে তুলেছে। অকপটে আজ স্বীকার করলাম সে কথা, কপাটহীন নিলাজ আত্মসমর্পণ। কলমের পিঠে চেপে বসে নিজেকে কবুল করায় এক ধরনের আত্মপ্রসাদ আছে—যা নিপুণ ঘোড়সওয়ারীকে সাজে। ঘোড়দৌড়ের জকি। তার কীর্তি লেখার বিলাসিতা পেয়ে বসেছে আমাকে।

তুমি ও আমি পরস্পর পিঠে চেপে বসার প্রতিযোগিতা চলেছে। কখনও তুমি, কখনও আমি হাসছি, কাঁদছিও বটে। বীর অভিমন্যু সংসারব্যূহে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রবেশ করলেন, ফেরবার পথ না পেয়ে অশ্বচ্যুত হলেন। তার পর বিভ্রান্তিকর পালা। সকলে আমাকে নিয়ে ফুটবল খেলেছে। ছুটে গেছি একজনের পায়ের তাড়ণায় আর একজনের পায়ের পাল্টাঘাত খেতে। মুখ থুবড়ে থমকে দাঁড়িয়েছি আর একজনের বুটের কাঁটার তলায়। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছি বাইশ জোড়া লড়াকু পায়ের ব্যূহবেষ্টন বাঁচিয়ে গোলাকার গোকুলে, বৈকুণ্ঠের সন্ধানে। স্বয়ং রামের জোড়া খড়ম মনে মনে জপ করে চলেছি এদের ঠেকিয়ে রাখার ভরসায়। সভ্যতার ম্লান লণ্ঠনের আলোতে সংসারের জটিল আবর্তে পথ ঠাহর করা কঠিন। বিতত-বিতংস। এক বিস্তৃত ফাঁদ আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ঘোড়ার পেছনে মুগ্ধ আকর্ষণে। আমিও দার্শনিক। (যদিও আয়নাতে চেহারা দেখলে একটা হতাশ চিন্তা অবশ্যই হয়) । সীতা সোনার হরিণের পেছনে লক্ষণকে পাঠালেন এক অলুক্ষণে চতুষ্পদ বাসনার তাগিদে। তার ফলে রাক্ষসকুলে বাস করতে হল তাকে। তারপর বাল্মীকি অনেক সাধনার বলে প্রচুর বাক্যব্যয় করে মহাকাব্যের অতুল কথাসম্ভার গড়ে তুললেন। অসংখ্য কথার শ্রেণীবদ্ধ শক্তি দিয়ে রাক্ষসকুল বিধ্বস্ত করে সীতাকে ছাড়িয়ে আনলেন অযোধ্যায়। রাম কাল বিলম্ব না করে সীতাকে ঘরে না তুলে ভূতলে পাঠালেন।

আরেক মহাকাব্য। হেলেনের মুগ্ধ আকর্ষণে হাজার হাজার সৈনিক কাঠের ঘোড়ার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে ট্রয় শহর ধ্বংস করেছিল। ঘোড়ার পেটে এত বুদ্ধি। এর সঙ্গে বামাখ্যাপা সেনাদের সমর-শক্তি জুড়ে দিলে ইতিহাস আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

দুই

ভারতের স্বাধীনতায় পঞ্চাশোত্তীর্ণ বয়স হল। তবুও এতকাল স্বাধীনতার পিঠে যুতসই করে চেপে বসা গেল না। অবাধ্য এই ঘোড়া। ইংরাজদের আমলে রসরাজ অমৃতলাল বসু শিখিয়ে ছিলেন " দৌড়, দৌড়, দৌড়েই দেশের স্বাধীনতা। " ইংরেজ গোরা সৈন্যদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য এই ছিল উপদেশ। কতই দৌড়াদৌড়ি করলাম কাতর পলায়নে, রোমহর্ষক এই অসাধারণ তৎপরতা আমার। তবুও তো বিধি বাম। আমার জীবন কাহিনীর নটে গাছটি মুড়িয়ে কুটি কুটি করে চলেছে ভারতের স্বাধীনতা। এই জীবন ইতিহাস অঙ্গে জড়িয়ে ধরে একটু ধ্যানাসনে বসব তার জন্য প্রয়োজনীয় কৌপিনটুকুও সঙ্কুলান নেই আমার। ইঞ্চি ইঞ্চি করে জীবনে এগিয়েছি—ant's progress যেমন, চিনির দানা মুখে নিয়ে রেশনের দোকান থেকে। এককালে বিদেশী সরকার আমাদের দেশী ঘোড়া বেশ শক্ত ক'রে চড়ে বসেছিল, সুপটু সওয়ারী হয়ে উপযুক্ত ঘোড়া-শিক্ষা দিয়েছিল আমাদের। আজকাল কেমন খোঁড়া হয়ে গেছি।

আমাদের সনাতন সভ্যতা কিন্তু আমাদের মতো অর্বাচীন ছিলনা মোটেই। ভারতের দেবদেবীরা পছন্দ অনুসারে বাহন চেপে আবির্ভূত হ'ন, এটা আমাদের প্রাচীন সংস্কার। যেমন সিদ্ধিদাতা গণেশের বাহন ইঁদুর আমার গোছানো সংসারের গায়ে ক্রমাগত দাঁত বসিয়ে চলেছে। আমার নিশ্ছিদ্র সযত্ন ব্যবস্থাপনার দুরদর্শীতাকে বিনাশ করে চলেছে একনিষ্ঠ গোঁ ধ'রে। তার এই অধ্যাবসায় দেখে শিক্ষা হয় যে সিদ্ধিলাভ করতে হলে অন্যের পাকা ধানে কী করে মই দিতে হয়, তাদের সৌভাগ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ভাবে সুড়ঙ্গ তৈরী করতে হয়। সাধে কী গণেশের সিদ্ধ বাহন সে! এই বাহনটিকে রোধ করতে পারিনি। ইঁটের পরে ইঁট চাপানো আমার ইমারতকে পাল্টা জবাব দিয়ে চলেছে সে। সারারাত টিপ্ টিপ্ বুকে সারা বাড়ি জুড়ে ইঁদুরের সাতকাহন শুনি, দূর্গা নাম জপ করে রাত্রির বিভীষিকা কাটাই। বস্ত্র হরণের মতো আমাকে নিরাবরণ করবার জন্য তীক্ষ্ণ দাঁতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইঁদুর মারা বৌয়ের বারণ গণেশের কৃপার্জন করবার জন্য ঘটা করে পূজো চড়িয়ে দেদার খরচ করে চলেছে সে। দুজনের মিলিত শক্তিতে আমার পাকা ভিত্ নড়ে উঠছে। এবার বুঝি ঘট উল্টে যাবে। একেবারে পরাস্ত হয়ে বুকের ভেতর ধরাস্ করে ওঠে! আশঙ্কা,

ইঁদুর কী তবে গৃহিণীর নিশীথ সংস্করণ?

...একবার কার্ত্তিকের দিকে ফিরে চাও। সুন্দর সাজে স্বর্গদ্বারে সেলুনে দাঁড়ি গোঁফ কামিয়ে manicure করে ময়ুরবাহন চেপে রণং দেহী ভুমিকায় পূজো নিতে এল। পেটপূজার চাইতে রমণ দৃষ্টির আরাধনা বেশী ভালবাসে। রমণীকূল দিশাহারা করে তোলে বিশেষ Romeo ভঙ্গীতে। পুরুষরাও কার্তিকম্মন্য হয়ে নির্বীর্য্য হয়ে পড়েন। তবে কী না সকলকে ময়ূরের পেখম মানায় না। তুমি, আমি পেখম মেললে রুচিবোধে আঘাত লাগবে শুচিস্মিতা রমনীদের। Casanova হওয়ার ছাড়পত্র বিদগ্ধ সমাজ সবার হাতে তুলে দেয় না। যারা সেই প্রেমপত্র পেল তাদের সাত খুন মাপ হয়ে জেনানার মহলে, বহুরূপী প্রেরণায়। ময়ূরবাহন দিয়ে কন্দর্প কার্তিককে যায় চেনা। ময়ূর আমাদের জাতীয় পাখী। কার্তিকের অধর প্রেম কৃষ্ণলীলার মতো এক নধর ভক্তি শাস্ত্র।

শ্বেতবসনা সরস্বতী বীণাপাণী হয়ে রাজহাঁস চড়ে আসেন পরীক্ষার টোকাটুকির আড়ালে। জ্ঞান সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে চলেছে দেবীর রাজহাঁস। অথচ সমুদ্রের ছিটে ফোঁটা জল রাজহাঁসের অঙ্গে ক্ষণকাল স্থির থাকে না, অস্থির হয়ে ঝড়ে পড়ে। সন্তানের দুশ্চিন্তায় দেবীর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমার গৃহিণী নিরম্বু উপোস করে। জলস্পর্শ করেনা, অথচ এই সহজ সত্য কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনি যে আমারও সেই একই পিছল স্বভাব, লক্ষণের কোন অভাব নেই আমার বরতনুতে। কারণ জ্ঞান সমুদ্রের ছিটে ফোঁটা জল সিক্ত করতে পারেনি আমার চৈতন্যকে। গুরুজনের উপদেশ গায়ে মাখিনি কোনদিন। কিস্যু বুঝিনা। এই আমার অপোগণ্ড স্বভাব।

ছেলেবেলা গ্রামে গঞ্জে বাস ছিল। বিজলীর আলো তখন গ্রামে প্রবেশ পায়নি। পল্লীগ্রাম ছিল রাত্রির অন্ধকারে ঢাকা। থমথমে নিশীথে আকাশের চোখ বোঁজা। পেচার চোখে রাত্রি জাগরণ। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। গ্রাম সমাজে দিবারাত্রির সংবাদপত্র সে লিখে চলেছে বিনীদ্র রজনীতে। সজাগ চোখ তার নিদাঘ নিশীথে। বাতায়নের ফাঁকে ঘুমন্ত সংসারে অস্ফুট প্রসব বেদনা এক ঝলকে গেঁথে তোলে আগামী শিশুকে, লক্ষীর আঁচলে পূর্বাপর ইতিহাসের গ্রন্থনায়। দেওয়াল ঘড়ি যেন এক বিজড়িত স্বপ্ন কথা বলে। ছোট সংসার, তবুও লক্ষ্মীর ফুটো ঘটে পয়সা ভরে দিচ্ছে মানুষগুলি। সংসারে গৃহলক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে অলখ রাতের আড়ালে। কিংবা ভগ্নদূত পাঠায় ভরাক্রান্ত বুকে। চঞ্চলা গৃহলক্ষ্মী। অচঞ্চল গৃহীর ভক্তি...।

শিবের বাহন ষাঁড়, মন্দিরের পূজোপাচার কলাটা মূলাটা আত্মসাৎ করে চলেছে হরপার্বতীর প্রশ্রয়দানে। ধর্মের ষাঁড়, তাই অবাধ যাতায়াত তার। বিশ্বনাথের মন্দিরের অলিতে গলিতে মানুষের ভীড় বিস্ফোরিত করে হেঁটে চলে পূর্ণ গাম্ভীর্যে। কৈশোরে আমার পাড়া বেড়ানোর শখ ছিল বেলা অবেলায়। ধর্মের ষাঁড়, এই ধরনের

মন্তব্য শুনতাম আমার পেছনে। মর্ম বুঝতাম না। কিন্তু স্বভাবটা ছিল আশাবাদী। তাই ধর্মের নাম শুনে আশায় বুক বাঁধতাম। ষাঁড় বলাতে একটু অস্বস্তি হত যদিও, তবু একটু বল পেতাম মনে।

তিন

শূন্য মস্তিস্ক শয়তানের কারখানা। কোন নিটোল কাজ হাতে নেই, এই অবসরে নানান অভিসন্ধি মাথায় ধুমায়িত হচ্ছে, কলমের ডগায় চলে আসছে এই সব সারমেয় উর্বর চিন্তা। আমি কী যৎপরোনাস্তি নাস্তিক হয়ে গেলাম, ধর্মভীতি, ভবভীতি চলে গেল কী একেবারেই? সকলে মিলে আমার পিলে চটকাবে, চটকলের মেশিনে ফেলে দিয়ে। গুরুজন, স্বজন, বন্ধুসমাজ, সকলকেই আমি চটুল রসে চটিয়ে ফেললাম। এবার চটি দুখানি ফেলে নাঙ্গা পায়ে পাল্টি দিয়ে চম্পট্ দিতে হবে বুঝি। অশ্ব দিয়ে গল্পের অবতারণা করেছিলাম। পরিণামে হয়তো অশ্বেতর খচ্চর নাম পাকা হলো। ভুশন্ডির মাঠে পাঠিয়ে আমার সকল আনন্দ ভূতপূর্ব করে তুলবে সকলে তখন আমার উদ্বাস্তু জীবনে এই কলমই আমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। যার চরিত্র নেই, কলঙ্কের কালি রয়েছে তার কলমের ডগায়, মদত জুগিয়ে চলেছে সে।

এক সাহিত্যিক বন্ধু আমার উৎসাহের আগুন উস্কে দিচ্ছে। বলে চলেছে যথেষ্ট পরিমাণে ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হয় নি। ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে গাছে উঠে বসতে পরামর্শ দিচ্ছেন। পরামর্শটা একটু বিভ্রান্তিকর ঠেকছে। কোন শক্তিশালী বৈরীর আশঙ্কা করছে হয়তো। গাছের সঙ্গে আমার সাতিশয় ওঠা-বসা ছিল না কোনদিন। সাহিত্যের আসরে এমন হনুমানিক শক্তি-পরীক্ষা দিতে হবে অনুমান হলে আগেই এই তালিম নিতাম। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর ঘোড়ার পিঠে যোদ্ধৃবেশ পরিত্যাগ করে গাছের মগডালে শাখায়িত হয়ে আসন গ্রহণ করা সভ্যমানুষের অভিধানের ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া নিজেকে আগাছা মনে করাই আমার পুরাতন অভ্যাস। ছাগলে যা মুড়িয়ে খায়। নগ্ন গাছের স্কন্ধে মগ্ন হওয়া কী দরকার। বেল পাকলে ঘোড়ার কী? **Do not change horse in the mid-stream**। জীবনের চর্কী ফাঁদে ঘুরতে ঘুরতে মাঝপথে বিশ্বস্ত ঘোড়া ফেলে গাছের গায়ে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ নয়। অশ্বযানে স্থানান্তরে যাওয়া যায়, গাছ ততটা আজ্ঞাবহ নয়। গাছের কোন ভাবান্তর, মতান্তর, স্থানান্তর নেই। অবশ্য গাছ থেকে গাছান্তরে লাফিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু কাজটা একেবারেই মানবোচিত নয়। নিতান্ত অসামাজিক আমার বন্ধুর প্রস্তাব। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আমাকে গাছে চড়িয়ে ঘোড়া টেনে নিতে চান এই ভদ্রলোক। এটুকু স্বীকার করা যায় যে ঘোড়ার দানাপানি লাগে। গাছের সে বালাই নেই। পোষ মানে সহজেই, তোমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না কখনও। তবে

অন্য দুশ্চিন্তাও আছে। গাছ একটা বারোয়ারী ব্যাপার। বারো ভুতে একই সঙ্গে সঙ্গী হয়ে গাছে বসার অধিকার রয়েছে। হনুমান, শ্যাওড়ার ভূত বা শাকচুন্নী, ডাকিনী যোগিনী, শকুন, শকুনী, শুঁয়োপোকা, ডেঁয়েপিপড়ে, ময়াল সাপ, চিতাবাঘ ইত্যাদি বড় বিচিত্র এই অরণ্য সংসার। এই ভরাট সংকট ভূমিতে হঠকারিতা করে কাজ কী? অরণ্যে রোদন করে লাভ নেই। তবে কিনা গাছ থেকে ফল লাভ হয়, গরীবমানুষ ফলাহার করে প্রাণ ধারন করে। কোন গভীর দুশ্চিন্তা অথবা গতর খাটিয়ে দুঃখ দিতে হয়না শরীরকে। এদিকে আবার অন্য সমস্যা। হিন্দুশাস্ত্রে ফল সরাসরি নিষিদ্ধ। 'মা-ফলেষু কদাচন'। অর্থাৎ কিনা ফল খাওয়া দুরের কথা, ফলের আশা করাও শাস্ত্র বিবেচিত নয়। জ্ঞান বৃক্ষের আপেল খেয়ে আদম ও ইভের সন্তানেরা আক্কেল সেলামি দিয়ে চলেছে। বংশানুক্রমিক সংক্রামক শাস্তি হিসেবে।

অশ্ব বনাম বৃক্ষ ঘোরালো চিন্তা, সুবিধা-অসুবিধার যোগ-বিয়োগ কষতে কষতে বিভ্রান্ত মনে এক সময় এসে দাঁড়িয়েছি বটগাছের তলায়। সাক্ষাৎ দেখলাম তার সনাতন রহস্য—ঘেরা প্রাচীন প্রশ্ন মূর্তি। সসম্ভ্রমে দেখলাম তার জটা-জালের অঙ্ক সমস্যা। বটবৃক্ষের সমান সনাতন চেহারা একটি মানুষ সটান শুয়ে আছে গাছের তলায়। কোন ভূমিকা না করেই বলল সে, "এতদিনে পথে এলে? জানতাম আসতেই হবে একদিন বটভূমির বধ্যভূমিতে। এবারে শুয়ে পড়ে চেয়ে দেখ আকাশে। শরীরকে কষ্ট দিও না। দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে দণ্ড দিও না। তোমার দৃষ্টিকোণ এবার উল্টে দিয়ে নজরটাকে শয়নে এলিয়ে দাও, দেখবে গাছের অটুট গাঁথুনি শিথিল হয়ে পড়ছে, ভিত্ ভেঙ্গে পড়ছে তির্য্যক দৃষ্টির বানে।" আমি প্রশ্ন করলাম এই বটাশ্রয়ী মানুষকে, আপনি কী করেন বটে? উত্তর এল, আমি গাছের কড়িকাঠ গুনি বটে, ভূত-ভবিষ্যত গণণা করি তার। এবার বেশ মুস্কিলে পড়া গেল। চিন্তার এক আবর্তে পা ফস্‌কিয়ে আমার গল্পখানি অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। বাড়ি ফিরতে পারলে হয়। হঠাৎ কোন আরণ্যক রহস্যে পথ হারালাম। ভূঁইফোড় এই মানুষটি মাটিতে কান পেতে গাছের অঙ্কুর চিন্তায় বিভোর। আমাকে এক বাহারে প্রশ্ন করল সে। " তুমি কী ভেবে দেখেছ, গাছ হতে চাও কিনা"? প্রশ্ন শুনে আমার ঘোড়াগত অন্তরাত্মা হাহাকার করে বলল, "চাইনা, চাইনা। আমি বটব্যাল হতে চাইনা মোটেই। কোনদিনই ব্যাটে ও বলে লাগাতে পারিনি আমি। বটগাছে আমার কোন আসক্তি নেই"। আমার কথা শুনে লোকটি বটের সমান দির্ঘাকার নিঃশ্বাসের হাওয়ায় হতাশার ঝড়ে কেঁপে উঠল। কে এই দিব্য পুরুষ? এক স্বর্গভ্রষ্ট মহাপ্রাণ দেবতার অভিশাপে পৃথিবীতে খসে পড়েছে, হয়তো স্বর্গের নন্দনকাননে পারিজাত গাছের ডাল হয়ে জীবন ধারণ করত। স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে মানবসংসারে প্রশ্নের ধূর্মজাল ছড়িয়ে চলেছে, "তুমি কী চাও সত্য বটে বল"।

আমার অকৃত্রিম স্বভাব অনুসারে বলি, "স্যার, আমি ঘোড়া, তুমি সওয়ারী, যেমন চালাও তেমনি চলি"। বটকেষ্ট চটপট উঠে ঘনিষ্ট হয়ে কানে কানে বলল, " তথাস্তু,

তবে কথাটা অন্যত্র কানাকানি না করাই ভাল। তোমার মতন খচ্চর স্বভাব ও আমার কাষ্ঠবুদ্ধি হাত মেলালে মানুষকে লাঠ্যৌষধি দেওয়া যাবে বটেক"। আমি ইঙ্গিতের সঙ্গীতটা বুঝতে না পেরে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে উঠলাম।

কোণঠাসা ঘরে

এক

সুপ্রভাত, আপনারা এসে পড়েছেন দেখছি। খুঁটিয়ে দেখছেন আমাকে। ঐ যাঃ, ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজল। পোষা কুকুরটা আমাকে নিয়ে হাঁটতে বেরোবে। গাড়ী,বাড়ী,মন্দির,যেখানে সেখানে ঠ্যাং তুলে প্রাতঃকৃত্য সারবে। শহীদের মঞ্চ হলে তো কথাই নেই। পাড়া প্রতিবেশী আমাকে অভিশাপ দেবে। এর পর বাজার যাত্রা। তারপর অফিস। বড্ড মাপা লেংথে খেলতে হয় আমাকে। এই তো দেশের অবস্থা। সকাল ছয়টা থেকে জেগে বিছানায় আন্দোলন করছিলাম এক গেলাশ সর্দারজীর মাপে কফি খাওয়ার জন্য। এই একটা জায়গায় আমি অসাধারণ, বাড়ীর সকলে চা খেয়ে চরিতার্থ হয়। কফি খেলে আমাকে কবিতায় পায়। মনের ভেতরটা সকালের মোরগের ডাক ডেকে ওঠে। শিকল ভাঙার একটা অতল 'আহ্বান শুনতে পাই। আসলে ঘোর সংসারী কি না। ভোরের বেলায় বিছানায় শুয়ে আমি হাতি, গণ্ডার শিকার করি। এই সখের বিছানাটাই আমার মা, বাবা। সর্বংসহা। যখন তখন বডি লেংথে হাত পা ছোঁড়া যায়।

হঠাৎ আজকের খবরের কাগজটা উড়ে এসে জুড়ে বসল আমার প্রশান্ত মুখের ওপর। খোলা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে গেল কাগজের হকাররা। ভারী বেরসিক মাইরী! আজকাল খবর পড়েন কী? হৃৎপিণ্ড হাতে ধরে কাগজে ভয়ে ভয়ে চোখ বোলাই। কাগজ পড়লে সন্দেহ হয়, ভগবান এই সংসার সৃষ্টি করলেন কোন দুঃখে? ভগবান, ওরফে ভগা কোনটাই ঠিক মতো ঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে সৃষ্টি করে গেলেন না। খবর তো নয়, কালবোশেখী ঝড়ের মেঘ। রোজ সকালবেলা শিবের এই হলাহল পান করা কী দরকার, এ্যাঁ! পঞ্চাশ বছর বয়স হলে কাগজ পড়া স্বাস্থ্যের গায়ে কাস্তে চালানো হয়ে যায়। হাড্ডিসার এই দেশটা। মাংস মজ্জা শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গিয়েছে। এদিকে কাগজ না পড়লে, চা, কফি না খেলে বেগ আসে না। স্নানেও প্রাণ আসে না। অভ্যাসটা বাবা ধরিয়ে দিয়েছিলেন, ''জগা, খবরের কাগজটা অবহেলা করবেনা। বাপের খবর নাই বা নাও, দেশের খবরটা দর্শন করো। গরিবের কথা শুনে চলো। ইংরেজিটা ধাতস্ত হবে। স্টেটসম্যানের এর editorial নিমপাতার রসের মতো গিলে যাও, বোঝ আর নাই বোঝ। প্রথম প্রথম নাড়িতে সাড় পাবে না। একদিন

তুমি দিগ্‌গজ হবে।" ....বাবার আবার তিরস্কার শোনা গেল,"জগা, তোমার হাবা স্বভাব কাটবে কবে? প্যান্টের বোতাম ঠিক করো। নাকের সর্দি মুছে ফেল। হাতের লেখাটা কেন চাষার মতো?"....বুঝুন দেশের অবস্থাটা। আমার আবার কলম ধরাটা হাতে যুতসই আসেনা। মনের ওপর একটা চাপ আসে। কলম ধরি ছুরি হাতে নেওয়ার মতো। লেখার সময় নিম্নচাপ বেড়ে যায়। টেবিল আর মেদিনী দুটোই কাঁপতে থাকে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকার মতো।আমার একটা বাহারী সই ছিল,বড় আদরের স্বাক্ষর।এখনটা কেমন? স্বাক্ষরের অক্ষরই চেনা যায় না।অফিসের ফাইলে বিস্তর সই করি সারাদিন। আর সয়না। আজকাল নামের জায়গাটা কালি ছিটিয়ে দিই। ব্যাস্! এই তো দেশের অবস্থা।

(দীর্ঘনিঃশ্বাস) সারা জীবন সংবাদ পত্রের পাতায় কতই হাঁটা-হাঁটি করলাম তা আমিই জানি। কিন্তু আমার নামে কোন খবর হলনা। কী পেলাম তবে ! আগের দিনটা অন্য সকলে কী কাজ বা অকাজ করে সময় কাটাল, পরের দিন তাই কাগজে চেটে বাসি মুখে নিজের সময় খরচ করলাম। কে যেন বলেছিল এই কথাটা? নামটা পেটে আছে, মুখে আসছেনা।-"গাঁটে বাত?" আরে না, অমন সৃষ্টি ছাড়া নাম কারুর হতে পারে না।ও হরি, মনে পড়েছে, জার্মান দার্শনিক**Goethe**।অনেক খেটে নামটা প্রাতঃকালে মুখস্থ করেছিলাম। বাবার উপদেশ ছিল,"জগা,মুখস্থ করলেই যথেষ্ট নয়, মা সরস্বতীকে ঠোঁটস্থ করো বাপ।" আমি কী পাখী না কী যে ঠোঁটে স্কুলের ব্যাগ বয়ে নিয়ে বেড়াব? বুঝুন দেশের অবস্থাটা একবার।হয়তো আমার **obituary**



ছাপা হবে একদিন কাগজে। "আমরা স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা করি।" **In memorium** ।একটা খসড়া **obituary** লিখে রেখেছিলাম, যেদিন ডাক্তার এসে সিগারেটের বিরুদ্ধে হুকুম দিয়ে গেল। একদিন অফিসে অবসর নিতে হবে। সেদিন অফিসের ফটক পেরিয়ে সামনের গঙ্গার ঘাটে একটা নৌকা ধরব। সেদিন আমার ভাসান। জোয়ারের স্রোতে দুটি চোখ ভেসে চলেছে। সেদিনটা আষাঢ়ের মেঘ হাজার বছরের নিশুতি গল্প শোনাবে কলকাতা শহরকে। কিম্বা ইলশে গুড়ি বৃষ্টি পড়বে। আমি তখন মাঝদরিয়ার কূল ভাসানো গান শুনছি।

ছোটবেলায় মেলা সাধ ছিল। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াব। **Wanderlust**। আমি **globe trotter**। খটাখট ঘোড়া ছুটছে আমার। সীমানাতীত আমার চোখের নজর— দুস্তর প্রান্তর পেছনে সরে সরে যাচ্ছে! **Frontier spirit**। **Forward ho**! দুর ছাই দেশটাই দেখলাম না, বিদেশ তো দূর অস্ত । আসলে একটা খাই খাই হ্যাংলা স্বভাব ছিল যখন হাফ প্যান্ট পড়তাম। স্কুলের মাস্টার বলেছিলেন, "শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' উপন্যাস পড়ে দেখ, জীবকে ভালবাসতে শেখ। চাই চাই করলে চলেনা। ব্যাপারটা বোঝার আগেই চেয়ে বসি। আব্দার করলাম, "আমি মহেশ হব"। মাস্টার বললেন," সাবাস বেটা, তুমি যে জন্ম-গরু সে ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহই ছিলনা।"

এই তো দেশের অবস্থা। সেদিন থেকে আমি দমে গেলাম, ঝিম্ মেরে গেলাম জীবনে। মনের ভেতরে একটা পাল তোলা নৌকো চলছিল তরতরিয়ে। হঠাৎ পাল ফেলে দিয়ে ভাঁটার জলে অন্য পথে পাড়ি দিলাম। আমি হব "ঘুম" স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। দার্জিলিং পাহাড়ের চড়াই উৎড়াই বেয়ে শিশু-সাথি টয় ট্রেন ছুটে চলেছে।—

ঝুক্ ঝুক্, ঝুক্ ঝুক্ ,
হুঁকোমুখো উজবুক, আহাম্মক
বুজরুকি, শোন খুকি, ধুকপুক
ঝুক্ ঝুক্, ওয়াক থুঃ।

নেপালী কাঞ্চারা চা আনছে ট্রেনের ভিতর। গাছেদের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে, মানুষের চোখ খুদে, নাক অদৃশ্য হয়েছে, লামারা দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে। একদল লোমশ পাহাড়ি কুকুর ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। হঠাৎ কুয়াশায় ভেতরে বাইরে সব অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্রেন থামল "ঘুম" স্টেশনে। স্বচক্ষে দেখছি, আমি ঘণ্টা বাজালাম, সবুজ নিশানা দেখালাম। ট্রেন বিদায় নিয়ে গেল। আমি কী করলাম? কম্ফর্টার, লেপ, কম্বল চাপিয়ে দিন ও রাত্রির মাঝখানে নিদ্রার যবনিকা টেনে দিলাম।

আজকাল নতুন আর পুরাতন নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করছে। একটা **millennium** দোরগোড়ায় এসে ঘোষণা করছে। এক কদমেই আমরা অন্য যুগে পৌঁছে যাব। একটা ক্রান্তিকারী সম্ভাবনা। আমার এই আকাশচারিতা, বা হনুমানিক দুরন্ত দুরাশা সাজে না। আমি নেহাতই ছোট মাপের মানুষ, বড়সড় কাজে আমার হুঁশ নেই। আসবেন আমার গরীবের আস্তানায়। আস্তিন গুটিয়ে আসবেন না। ঢুকে পড়ে আমার কোণ ঠাসা ঘরে জুতো ছাড়বেন। পায়ের ধুলো ঝেড়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারবেন। বাড়ির আবহাওয়া, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা — এই সমস্ত বুলেটিন আমি আগাম জানিয়ে দিই । দিনের বেলায় একটা উত্তপ্ত লু বইতে থাকে অন্দরমহলে, জল তেষ্টা পায়, মরীচিকা দেখা যায় গৃহিণীর সেয়ানা হাসিতে। সন্ধ্যা নামলে বেশ হিমশীতল হয়ে যায় সারা বাড়িটা। আমার গলার স্বর তখন শেয়ালের ডাকের মত শোনায়।

আজ আমি সেই কোণঠাসা ঘরে বসে আছি। এই ব্যাপারখানা কী রকম? রাজধানী দিল্লীতে গরুরা সারি সারি সংসার পেতে বসে আছে রাস্তার মাঝখানে সোজা লাইন বেঁধে। রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথায় স্কেল মেপে দেখা যায় গরুদের এই গঠনমুলক প্ল্যান। অনেকদিন লেগেছিল রহস্যের পরিমাপ করতে। দুই দিকে গাড়ির স্রোত চলছে। গরুরা এক ফালি **no man's land** এ ঠাঁই পেয়েছে গাড়ির ঠেলা খেয়ে। আমার অবস্থাটা কতকটা সেই রকম। জনস্রোতের ঠেলাঠেলিতে কার্ণিক খেয়ে কোণঠাসা ঘরের এক ফালি জমিতে গোয়াল পেতেছি।

আজ রবিবার সকাল। ছুটির দিনে বক্‌বক্ করে চলেছি। আমার **biography** বড্ড ন্যাড়া। কোন নাটকীয়তাই নেই আমার ইতিহাসে। সৎ নায়ক কিম্বা খল নায়ক— কোনটাই আমি নই। আমার দিনগুলোতে কোন রোম্যান্টিক গেরো নেই। আমাকে কীসে মানায়? সকালবেলা খবরের কাগজের আড়ালে অর্ন্তধান করা আমাকে বেশ মানায়। আছি অথচ নেই। "এসেছিলে তবু আসো নাই, জানায়ে গেলে।" সংসার জীবনে আমার আবির্ভাবটা খানিকটা এই ধরণের। মুখ ডুবিয়ে সংবাদপত্রের মধ্যে ভরাডুবি হয়ে আছি আমি। মগজের ভেতর খবরের গোত্তা খেয়ে আত্মা-ঘুড়ি লাট খাচ্ছে আকাশে, শ্রীচরণ দুটি লোহার শেকল দিয়ে মাটিতে বাঁধা আছে। শ্রীচরণের ঠিকানা? বাজার, বাড়ি, অফিস, লুকিয়ে দোকানে ফুলকপির সিঙ্গারা, কিম্বা ফুটপাতের আঁধারে তেলেভাজা বেগুনির গায়ে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ানো। জীবনটাই আলুনী বিস্বাদ লাগে। আমি বলি ভাই তাজা আলু না পাও, তবে ভাজা আলু খাও।

আপশোস কোরোনা জীবনে। "**If fate hands out a lemon make a lemonade**।" কে যেন বলেছিল এই আপ্ত বাক্য, কে যেন লিখেছিল এই রোগীর পথ্য? ও হরি, মনে পড়েছে। **Del Carnegie**। "**How to win friends, and**

influence people।" বিখ্যাত বই লিখে বহু টাকা পেটাল। পরীক্ষা করেছিলাম আমার স্ত্রীর ওপর। হিতে বিপরীত হয়েছিল ভাই। আমাকে গরম ইস্ত্রীরির তলায় জলছবি করে দিয়েছিলেন বাঙ্গালীর বউ। বুঝুন দেশের অবস্থাটা।

আমাকে আর কিসে মানায়? থলি হাতে বাজারের পথে আমাকে রাজার মতো দেখায়। চেহারাখানা যেন থলির বেড়াল ছাড়া পেয়েছে। সব্জীর বাজারে শীতের মরশুমে আমি প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াই। মাংসের দোকানের সামনে এলে আমার গায়ের লোম হুলো বেড়ালের মতো খাড়া হয়ে যায়। ও না, আজ ভয়ঙ্কর নিরামিষ আকাশ। একাদশী, অশ্লেষা বা মঘা নক্ষত্র চলেছে। বাড়ীতে মাংস আনলে কয়েক ঘা পড়বে শরীরে।... তাই হুলো ফিরে চলল শীতের একটা পুরুষ্টু মুলো মুখে পুরে। রোজ অঙ্ক কষি মনের ভেতরে, কোন ছিদ্র দিয়ে আড় মাছটা রান্নাঘরে **in** করানো যায়? আড়ি পাতি মায়ের মনের রসনাতে। বাড়ীর **alsatian** কুকুরটা বাজারের থলির দিকে হ্যাংলা চোখে তাকিয়ে থাকে। ডাক্তার বারণ করেছে কুকুরকে মাংস খাওয়াতে। দই, ছাতু, কলা খাওয়ালে নাকি ইতরপ্রাণী কেতাদুরস্ত হয়। তাই অন্য ব্যবস্থা করেছি। রবিবারে পাঁঠা আর মুরগীর ফটো কুকুরের খাবারের সামনে মেলে রাখি।

এছাড়া আর আমাকে কিসে মানায়? আমি অফিসজীবি মানুষ, হাপুস চোখে দপ্তরের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকি। ঐ চেয়ারটাই আমার জীবনের ভারসাম্য রাখবার তাকিয়া। তাই ব্রীফকেস হাতে অফিসপাড়ায় হারিয়ে যেতে আমাকে বেশ মানায়। আমার এই যাওয়া আসাতেই ভগবানের আনন্দ। পৃথিবী জুড়ে কত কী যে ঘটে যায় দিনের স্রোতে। আমি কেবলই দিনপাত করে চলেছি ডালহৌসী পাড়ায়। ডালহৌসী পর্বতমালা থেকে অনেক দূরে হন্যে হয়ে চলেছি আমি। যতদিন আমার মতো গাধার পিঠে সভ্যতার ভার চাপবে, ততদিন সংসারে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আমি বিশ্বকর্মার কলকব্জা, নাট-বল্টু। ইটের ওপর ইট চাপিয়ে আমরা ইমারত গড়ি ভাই। আমি চুন-সুড়কি। আমার পিঠে পিটিয়ে পিটিয়ে সর্বংসহা বসুন্ধরা **proxy** দিয়ে চলেছেন।—বুঝুন দেশের অবস্থা।

বিকেল গড়িয়ে গেল। সূর্যিমামা পাটে গেলেন। মনে মনেই ছবি আঁকি বর্ণালী রঙে। কতকাল যে সুর্যাস্ত দেখিনি মনেই পড়ে না। দপ্তর সেরে ভীড় ঠেলে পরাস্ত হয়ে বাড়ি এলাম। একটু অহংকার—এই আমার সাজানো বাগান। গিন্নী ফ্যাকাশে হাসি টেনে এক ফালি ভরাডুবি চাঁদের মতো বললেন,"ও তুমি এলে।" নেহাতই বস্তু-বাচক সম্ভাষণ, বড্ড সংক্ষিপ্ত। ক্ষিপ্ত হলেন বুঝি। তার পরেই কাজের ছুঁড়িটি বাড়িতে এল। গিন্নী সহাস্যে বললেন," এসেছ বুঝি, বাঁচালে আমাকে। " গলার স্বর টগবগে ঘোড়ার মতো চনমনে। মাথার ব্যথাটা সেরে গেছে। পূর্ণশশী মুখের গড়নটা তখন।

আমার কণ্ঠে "হুঁ" শব্দটি গৃহকোণে বড়ই মধুর শোনায়। অন্য কোনো শব্দ আমার গলায় হুঙ্কার শোনায়। অবিরত এক সুরে একতারাতে আমার জীবনবাউল প্রয়াগ যাত্রার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে ।

তবে আমি গল্পের পাখনাতে চেপে বসে বহুদূর যাতায়াত করি। বই আমার বন্ধু। চাঁদের শরীরে কোথায় কী খানাখন্দর তা আমার জানতে বাকি নেই। বইয়ের পাতায় পাতায় বন্দরে ভেড়াই আমার পরাণপাখি। লন্ডনে **Trafalgar square** এ সপ্তাহ খানেক আগে একটা ম্যানহোল খোলা পড়েছিল,আজও সেটা খোলাই আছে। আপনাদের সেই খবর নজরে পড়েছে কী? না,আপনাদের সময় কোথায় ? সকলেই বড্ড ব্যস্ত। আমি ভাঁটার জীব। আমি থাকি সকলের পথ চেয়ে। তোমাদের জীবন আমার চোখের সামনে আলো ছায়ার মায়া বিস্তার করে চলেছে। সকলের যাওয়া আসার কদম তাল আমার বুকে বাজে। তোমাদের মনের কথা আমি নীরবে শুনতে পাই, মুখোশের আড়ালে মুখগুলি চোখে পড়ে।

...বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা। পেয়ারী বাঈ এসে বেদানার রস ভরে দিল পেয়ালায়। স্বেচ্ছায় দুঃখের পেয়ালা ভরে নিলাম আমি কবিতার রঙে রাঙিয়ে। দীর্ঘ উপন্যাসের রসে ভরে নিলাম পেয়ারীর প্রেম। নিজেকে নির্যাতন না করলে মাইরী কবিতার বিলাস আসে না। পেয়ালা শূন্য হয়ে গেল। "শরাব লাও"। এবার পেয়ারীর গলার স্বরে মধু নয়,মদিরা ঝরে পড়ছে। রজনীগন্ধার সৌগন্ধ তার স্বপ্নবিজড়িত কণ্ঠের আমেজে। আঙুরের রস ঢেলে দিল পেয়ালায়। কত রঙে রঙীন তুমি তুলনা নেই। আমি শ্রীকান্ত, পেয়ারী রাজলক্ষ্মী। ওর হাতের লুচি, পায়েস খেয়ে কোলে মাথা রেখে ভ্যানভ্যান স্বরে আমার ভগ্নপ্রেমের ইতিহাস শোনালাম।

সবকয়টা বঙ্গললনার শরৎপিপাসা আমার জীবন-ইতিহাস বুকে চেপে ধরে চরিতার্থ হোক। বেশ একটা পরকীয়া চিকন প্রেম মনে গজিয়ে উঠছে। আমি খোয়াব দেখছি। আমি চিরকাল একটু ভাবুক, ভাবের অন্তঃপুরে আড়ি পাতি। অন্যের পাত থেকে লুকিয়ে চেটে খাওয়া অভ্যাস আমার.। তাই আমি শরৎচন্দ্র,জীবনানন্দ। কাল ভোরে বিছানায় শুয়ে দেখলাম, নিশীথিনী প্রিয়া, রূপকবাসিনী বনলতা সেন এসেছে। জীবন মাদলে উতলা ধরা, তার মধ্যিখানে অমৃতের প্রশান্ত সুরা-সাকী। কোল ঘেঁষে শুয়ে আছে। নরম গরম শরীরটা, আমার ধমনীতে রক্তিম তাল ঠুকছে। ধীরে ধীরে দিনের আলোয় মেজাজটা ফিকে হয়ে আসছে। চুপি চুপি বনলতাবে বললাম,"বন্যা,আর না, ফিরে যাও,আমার বাঁ পাশে গৃহিণী ঘুমিয়ে আছে। ধরা পড়ে গেলে জীবনটা আলকাতরা হয়ে যাবে যে!" বনলতার শরীর থেকে এক ঝলক আরণ্যক গন্ধ এল নাকে। মোহিনী মায়া ছড়াবার চেষ্টা করছে। ঠোঁটের ওপর একটা গরম নিঃশ্বাস আছড়ে পড়ল। প্রিয়ার ছায়া ঘনিয়ে আসছে আমার মুখের ওপরে। হঠাৎ একটা ঠান্ডা ভিজে ছোঁয়ায় ঘুম গেল ভেঙে। পোষা কুকুরটা ডান পাশে শুয়ে

আমাকে চেটে চলেছে। কষে মারলাম লাথি পেছনে। ত্রাহি ত্রাহি ডাক তুলে সারা বাড়ি আমার বিরুদ্ধে ঢাক পেটাতে শুরু করে দিল।

দেখলেন তো, জলসাঘরের মদালসা শিল্পী হতে পারলাম না। নিষ্ফলা জীবনটা এই অধমের। ত্রিফলা খেয়ে জীবনের সাধ আহ্লাদ বনবাসে পাঠাতে হবে।

আরে বাবা, না খেলে যে আসক্তিটা মহাশক্তি হয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু করে দেয়, খিদেটা বিছের মতো কামড় দিতে থাকে। এই কথাটা বোঝাই কাকে? ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছোটবেলায় বর্গীর মতো হানা দিত আমাকে। গ্রামের বাড়ীতে লণ্ঠন-সভ্যতায় ভাইবোনেরা মিলে ঠাকুর্দ্দার মিঠাইয়ের হাঁড়ি লুঠ করা হচ্ছে। হামা দিয়ে চলেছি আমরা ঠাকুর্দ্দার খাটের তলায় গুপ্তধনের সন্ধানে। ঠাকুমা মনে মনে দুর্গা নাম জপ করছেন। হঠাৎ একটা চামচিকে ঘরে ঢুকে পড়ে শিশুসাথী পঙ্গপালদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ঠার্কুদ্দার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। চিৎকার করছেন, "চোর, চোর। সিপাহী গুলি চালাও।" ঠাকুমা এবার দাদুকে দিলেন বকুনি, "তোমার কী ভীমরতি হয়েছে, নিজের নাকের ডাকে জেগে উঠে গ্রাম মাথায় তুলছ?" এই না বলে একটা সন্দেশ ঠার্কুদ্দার মুখে ঠুসে দিলেন। ঠার্কুদ্দা ঘুমিয়ে পড়লেন। আঁচলে ভরে মিষ্টি এনে আনন্দ বেঁটে দিলেন আমাদের সবাইকে।

সারা বাড়ী জুড়ে একটা বিশাল গণক্ষুধা রান্নাঘর,উঠান, সদরবাড়ী ছোটাছুটি করছে। ঠাকুর্দ্দা ছিলেন পিতামহ ব্রহ্মার সমান। ছোটদের জন্য খাওয়ার হুকুম দিলেন পটল দিয়ে শিঙীমাছের পাতলা নেতিয়ে পড়া ঝোল। কেউ যদি হাঁচল অথবা কাশল, তাহলে হুকুম জারি করে দিতেন গণ- উপোস, কিংবা সাগু ও বার্লি। বাড়ীর আমজনতার জন্য এই ছিল ব্যবস্থা। নিজের জন্য **menu-chart** আলাদা তৈরী হত। ঠাকুর্দ্দা অনিচ্ছার সুর টেনে বিরস মুখে বলতেন, "বৌমারা,আজ আর কিছুই খাবনা, নাতি নাতনীরা ভারী হ্যাংলা নজর দেয়।" বৌমারা কাকুতি মিনতি করল,গায়ে বাতাস করল। ব্রহ্মা এবার অতি কষ্টে থালায় তুলে নিলেন চিড়ের পোলাও, মোচার ঘন্ট, চিতল মাছের ঝাল। লুচি, পায়েস শেষ হল, অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করলেন সেদিন। একবাটি ঘি ধরা থাকত থালার পাশে। আমরা বিনা কারণে যাতায়াত করতাম আশপাশ দিয়ে। আমাদের মুখের চেহারাটা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমান। সেই দিনের ঘিয়ের গন্ধ মনে পড়লে আজও মনটা দ্বন্দ্বে হোঁচট্ খায়। আসলে গন্ধটাই তো জীবনের শেষ সম্বল। গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে জীবনে সন্ধে হয়ে গেল। কবজী ডুবিয়ে খেতে পেলাম কৈ?

...ঠাকুমা পল্লীগ্রামে চাঁদনী রাতে বাড়ীর উঠোন জুড়ে বাতাসার হরিলুঠ দিতেন। ভাই আর বোনেরা সবকয়টা বাতাসা লুঠ করে নিত। অক্টোপাসের মতো একশো হাতে। আমার হাত খালি। ফুটফুটে জোৎস্না। চাঁদমামা আমাকে দেখে মজার হাসি হাসছে। ঐ তো, উঠোনে রূপালী টাকার মতো চাঁদের আলোয় চকচক করছে

বাতাসা। ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম বাতাসার প্রত্যাশায়। ও না, পায়রার পালক। শূন্য হাতে বালককে দেখে ঠাকুমা বললেন,"কিছুই পেলিনা, চুমু খা।"

এই না বলে ঠাকুমা গীতা হাতে শুতে গেলেন। ঠাকুর্দা ঘরে বসে আত্মকথা লিখে চলেছেন, তিন খন্ডে অখন্ড জীবন উপন্যাস। কিন্তু আমার সাংসারিক বুদ্ধি হল না। বাবা বলতেন,"পুরুষসিংহ হও।" সুতরাং একদিন সিংহ গেল তার ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে ভর্তি করতে। ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে খালি হাতে। বাড়ী ফিরে গীতার পাতা ওল্টাচ্ছি-"কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলের অধিকার নেই।" ফলে কি পেলাম? গৃহিণী এসে কান ধরে ওঠাবসা করাল। "লেট বয়সে গীতা পড়ে কী বিরাট কাজটা করবে তুমি? বিয়ের আগে ভূত ভবিষ্যত ভেবে দেখনি কেন? তোমার অন্নপ্রাশণের আগে ছেলেটার অন্নের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।" বারবার গিন্নীর হাতে কানমলা খেয়ে ঘটনাটা কানাকানি হয়ে গেল। ছুটে গেলাম মাদার টেরেসার কাছে। মাদার আমাকে **gather** করলেন তাঁর বুকে। বললেন,"কান টানলে ভগবান কোলে টেনে নেন। **Humiliation directly leads to God** । এই বলে মাতৃস্নেহে আমার কান মলে দিলেন। সাধেই কি দেশের এই অবস্থা?

সুতরাং অনেক ঘুরপাক খেয়ে এসে ঠেকলাম এই কোণঠাসা ঘরে। মানুষেরা আমাকে এই ভাবেই দেখতে চায়। একটা বাউলিয়া উদাস চেহারা—একটা দেউলিয়া স্বভাব। সহজেই আমাকে লালন ফকির বানিয়ে কেটে পরা যেতে পারে, আমার ফ্যালফ্যালে অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে। আমি যে সাহিত্যের মুটে-মজদুর। অদৃষ্টের রসায়নে আমি জীবনরঙ্গের ব্যঙ্গকর্মী, নইলে গল্পের গোড়ায় রস জমবে কেন? আমি না ঠকে গেলে কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙবেন? আরে বাবা বেশ্যা নেই, কেচ্ছা নেই, গরিবী নেই- অত না না করলে শরৎবাবুর উপন্যাস বাবু সমাজে রেওয়াজ হবে কী করে? উঁচু মহল, নিচু মহল নেই, আমার মতো ইতর মানুষ নেই-এতটা শুচিবায়ুগ্রস্ত হলে মাইরী রান্নাঘরে গিয়ে শ্যালির হাতে রাঁধতে শেখ।

আপনাদের স্বাদ ফেরানোর জন্য একটা দুষ্টু কবিতা পড়ে শোনালে ভাল হোত। ভাল লাগেনা মাইরী। বাংলাভাষায় কব্জীর জোর নেই। '**For God sake, hold your tongue and let me love**।' ভারী রোমান্টিক মাইরী! কিন্তু সেকেলে ঠেকছে। বাক্সবন্দী ন্যাপথলিনের গন্ধ আসছে। "মোর এক বেণী হিয়া ছাড়ে মলিন কাঁথা।" হোলনা, বেলুন চুপসে গেল পুরানো কাঁথা সেলাই দিয়ে কতদিন চলবে? কবিতায় তাগদ আনতে হবে। বুক চিতিয়ে দাঁড়াও, থুতনি ওপরদিকে তুলে দাও। বলো—

"Love.
Her tall head in spring's ambitious attire,
Sings her long notes. unslept in time.
For a final meeting in the twilight kingdom
My flute is breathless ".

" আজি গোধূলি লগনে এই বাদলগগণে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারা বেলা।"

মন্দ নয়। কিন্তু ইংরেজীটা কোত্থেকে পেলে ? চোরাই মাল না তো ? রসের ঘরে সূক্ষ্ম হাত সাফাইয়ের কাজে স্বয়ং কবিগুরু বাজিমাত করেছিলেন। আমি কোন ছার। মিথ্যে সন্দেহ করে মেজাজ নষ্ট করো না। আবার ভাষা দাও—

"A deep kiss pours upon the lips,
takes as much as this very earth can give,
my loved one,
take me, spare me, destroy me,
my tormentor,
one such kiss gives twenty lives,
your arms gather all seasons in one."

জীবনের যতটুকু ঘাটতি কবিতা লিখে উশুল করে নাও। তোমার লেখার কাটতি নাইবা থাক। বর্তমান্ কালের একটা **scandle** এই যে, আমাকে কেউ চিনতে পারল না। আমি হব **posthumous** দুর্ধষ্য কবি। **Shape of things to come**। আগামি কালের প্রয়োজনে আমি ইতিহাসের লাগাম ধরে আছি। আজ তোমরা কলা দেখাও, কিন্তু তোমাদের দিন ঘনিয়ে আসছে। আমি জার্মান, **Goering, Hitler,** আমি শক-হূন দল, পাঠান-মোগল। আমি পাগল-সুন্দর। (বাবা আমাকে বলতেন চাষা-সুন্দর।)

আজ জীবনের ঘোর অমাবস্যা। গ্রামের আঁধার আকাশ মনে পড়ে। নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্পূর্ণ ম্যাপটা আলোর চাঁদোয়া হয়ে ঝুলে আছে। দেখতে পাচ্ছি। **Anthem of the stars**। **Sky- gazing**। বাড়ির ছাদে মাদুরের বিছানায় আদুরে শয্যায় শুয়ে গগনবিলাস হচ্ছে। আমি নভোচর, তোমাদের কেউ নই। আমি **self-companionated** । পৃথিবীর দুঃখ সুখ আমার লেশ মাত্র নেই। গ্রামের পথের নিশানা আপন চিহ্ন মুছে ফেলেছে। আমি এখন গ্রামের কোল

ঘেঁষে ছবির আলপনা আঁকছি না, বাক্যের নক্সা, গল্পের গৃহকোণ, জীবনের সরাইখানা— যুক্তি, তর্ক, গল্প সব বোকা হয়ে পেছনে রয়ে গেল। শুধু দুটি চোখ উদ্ভাসিত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অনন্ত আকাশে। **Wide-eyed voyager**। মুখটা হাট খোলার মতো হাঁ করে আছে। কণ্ঠনালী ওঠ্ বোস করে চলেছে। "কালো মায়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন।" অজান্তে কালী দর্শন দিচ্ছে আমাকে। দর্শনের বইতে যাকে কোন দিন বুঝতে পারলাম না, সেই স্বাতী নক্ষত্র আমার ছেলেবেলায় সেই লুকানো মন্ত্র দিয়ে গেল। সেই দিন থেকে আমার মেজাজটা নক্ষত্রের সমান ক্ষত্রিয়ের মতো। আমি যে দেখেছি তাকে সাদা চোখে ছোটো বয়সে,—অনায়াস পরিশ্রমে। দীর্ঘ বয়সের আড়ালে যতই তাকে লুকিয়ে রাখো,—ভুলব কী করে সেই কথা?

দুই

(সমালোচক) কিন্তু হারাধন, এতক্ষণ নিজের কথাই দর্শকের কানে গুঁজে দিলে। বুঝলাম, তোমার দর্শকের সহানুভূতি হরণ করার চাতুরী। ছেলেবেলায় ছিলে বিশ্ব বখাটে, এখন পাকা বুদ্ধি হয়েছে। ভেক পাল্টে হয়েছ বিশ্বকাঁদুনে। কিন্তু নিজের সংসারটাকে যে সংহার করলে! একবার অন্যের দিকটা একটু টেনে বলো। তোমাকে চেনা লাগছে না ? ছোট বেলায় তোমার নাম ছিল গুপে। চুপিসাড়ে ফ্যাস ফ্যাস স্বরে এক চোখ বুজে কথা বলতে, অর্ধেকটা বাণী পেটে লুকিয়ে রাখতে। যেন কোন ষড়যন্ত্রে তা দিচ্ছ। অথচ তোমার মুখটা দেখ— ছাই মাখা নাগা সন্ন্যাসীদের মতো ছাইচাপা আগুন। তোমার একক সংলাপকাব্য শেষ হয়েছে। দর্শকেরা কাবু হয়ে গিরীশ মঞ্চ থেকে ফিরে গেছে—এতক্ষণে ট্রামে, বাসে হাবুডুবু খাচ্ছে। এইবার তোমাকে গ্রীনরুমে অবরোধ করেছি। রঙ চঙ মুছে ফেলে তোমাকে কেমন দেখায়? সত্যি জাঁহাপনা, এক হাতে তালি বাজে না। তোমার দুঃখের জন্য সমাজটা একেবারে এক হাতেই দায়ী ? নিজের করকমল কী গঙ্গাজলে ধোয়া? এতক্ষণ যে দর্শকের ধৈর্যের সামনে কাশফুলের মতো নিজেকে মেলে ধরলে, আড়ালে তোমার আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধুরা তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি? বাড়িতে বসে চর্বচোষ্য লেহ্য-পেয় আত্মসাৎ করে চলেছ চার বেলা, উপোষ দেওনি কোনদিন। ছিপ ফেলে রেখেছ রান্নাঘরে। তোমার চেহারা দিনদিন খোলতাই হচ্ছে। অথচ মায়ের পেট থেকে পড়ে চেহারাটা ছিল হাঘরে ক্যাকলাসের মতো। পেয়েছ যতখানি, দিয়েছ তার কতটুকু? বাক্যের তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে জীবনে আয়েস করে গেলে। আমি কে? তোমার সমালোচক, তোমার গল্পের নটেগাছটি আমি মুড়িয়ে দেব। আমি তোমার ঘরের বাসিন্দা—

তোমার প্রজন্মের মানুষ।

একী? তুমি চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসে পড়লে যে ! নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে বুঝি? শ্বাস পাচ্ছ না, চোখ উল্টে যাচ্ছে। তুলসী তলায় নিয়ে যাওয়ার সন্ধ্যা হয়ে গেল তোমার জীবনে ? গঙ্গাজল ছিটোই তোমার গায়ে। তোমায় দুটে রসগোল্লা দিই, ঠিক গলা দিয়ে গলে যাবে। নবযৌবনা বর্ষার মতো তোমার প্রাণে জীবন সঞ্চার করবে। বড্ড আয়েসী প্রাণ তোমার। কে বলে যাই যাই, আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।' তোমার আশা করি আর যাওয়া হলনা। অন্তত আমাদের বয়স কালে।

(আমি) এতদিন কেটে গেল। তোমাকে মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, ভাই বোন, অফিসের সহকর্মীর নামে ডেকে এসেছি। আজ হঠাৎ আমাকে বেওয়ারীশ করতে চাও কেন? আমার ফেরার রাস্তা রাখতে চাও না ? বেয়ারীং চিঠিতে আমাকে দশ হাতে ঘুরিয়ে আনতে চাইছ। তোমার চোখের আগুনে গণধোলাইয়ের সাধ আমার দিকে জামাই আদরে তাকাচ্ছে। একটু সবুর কর। একটা বিড়ি ধরাই। রাধা বিড়ি কিম্বা সতী বিড়ি। তামাকে একটান দিলেই সটান বৈষ্ণবদের আড্ডায় কল্কে পেয়ে যাবে। তখন তোমার লেখার মালমশলা অনেক পাবে। তোমার কোন দোষ নেই, সেটাই তোমার মারাত্মক দোষ। দোষে গুণে মানুষ আমি। আমার সুবুদ্ধি যদি চাও, আমার দুর্বুদ্ধিটাও সহ্য করতে হবে। আমরা সকলে বর্ণসঙ্কর। **Reformation** আনতে চাইছ। আগুনকে বাদ দিয়ে ছাই পাবে কোথায়?

এদিকে তুমি আমার মুখের কথা সব টুকে যাচ্ছ। কিন্তু সাবধান। আমি নিজেই বিস্তর টোকাটুকি করে মঞ্চে টিঁকে আছি। তুমি এসেছ সমালোচনার রাস্তা ধরে,আমি চলেছি পলায়নের রাস্তায়। **Criticism is old as prostitution** । অতি প্রাচীন পেশা। তবে সমালোচক যদি মায়ের দুধ খেয়ে থাকে, তাহলে নিজের কথাও লিখবে। তুমি ও আমি কাব্যের সতীন। আমার জীবনের গায়ে সমালোচকের খড়ির গণ্ডি টানতে চাও। মানুষের অশেষ যাত্রাপথে টিপ্পনী কেটে চলেছ। স্বয়ং ভগবান সঠিক বিচার করে জীবনের জটিল সমীকরণের মীমাংসা করতে পারেনা। মহাভারতের যুদ্ধ হয়ে গেল, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডব শান্তি পেল কী? মহাপ্রস্থানের কথা পড়ে দেখ। যে সীতাহরণ অবলম্বন করে রামায়ণ লেখা হল, সেই সীতা পাতালে গেলেন কার বিচারে? মর্য্যাদাপুরুষ রামের বিচারে— সমাজনিন্দার ভয়ে। মানুষকে এত জঘন্য অবমাননা বন্দিনী সীতাকে ঘিরে রাক্ষসরাও করেনি। তোমাদের আন্দোলন কী বলে? আসলে কিছুই বলেনা। কারণ **Brutus is an honourable man**। রাম কখন অন্যায় করলেও সেই কাজটা নিপাতনে সিদ্ধ। আরও কত কী জানতে চাও আমার সওয়াল জবাব ? এত কেন খুঁড়তে চাও আমাকে? বুঝেছি, আমারই আয়নায় নিজেকে চিনে

নেবে। আমাকে এই চেনা তোমার ফুরাবে না। বলি শোন, ঠিকমতো টুকে যাও, নারীপ্রগতির উদার জানালায় আমি ভেংচী কাটি। পরিহাসের মালা পরিয়েছিলাম দর্শকের গলায়। যে রসে প্রেম মজাইলে, সেই রসে ভাঁড় সাজাইলে। আমার ঘাড়ে মাথা একটাই, কিন্তু মুখোশ অনেকগুলো। এরই আড়ালে আমি খোশমেজাজে থাকি।

(সমালোচক) বদহজমের অম্লরস তোমার কাহিনীর রসায়নে কাজ করে চলেছে। আজকাল আকাশ ছাওয়া **femininism** এর হাওয়া। স্ত্রী জাতি এখন স্বাধীন আত্মনির্ভর, তুমি পৌরুষের দখলদারী নিতে যেওনা, কারণ তুমি বর্বর। স্বয়ং শ্রী রামকৃষ্ণ অচল হয়ে গেছেন আধুনিক বুদ্ধির সামনে। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন। ওনার চরিত্রে গোড়ার দোষ ছিল। মেয়েমানুষ দেখলেই চেলাদের ধমক দিতেন কামিনী ত্যাগ করো, নতুবা মা জননী ডাকে পূজো করো। হয় সে বেশ্যা, নয় সে মা। এদিকে মায়ের কোলে হামা দিচ্ছ, ওদিকে ঘোর কেটে গেলেই সাচ্চা সাধুর মতো শালা, ইত্যাদি বাক্য বিতরণ করে চলেছ। সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চলচিত্র দেখেছ? দেবীভক্ত জমিদারের স্বৈরাচারীতায় বধূর কী কঠিন পরিণাম হয়েছিল?

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী: এই সেই অধরা, অনূঢ়া মেয়ে। সাঁঝের বেলায় তুলসীতলায় সে প্রদীপ জ্বালায় না। লজ্জা অবনত চোখে, কম্পিত বুকে মৃদু চরণে বাসরশয্যায় আজকের মেয়ে ভবিষ্যতে আসবেনা। কারণ সে পূর্ণশশীর মতো অবগুণ্ঠনহীন। দূর আকাশে সে মহাবিশ্বের স্বপ্ন-কামনায় বিভোর। পুরুষ কী বুঝবে স্ত্রীর কথা ? প্রাণ বোঝে প্রাণের ব্যথা।

(আমি) অন্ধজনে দেহ আলো। আমার ডাক পড়লনা তোমাদের সভায়। আমি আসলে কাজের কাজী নই। আমি নকল পাজী। আমার চোখে একবার গ্লিসারিন লাগিয়ে দাও তো, একটু আঁশু ঝরিয়ে দিই। কিন্তু এটা তো বেজায় অন্যায়। আমার মুখোশ খুলে দিতে চাও,কপাটহীন নিলাজ আত্মসমর্পণে। আমাব জিনের বিরুদ্ধে তোমার যুগ-যন্ত্রণা। তুমি সমালোচকের খাঁচায় চাঁদের কিরণকে গুটিয়ে নিতে পারবে? কিংবা দখিনা বাতাসকে জবাবদিহি করা যায় কী ? আমার জীবন সতত সঞ্চারী - পলাতকা ঘুড়ির মতোই চলন্তিকা। মানুষের এই পথিক ইতিহাস। আমি যাযাবর। হাজার বছর ধরে আমি পথ হেঁটে চলেছি পৃথিবীর বুকে। **Rash Behari Avenue** - তে ট্রামলাইনের পাশে সবুজ ঘাসের বুকে হেঁটে চলেছি। আমি জীবনানন্দ। **Southern Avenue** তে এক মহীরুহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ছায়ার দিকে চুপটি করে মহাকালের চিন্তায় বিভোর। রাত নেই-ভোর নেই, বড্ড একা সে। সময়ই আমাকে হরণ করবে। তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে না।

ছাত্র জীবনে **St.Xaviers** কলেজে পড়েছি। রবিবার কলেজের পাশে চার্চে

mass prayer হচ্ছে, ফাদার এক হাঙ্গেরীয়ান পাদ্রী। বাইবেল পড়ছেন, "যীশু, তোমাকে যে হারাইয়াছে, সে সকলকে হারাইয়াছে।" কিন্তু ফাদারের 'র' উচ্চারণ ফেল মেরে 'গ' হয়ে যায়। ফাদার বলে চলেছেন "যীশু, তোমাকে যে হাগাইয়াছে, সে সকলকে হাগাইয়াছে।" তিন বার পাঠ হলো। ছাত্ররা পেটে হাত চেপে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। পাগলের মতো মাথা চাপড়াচ্ছে। আমি পাথরের সিঁড়িতে বসে পড়েছিলাম। আমার দিকে ফাদারের ব্রহ্মতেজ ফেটে পড়ল। " তুমি যীশুকে পাইবে না। যীশুকে হাগাইবে, সকলকেই হাগাইবে। " ঐ সেই দিন থেকে এক প্রচণ্ড শক্তি জোলাপ হাতে নিয়ে সমাজের সকলকে মুক্তকচ্ছ করে ছুটিয়ে চলেছি আমি।

(সমালোচক) পিছে কা বাত ছোড়ো। হালে তুমি কী করবে বল। তুমি ইতিহাসের গেরো পাকিয়ে ফেলেছ। তোমার ভবিষ্যত **programme** টা কী ? আভি তেরা কেয়া হোগা কালিয়া? হাসো, অউরভি হাসাও। গোলি খাও।

(কয়েকবার কামানের আওয়াজ। বন্দরের জাহাজে সাইরেন বাজবে। গির্জার ঘণ্টায় রাত বারোটা বাজবে।)

(আমি) ঐ শোনো, বলি শোনো নতুন মিলেনিয়াম এসেছে। আমার জীবনে জট ছাড়ানোর আগেই ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গেল। বড় লেট করে ফেলেছি সব কাজে। যোগ বিয়োগের অঙ্ক এখনও কষে উঠতে পারিনি। এই দেখ আমার হিসাব-কিতাব। জীবনের চড়াই, উৎরাই লিখে রেখেছি এই ডায়েরিতে। যাঃ শালা, এর ভেতরে ধোপার হিসেব, মুদির হিসেব লিখে বসেছি। না এটা আমার ধর্মের খাতা, তোমার মতো বিধর্মীর হাতে দেবনা। আমার অর্থের বড় টানাটানি। শার্ট আছে তো প্যান্ট নেই। পাঞ্জাবী আছে তো লুঙি নেই। অর্ধাঙ্গিনীর শাড়ি জড়িয়ে আমার লজ্জা নিবারণ করছি। আগাপাছা আমার পুরো ডায়রি কৌপিন বস্ত্রে মোড়া। পিঁপড়ের মতো চিনির দানা মুখে তুলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে রেশনের দোকান থেকে জীবনে এগিয়ে চলেছি। স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে।

একটুখানি সবুর করো। সংসারের নিয়মে সমাজে একটা নামভূমিকা পেয়েছিলাম। জীবন সতরঞ্চের ঘুঁটির চালে আমি সংসারের উঁই পোকা। জীবনের উল্টো পুরাণ লিখি। তুমি আমার এজেন্ডা জিজ্ঞেস করলে। ভয়ংকর কঠিন প্রশ্ন। **'Send not to know for whom the bell tolls, it tolls for thee**।' আমার দক্ষিণ হাত তোমার দিকে প্রসারিত। তোমার মুখ উল্টোদিকে ঘোরানো। নাটকীয় ঢঙে প্রত্যাখ্যান করছ আমাকে। দূর আকাশের রঙের দিকে চেয়ে আছ। সেই দিকে তোমার হাতের ইঙ্গিত। প্রশান্ত গভীর মহাকালের সঙ্গীত বেজে উঠছে সেই দিকে। গোধুলির আলো তোমার মুখে পড়ে জীবনের কলস ভরে দিচ্ছে। যেখানে তোমার চোখের নজরের তীর গিয়ে পড়েছে , সেখানে সবুজের শ্যামলিমা। তোমার জীবনে

পালের হাওয়া লেগেছে। একই ভুবনে দাঁড়িয়ে আমি। আমার পালে হাওয়া বন্ধ। আমার চাওয়া তোমাকে পালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার চাওয়া তোমাকে ঠেলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে আপন বন্দরে। চিনেছ তুমি নিজেকে।

ওঁয়া ওঁয়া ডাকে আঁতুড় ঘরে ফিরে চললাম মায়ের জঠরে। সামনে একটা ফটো—মায়ের যৌবনের। মাতৃস্নেহের জোয়ার লেগেছে তাঁর হাসিতে। রজনীগন্ধার গন্ধ অনেকবছর পরে স্মরণে এসে তরী ঠেকাচ্ছে। আজকাল ফুলে গন্ধ হয় না।...

প্রবাসে পূজার নাটক

এক

দুর্গাপূজার গোটা উৎসবটাই এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ নাটক। পূজার সর্বাঙ্গীন নাটকীয়তা ছাড়াও, নাটকের মঞ্চও পূজাপ্রাঙ্গনে ঢুকে পড়ে। কোন কিছুই বাদ বা অভাব রাখতে চাই না আমরা এই সময়টা। দুর্গাকে আমরা ঐশ্বর্যময়ী মা কল্পনা করি, তাই এটুকু অধিক বাড়াবাড়ির চোঁয়া ঢেকুর না উঠলে কেমন যেন ভাল্ লাগেনা। বেশ কয়েক বছর আমি দিল্লীর লোদী রোড আর চিত্তরঞ্জন পার্কে কাটিয়েছি। পূজার একরকম সর্ব অস্তিত্ব কাঁপানো জ্বর বা মাদকতা আছে, যা চটাং করে ব্রহ্মতালু আক্রান্ত করে উত্তপ্ত ক'রে তোলে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এই সংক্রামক রোগের প্রকোপ বেশ খানিকটা আছে। ইংরেজ শাসনের আমলে একটা প্রচলিত কথা ছিল, '**If London freezes, Calcutta sneezes**।" সেই রকম কলকাতার ময়দানে ফুটবল লীগের খেলা চলেছে , ওদিকে চিত্তরঞ্জন পার্কে "বৌদির দোকানে" বসে পাঁজর ভাঙ্গা চেয়ার আর ত্রিভঙ্গ টেবিলে চায়ের কাপে ঝড় উঠেছে বাঙালি যুবকদের মধ্যে। খেলার ধারাবিবরণী মুখস্ত পাঠ করা হচ্ছে, — বল থেকে পায়ে, পা থেকে সারা মাঠ জুড়ে বাইশজোড়া লড়াকু বুটজুতোর সচল ভাষ্য বিবৃতিতে মালা গাঁথা হচ্ছে। তাই কলকাতা আছে চিত্তরঞ্জন পার্কেই।

সেখানকার মাছের বাজার লক্ষ্য করুন। বর্ষীয়সি বাঙালী গৃহিণী স্থূল শরীর নিয়ে ঘটা ক'রে ঘোষণা করছেন, " দেখ বাপু আমরা বংশ পরিচয়ে রুই-কাৎলা, চুনো-পুঁটি নই। জামাইবাবাজি আসছে পূজোতে। প্রমাণ সাইজের মাছের মুড়ো খাওয়াব, নইলে তোমার আমার মুরুব্বীয়ানাটা থাকে কোথায় ? বলতে হবে, আমার মাথা খাও বাছা, মুড়োটা ফেলে রাখা চলবে না। " এক বাঙ্গালী ভদ্র-সন্তান বাজারে সেলুলার ফোনে তার কন্যা রত্নের সঙ্গে কথা বলছে, " পাপিয়া, তুমি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে জামাইসহ এসেছ, কিন্তু আজ বাজারে ইলিশমাছ ভাল ওঠেনি, বড় দুঃখের কথা।" এক দিন দিল্লির অন্য পাড়ার প্রতিবেশী আমাকে বললেন, "আপনি বুঝি চিত্তরঞ্জন পার্কে থাকেন, তবে তো মাছে ভাতে আছেন মশাই। বাঙ্গালী পরজন্মে স্বয়ং মাছ হয়ে জন্মাবে, আর এক বঙ্গসন্তান তাকে রান্না ক'রে খাবে।" শুনে বড় রাগ হ'ল। দিল্লির কস্মোপলিটান দিগন্তে বাঙ্গালীর তল পেটে আঘাত? প্রবাসী বাঙ্গালীর

নিজস্বতা বলতে অবশিষ্ট আছে কী ? মাৎসন্যায়, মৎসের প্রতি ন্যায় অন্যায় বিচার করা ছাড়া। আরে বাবা খোল নোলচে সবটাইতো পাল্টে ফেলেছি, ধরে রেখেছি সেন্টিমেন্ট টুকু। তাই শুভ্র সকালবেলা চিত্তরঞ্জন পার্কে বাজার ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙ্গে জেগে উঠছে। শরতের নির্মল আকাশ, পূজোর মরশুম আসছে। আশ্বিনের শিরশিরে ভাব বাতাসে, আগের রাতের মাছের বাসী গন্ধ বাজারের বাতাস আমোদিত করছে। মাছি আর মাছ। সেই সঙ্গে ক্যাসেটের দোকানে মাইকে গান বাজছে, " আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্ব ভরা প্রাণ।" কিংবা " বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি "। পচা মাছের ভূতি, মাছি আর রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই তিনের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণে এক সুসম্পূর্ণ বেঙ্গলী প্যাকেজ। সপ্তাহান্তে এই দিককার হাওয়া গায়ে লাগাতে পারলে প্রবাসের মালিন্য খানিকটা কাটিয়ে ওঠা যায়।



দুই

দিল্লীতে দেড়শোর বেশী দুর্গাপূজা হয়। সব চাইতে পুরাতন আজমিরী গেটের পূজা। লোদী রোডের সরকারি আবাসনেও পূজা হয় অবাঙ্গালীদের চোখ টাটিয়ে। পূজার এক মাস আগের থেকে বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের মধ্যে যাতায়াত, আনাগোনা বেড়ে যায়। প্রকাশ্যে এমন একটা প্রস্তুতির পালা চলে যেখানে সকলে একরকম নির্লিপ্ত নিমরাজি হাবভাব দেখানোর রেওয়াজ আছে। নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে মায়ের পূজোর কাজে এগিয়ে এসেছি আমরা। "নাম-ভূমিকা অথবা পদমর্যাদার দরকার কী দাদা ? আমার নৈতিক সমর্থন কর্তাব্যক্তিদের জন্য রইল। যেমন বলবেন খেটে দেব। কী বললেন, পূজো কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি হতে হবে ? আমার

চাইতে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন। আমাকে লজ্জা দেবেন না ভাই। পূজোর বিজ্ঞাপন দিতে হবে কী? তাই বুঝি আমার পেছনে এত ঝুলোঝুলি, আমার কাছা আপনি হাতে ধরে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছেন, আমাকে কেতার্থ করছেন? অনেকদিন পরে পরপারের ফিলজফী আলেচনা করতে চাইছেন আমার সঙ্গে, যেন আমার বন্দরে নোঙর ফেলবার একটা জরুরী প্রয়োজন আছে। আমার দিকে চোখ পড়লেই বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ বোধ করেন কী? বিজ্ঞজনকে আপন করার এই সদিচ্ছা আপনার আগের বৎসর আশ্বীন মাসেও লক্ষ্য করেছিলাম ভাই। অন্যান্য ঋতুতে আমার দিকে আপনার নজর পিচ্ছিল ভঙ্গীতে অন্য দিকে ঠিকরে যায়।".... এমন সময় পাশ দিয়ে কে যেন এড়িয়ে গেলেন নয়নাভিরাম বঙ্কিম গতিতে। "ভট্টাচার্য বৌদি বুঝি। পূজোর ভোগরান্না ফী বছর আপনার হাতে বরাদ্দ থাকে। এবারও আমার মত পাপিষ্টদের ভোগ খাইয়ে ভুক্তভোগী করবেন অন্নপূর্ণা বৌদি।"

প্রথমদিকে আমরা গররাজি, নিমরাজি, শেষে আরেকবার বললেই বারোয়ারী পূজোর গণ নেতা হওয়ার টোপ গিলে ফেলি। তারপর সারা পুজোটা গণধোলাইয়ের জামাই হয়ে দগ্ধ হই। স্বামী-স্ত্রী যুগলবন্দি হয়ে ঝাঁপ দেবে পুজোতে, হয়ে উঠবে উদীয়মান নেতা। বাড়ীতে বাড়ীতে, পরিবারে পরিবারে উষ্ণ করমর্দন; কার হেঁশেলে কার স্ত্রী রান্না করল, কেই বা খেয়ে এল ঠিক নেই। বারোয়ারী বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে অনেকে। মধ্যবর্তিকালে পরস্পর ভরণপোষণের দায়িত্ব খানিকটা হাল্কা হয়ে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। পূজোকমিটি তৈরী করা হল অনেক জল্পনা- কল্পনা, মান- অভিমানের পালা মান্য করে। মানানসই সগবস্থানের এক মার্জিত নাম সূচী তৈরী হলো। কিন্তু শ্রীমতিদের মনের গভীরে একটা অন্যধরণের যুগযন্ত্রণা ভাবে ও ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেতে থাকল। একে তো নারী প্রগতির যুগ। তার ওপর স্বয়ং দুর্গার আরাধনা। হাওয়াটাই মাতৃতান্ত্রিক। স্বয়ং শিব টঙে উঠেছেন, দেওয়ালছবি হয়ে দুর্গার চালচিত্রে টিকটিকির মতই লটকে আছেন নিরীহ গৃহপোষ্য চেহারায়। অসুর পুরুষের শৌর্য নিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে, কিন্তু ভক্তদের কাছে কল্কে পাচ্ছে না। কার্তিক স্বর্গের সেলুনে ম্যনিকিউর করে রণং দেহী রূপে পূজো নিতে এসেছে। সে রমণীদের রমণদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ভঙ্গীতে পৌরুষ ত্যাগ করেছে। সুতরাং পাড়ার শ্রীমতিদের অভিপ্রায় পূজার কাণ্ডারী তারাই হবে। "পূজা সংক্রান্ত যত অফিসপাড়ার কাজ, বাজার, হাঁটাহাঁটি, লাঠালাঠি, দরাদরি সব দাদারা করবেন। দিদিদের কাজ পরিচালনা করা, অর্থাৎ ফরমায়েশ করা। এক কথায় আমরা বাঁশি বাজিয়ে সাপ খেলাব। দিনকাল বদলে গেছে। শ্যামের বাঁশী বর্তমানে রাধিকারা হস্তগত করেছে।" - প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিল তারা। প্রচার হয়ে গেল আধুনিকারাই এবার পূজোর জট পাকাবে, বাকি সকলে সেই জট ছাড়িয়ে সংসারের বেড়া মেরামত করবেন। এক উদীয়মান ছোঁড়া মন্তব্য করল, "বৌদি,

দূর্গা প্রতিমা তবে সুইট সিক্সটীন দেখতে হওয়া চাই।"

তিন

এইভাবে পূজোর উদ্যোগপর্ব বামাদের হাতে চলে গেল। বামরা উৎসবের সর্বস্বস্ত করায়ত্ব ক'রে পুরুষদের রেসের ঘোড়ার মত ছোটাতে শুরু করল। চক্রবর্তী মশাই ঝোঁকের মাথায় সবার আগে ছুটতে লাগলেন পূজাপ্রাঙ্গণে। সব দায়িত্বের কঠিন কাজে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরা দিলেন। শেষের দিকে শরবিদ্ধ হয়ে ভীষ্মের মত শরশয্যায় ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। চক্রবর্তী গৃহিনী কল্যাণী হাসি বিলিয়ে চলেছেন সবার মধ্যে। তবে তারই ফাঁকে নজর রাখছেন কোন কোন ঘোড়া পূজা প্রাঙ্গনে ছুটে চলেছে। চক্রবর্তী গৃহিনী (ললিতা বৌদি) কালচারাল সেক্রেটারি। বরেরা সাধারণ ভাবে বর্বররূপে পূজোর সময়টা দূরে রইল, কারণ তাদের কাজ বাইরে পূজার ম্যারাথন দৌরে। এদিকে মহিলারা দূরকে করল নিকট বন্ধু। অর্থাৎ বাছাই করা পুরুষরা—যারা উৎসবের নান্দনিক কাজে শোভা পায়, অথচ কঠোর কাজে ব্যাথা পায়—তাদের সাংস্কৃতিক স্নেহবেষ্ঠনে আপন করে নিল। এবার পূজোর নাটক চয়ন করার পালা। "এবার দিদি একটা ক্যাডাভেরাস ব্যাপার করে ছাড়ব। নাটক হবে 'নরক গুলজার'। কলকাতায় দেখে এসেছি। বেশ নটঘট ব্যাপার।" কাঞ্জীলাল কেশে কলপ লাগিয়ে পেশ করলেন। ললিতা বৌদির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটা চোখের ইশারা প্রজাপতির মতো ডানা মেলে উড়ে গেল নাটকের কুশীলবদের বৃন্দাবনে। নট ও নটীরা চটি হাতে তুলে চটপট জবাব দিল "জবাব নেই।" চটপট চটি হাতে তোলা নাকি এ পাড়ার নাটকীয় সাম্যনীতি। এখানে চটে ওঠার বৈষম্যনীতির সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য থাকলেও, মৌলিক কোন মিল নেই। সাংস্কৃতিক কৌলিন্যটুকুই অর্থবোধক রূপে গ্রাহ্য করা হয়। মিসেস বক্সী আছে, যার সেলুনে কাটা চুলের ছাঁদ অদ্ভুত, না ছেলে না মেয়ের বর্ণসঙ্কর। সে হাওয়া উছলিয়ে দিয়ে বললে "অথার ব্যাকিং ভূমিকা চাই আমার।" ওনার মনের সাকিন দেব বন্ধুরা সায় দিল, " অবশ্যই , নইলে, নরকগুলজার জমবে কেন?"

আমি সদ্য এ পাড়ায় এসেছি কলকাতা থেকে। পরিবার এখনও এসে পড়েনি—তাগিদ নেই বোধহয় আমাকে ফেরার করে আবার ফিরে পাওয়ার। বড়ই বিপর্যস্ত আছি হনুমানের উৎপাতে। সেদিন ছুটির দিনে আমার মনের সুর ভৈরব রাগিণী ভেঁজে চলেছিল। ভাঙনের এক উদাস বিবাগী বেহাগ মনের একতারাতে কেবলই ভাঙা রেকর্ডের মতো নিবৃত্তির এক অক্ষিদে জাগিয়ে তুলছিল। অনেক বেলায় বিছানায় পেটের তাগিদ জানান দিল। ছুটলাম বাজারে। নদী সমুদ্রে মেশে, সব বাঙালি জাতিয়তার পতাকায় মাছের দোকানে গিয়ে ঠেলাঠেলি করে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে

মৎস-চর্চাতে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে। ললিতা বৌদি আমাকে আপাদমস্তক দৃষ্টি দিয়ে আমার প্রবীণ শরীরে নবীন লহরী তুললেন। হয়তো স্থির করলেন, "এই মাছ ভাজতে তেল খরচ কম হবে, চোখের নজরেই নিজের ভার্যাকে ভুলে যাবে। " কুহু কুহুস্বরে আমাকে বলল, "বড় বিপদে পড়েছি, একবার আমার বাড়িতে আসবেন কী ?" এযাবৎ জানা ছিল আমি গেলেই বিপদ আসে সঙ্গে। থমকে দাঁড়াতে হল। "তবে কী অথ হনুমান সংবাদ ?"

হনুমান অনুমান করেই ওনার বাড়িতে উপস্থিত হলাম কনে দেখা গোধুলির আলোয়। দোরগোড়ায় সংখ্যাধিক চটি ও জুতো নোঙর বেধেছে। সরল মনে অনুমান করলাম যে, হনুমান তাড়াতে বহু চপেটাঘাত করার প্রয়োজন। এক জোড়া ভারী বুট দোরের কাছ থেকে হাতে তুলে কলিং বেল টিপলাম। চটি হাতে নিজের দণ্ডিত চেহারায় ভারী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। ললিতা চক্রবর্তী তারিফ করে বললে, "এই বেশ মানানসই হয়েছে। চটি হাতে তোলাই আমাদের সাংস্কৃতিক সাম্যনীতি। ক্রমশঃই দরকার পড়বে আপনার। " কথার সরাসরি মানেটা মগজে হুড়োহুড়ি করে এলনা। হনুমানের সঙ্গে সহাবস্থানের একটা সহনীয় ইঙ্গিতের সূত্র ধরিয়ে দিল কী? কিন্তু ঘরের ভেতর একটা চাঁদ সওদাগরী পাল তোলা হাওয়া। ভুলিব ভাবনা, পেছনে চাবনা গোছের বেপরোয়া সংলাপ চলেছে। উচ্ছল আলাপ আলোচনা, চাঁদের আলো স্বপ্নাবিষ্ট পরিবেশ। পিয়ানোর টুংটাং ঝংকারের মতো কথাবার্তা চলেছে। আমি এসে পড়ায় কথার সুর, তাল ও লয়ের ঐক্য ভঙ্গ হল। এক ভদ্রলোক ধ্যানভঙ্গ এক-চক্ষু তক্ষক দৃষ্টি দিয়ে বলে উঠল "ললিতে, এ যেন আবার কে? অ, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে এলেন বুঝি, মানে মিসিঙ লিঙ্ক?" আমার সম্বল বড় কম। তাই আমি ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সকলকে বিনয় বন্টন করলাম, ফ্যাকাসে হাসি বিলিয়ে দিলাম। ঘরে একজন স্থুলাকায় মহিলা—অস্থির, আরেকজন ক্ষীণাঙ্গী, শম্বুকগতি। প্রথমজনকে সকলে সম্বোধন করছে চপলাবৌদি। চপলাবৌদি আমার নাম জানতে চাইল। " আমার নাম সুজয় রায়, সংক্ষেপে সু-রা বললেই চলবে," উত্তর দিলাম। ঘরে যারা পুরুষ অতিথি আছে সকলে জলের গ্লাস হাতে টুংটাং আওয়াজ তুলে বললে, চীয়ার্স!

এবার ললিতা আমার হাতের বুটজোড়া তুলে নিয়ে বসবার ঠাঁই দিলে। মোলায়েম স্বরে বলল "আমরা পুজোর নাটকের মহড়া দিচ্ছি। আপনার এ-ব্যাপারে আছে হাতে খড়ি হয়েছিল কী?" স্কুলজীবনে উৎপল দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয় করবার অভিজ্ঞতা আমার ছিল। সেটা নেহাতই বালখিল্য ব্যাপার। "তাই আমার যথেষ্ঠ হবে। আমাদের পরিচালক হঠাৎ দাঁত তুলে ফোকলা হয়ে পড়েছে। তাই পরিচালকের অভাবে আমরা দশটি চরিত্র অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছি।" ক্ষীণাঙ্গী মহিলা এতক্ষণ আমার দিকে তৃষিত চোখে দেখছিলে। এবার

বললে "আপনার গৃহিণী তো এখনও আসেননি। একাই আছেন বাড়িতে। সুতরাং আপনি সর্বহারা, নতুন করে হারাবার মতো কিছুই নেই। কেবল শেকল টুকু আছে। শিকড় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসুন আমাদের মধ্যে।" আমি বেশ অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে নারীর ললিত লোভন লীলায় পথ হারালাম আমি। আমার অনাথ দুই হাতে এরা নিজেদের চাবিকাঠি তুলে দিচ্ছে। পিছুটান নেই, কেবল সেই চটি হাতে তোলার ইঙ্গিতটাই অঙ্কুশসম মনের মধ্যে বিঁধছে।

বোঝা গেল এনাদের পকেটস্থ হয়ে পড়েছি। চপলা বৌদি বলল, "এইবার পূজোতে মেয়েদের নাটক আলাদা করে হবে। কাহিনীতে আছে হিরোইন ভালবাসায় ব্যর্থ হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে। এই সিনটা একটু রিয়ালিস্টিক করে দর্শকদের চমকে দিতে চাই। কী ভাবে সম্ভব বলতে পারেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন ভলেন্টিয়ার পেয়েছেন কী ? পুলিশ খবর পাবে না তো?" "আচ্ছা তবে মরুকগে যাক।" (চপলা)। "কে মরল?" আমি বলি। "আপনি কিস্যু বুঝতে চান না", সারা শরীরে গভীর দরদ টেনে, মোচড় দিয়ে চপলা বলল—"একটা রোমহর্ষক রোমান্টিক মৃত্যু কল্পনা করতে পারেননা বুঝি? সেক্সপেয়ারের ধাঁচে। হট অথবা সুরিয়েলিস্টিক?"

"আমি হেঁচকি তুলে বললাম, নামটা শেক্সপীয়ার,—সেক্স্ নয় পেয়ারও নয়" এই মৃত্যু-চর্চার মাঝখানে কাঞ্জীলাল বলে উঠল, " এই নরকগুলজার প্লেতে, প্রেতকে সাজবে, এই উত্তরটা কেউ জানেন কী?" ঘরের এক কোণা থেকে উত্তর এল, "গোড়াতেই বলেছিলাম এমন ভজঘট নাটকে হাত দিয়ে কাজ নেই, শেষে অমন একটা কিছু আমাকেই সাজতে হবে। গত বছর 'ভূশণ্ডির মাঠে' কারিয়া পিরেতের (প্রেত) রোলটা এই শর্মাই করেছিল।"

এক মোলায়েম চেহারা ভদ্রলোক, সাদা রং, বরতনু পরম ধৈর্যধরে বসে আছে মহিলাদের স্বয়ম্বর সভায়, পরমনির্ভর কাতরতায়। যেন ওর জীবনকাহিনীর মলাট এখনও ওলটানো হয়নি, বাকি আছে অনেক অনাস্বাদিত সম্ভাবনা। মৃদু মৃদু ভর্ৎসনার নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে আমাকে উদ্দেশ করে। আমি কাবাবমে হাড্ডি। ভদ্রলোকের নাম অনুরীন বিভাস।

আমি প্রস্তাব করলাম নাটকের হিরো সেই হোক। এমন সময় এল গরম চা আর শীতল সিঙারা। আর এল সাতেরো আঠারো বয়সের একটি মেয়ে গানের ছন্দে চলার গতি মিলিয়ে, "ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।" বোঝা গেল নাটকের হিরোইন পৌঁছে গেছে হিরোর গেড়ো শক্ত করে বাঁধবার জন্য।

ক্রমশঃ পূজার দিনগুলো কাছে এগিয়ে আসছে। মহিলাদের নিজস্ব নাটকের তোড়জোড় অন্তরালে চলতে লাগল। একটা প্রতিযোগিতার চাপা মনোভাব মহিলামহলে পুরুষদের নাটকের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা ছেলেমেয়েরা মিলিত নাটকের

মহড়া চলে। সকালবেলায় আমরা অফিসপাড়ায় হারিয়ে গেলে বৌদিরা হন্তদন্ত স্বক্রিয় ক্ষিপ্রতায় এ বাড়ী সে বাড়ী যাতায়াত করে নিজেদের নাটকের রিহার্সাল দিতে। ওনারা এবার পূজোতে উপহার দেবেন "চিরকুমার সভা।" মহিলাদের চিরকুমারী হৃদয়। নাটকের চরিত্র যে কয়টি, আগ্রহী কুশলী অভিনেত্রী তার তুলনায় বেশী। পরিচালনা করবে মৃদুলা বৌদি। সে সহজে পেছপা নন। নাটকের সাত আটটি চরিত্র টুকরো করে বিস্কুটের মতন বণ্টন করে দিয়েছে পনেরজন নটীর হাতে। অবশ্যই তার ফলে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব লেখা একটু নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হল পরিচালিকার বেপরোয়া কলম চালনায়। আমাদের নৈতিক সমর্থন ও কৌতুহল মেয়েদের নাট্যপ্রস্তুতির গায়ে বারুদ যোগান দিচ্ছে। উৎসবের আতসবাজি জ্বলে ওঠার জন্য ছট্‌ফট্‌ করছে।

পরমা দেবী বারুদের গায়ে দেশলাইয়ের কাঠির ভয়ে নিজের দাহ্য শক্তি সংবরণ করে ত্রস্তপায়ে মহিলা শিবিরে চলে গেল। মহিলা শিবির থেকে মাঝে মাঝে দূত আসে পুরুষ শিবিরে খবর নিতে আমাদের নাটক কতদূর অপ্রস্তুত হয়েছে। পূজার আগেরদিন আমি বুলেটিন পাঠালাম যে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কেবল কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে সেই গোড়ার কাজটাই সারা বাকি আছে। মহিলা শিবির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চপ কাটলেট আমাদেরও খাওয়াল। প্রমিলাদের বন্দরে তখন অঘটনপটিয়সী শ্রীমতিরা ড্রেসের পিছনে স্ট্রেস দিচ্ছে বা ঠেস দিচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম 'চিরকুমার সভা'র জন্য অনুষ্ঠান-সূচিতে কতটা সময় রাখা হবে? পরিচালিকা বেশ ধাঁধায় পড়ে গেল। ওর নটীরা জোড়ায় জোড়ায় রিহার্সাল দিয়েছে ঘর বদল করে। পরিচালিকা সবার ঘরে হাজির হয়ে নটীদের নটে শাকে জল দিয়ে দর্শকের উদ্দেশে যথেষ্ঠ কর্তব্য পালন করেছে। কিন্তু সব নটীকে নিয়ে এক ঘরে এক ছাদের তলায় পূর্নাঙ্গ রিহার্সাল করার অবকাশ হয়নি। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি কত তলা ইমারত তৈরী হল। মৃদুলা বৌদি বলল," আমি ভাই বেঁটে দিয়েছি রবি ঠাকুরের নাটক ঘরে ঘরে। তার পর প্রহসনটা কোলাজ করার কেরামতিটা মঞ্চেই দেখাব। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।" সন্ধি পূজার পরে রাত জাগানিয়া ঘুম ভাঙানিয়া প্রমিলাদের নাটক। তাই স্থির হলো।

চার

আজ কিছুক্ষণ পরে নাটক শুরু হবে। দর্শকের বেজায় ভীড়। অবাঙ্গালি দর্শক বেশ কিছু চোখে পড়ছে। এর আগে বীরভূমের বাউলরা স্টেজে এসে আসর জমিয়েছিল। বেশ একটা চাষা-সুন্দর গ্রামীন বাৎসল্য সকলের মনের কোণে আসন পেতে নিল। বাউলদের শিষ্য ও শিষ্যারাও এসেছিল। সবে গান শেষ করে বাউলরা

গ্রীন রুমে গিয়ে বিড়ি ধরিয়েছে। এমন সময়ে মাইকে ঘোষণা, "বাউল শিল্পী বামা ক্ষেপা ব্রহ্মচারী, আপনি যেখানেই থাকুন, আমাদের ভলেন্টিয়ার ক্যাম্পে শীঘ্র চলে আসুন। আপনার শিষ্যা ছলনাময়ী গাইন অপেক্ষা করছেন।" বামাক্ষেপা বাউল ছিটকে বেরিয়ে গেল গ্রীনরুম থেকে, কণ্ঠে তার গান,"পীরিত পাখী বসল গিয়ে কোন ডালে...।" দুই মিনিট পরে আবার মাইকে ঘোষণা, " শিল্পী বামা ক্ষেপা ব্রহ্মচারী ভলেন্টিয়ার ক্যাম্পে এসে পড়েছেন, কিন্তু ছলনাময়ী দেবী আপনি কোথায় গেলেন?"

প্রেক্ষাঘরে আলো নিভে গেল। নাটকের যবনিকা ওঠার আগে শ্রীমতী মৃদুলা চরণ মাইকে মসৃন কণ্ঠে নূপুর ছন্দে দর্শকের মনে শীতলপাটি বিছিয়ে দিল। নাটকের কুশীলবদের নাম ঘোষণা করল। এবার স্ক্রীন উঠে গেল। দেখা গেল মাঝারি আকারের মঞ্চে আসবাব পত্র ঠেলা ঠেলি করছে, পা ফেলার জায়গা নেই। একজন অভিনেত্রী মাঝখানের টেবিলের উপর দিয়ে হরিণীর ছন্দে সেটের বাঁ পাশ থেকে ডান পাশে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আরেক অভিনেত্রী টেবিলের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে যাওয়ার উপক্রম করছে। হঠাৎ স্ক্রীন উঠে যাওয়ায় অপ্রস্তুত ফ্রীজ শটে থমকে দাঁড়াল দুজনে। সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনটা কাটা ঘুড়ির মত গোঁত্তা খেয়ে ঝপ করে নেমে গেল। মৃদুলা চরণের মসৃন গলা শোনা গেল। কণ্ঠে মধু ঢেলে বললে, " অনিবার্য কারণে আমাদের অনুষ্ঠান সামান্য একটু হোঁচট খেয়েছে। দশ মিনিট পরেই আমরা দর্শকের কাছে ফিরে আসব।"

আলো জ্বলে উঠল, আমরা ফিরে এলাম নিরাভরণ কর্কশ বাস্তবতায়। স্টেজে আসবাবপত্র নতুন পরিকল্পনায় ভিন্ন চিন্তায় ঘুরিয়ে সাজানো হ'ল পর্দার অন্তরালে। চেয়ার টেবিলের আর্তনাদ শোনা গেল। খানিক পরে মৃদুলা চরণের গলার স্বর মাইকে—মধু নয়, এবার মদিরা ঢালা রজনীগন্ধার গন্ধ বহন করে আনলো, "আর দেরী নয়, আমরা এবার আত্মপ্রকাশ করছি। "

... স্টেজে পর্দা সরে গেছে। দেখতে পাচ্ছি আমার প্রতিবেশী প্রমোদ লাহিড়ীর অর্ধাঙ্গীণী আদ্দির পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি পড়ে এক অপৌরুষেয় মহিমা ছড়াচ্ছে। (প্রমোদ লাহিড়ীর পূজোর নতুন পোষাক এখন স্ত্রী অঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে নাটকের খাটুনি খাটছে। নাটক শেষ হ'লে স্ত্রীর সঙ্গে পোশাক পাল্টাপাল্টি করে পূজা প্রাঙ্গনে নামবে)। স্টেজে মাইক যেখানে ঝুলছে, আর্টিস্টরা অন্যখানে ছড়িয়ে আছে। সুতরাং নীরব অমায়িক পালা হয়ে চলেছে। নির্বাক অভিনয় সচল দৃশ্যমান হয়ে হয়রান হচ্ছে শিল্পী ও দর্শক। সুতরাং যেখানে মঞ্চ নীরব সেখানে দর্শক মুখর। শিল্পীদের ছেলে মেয়েরা দর্শকের মধ্যে বসে কাতর প্রার্থনা করছে, "মা, কথা শোনা যাচ্ছে না। মাসি, তুমি মাইকের কাছে সরে এস। পিসি, তুমি সামনে ঘুরে দাঁড়াও, পেছন দেখতে চাইনা" মৃদুলা নেপথ্যে মাইকের সামনে প্রাণপণ প্রম্পটিং করে যাচ্ছে। ওর গলা

গমগম করছে প্যাণ্ডেলে। বোঝা যাচ্ছে ওর নির্দেশ কেউ মান্য করছে না, সংলাপ ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে নাটকের গতি। নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতো টলমল করছে নাটকের তরণী। কর্ণধার ডাঙায় পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে একলা। মৃদুলা দেবীর গলার স্বর এবার মদিরা ঢালা নয়, তেতুল গোলা—"ধুত্তোরি, কেউ কথা শুনছে না। নিকুচি করেছে প্রম্পটিঙের। স্বরস্বতির হাতে এবার চটি ধরিয়ে দেব।" দর্শক বলে উঠল, হিয়ার, হিয়ার!

... রাত এতক্ষণে বারটা। কিন্তু নাটকের রাত্রি এখনও নবীন। দীর্ঘায়ত অভিনয় হয়ে চলেছে;মাঝে মাঝে টুকরো সংলাপ স্টেজ থেকে ভেসে আসছে, বাকিটা মাইকে ধরা পড়ছে না। এতক্ষণে দর্শকেরা নিরাশ হয়ে স্টেজের দিকে পেছন ফিরে গোল হয়ে ঘিরে বসে গল্প জমিয়ে তুলেছে। পনেরজন অভিনেত্রী প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে নাটকটাকে পরিসমাপ্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার। রবিঠাকুরের নাটক যে পরিচালিকার সৃজনক্ষমতার গুনে এতখানি ভাতে বাড়তে পারে, সেটা আগে কেউ আঁচ করেনি। স্টেজ ডেকরেটার সর্দ্দার্জী, বাঙলা ভাষা বোঝেনা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বিবেচনা করল নাটক অনেকক্ষন শেষ হয়েছে, বর্তমানে স্টেজে ও দর্শকের দরবারে আড্ডার রস জমে উঠেছে। সর্দারজীর সাকরেদরা তৎপর হয়ে স্টেজে লাইট নিবিয়ে স্ক্রীন ফেলে দিল, প্রেক্ষাগৃহে আলো জ্বলে উঠল।

সেদিনকার পূজার সন্ধ্যা রমণীদের চিরকুমারী হৃদয়কে আঘাত করেছিল। তাদের সন্দেহ যে শ্রীমানরা মাইক স্তব্ধ করে রেখেছিল ষড়যন্ত্র করে। আকাশে তারা জাগা গভীর রজনীতে নারীর ক্রুদ্ধ ভ্রমরগুঞ্জন মেয়েরা বরণ্ঞ ধোঁয়া দেওয়া চাকে দলবদ্ধ ক্রুদ্ধ ভ্রমরের কথাই জানান দিচ্ছিল। নাটক ভরাডুবি হবার পরে চটি হাতে খালি পায়ে শিবির ঘেরাও করল। শিবিরে তখন পুরুষ শিরোমণি পূজার ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য একটু নেশা করেছিল। সাঙ্গোপাঙ্গোরাও সঙ্গোপনে সান্ধাহ্নিক সারতে বসেছে। রাত্রি তখনও তাদের কাছে সন্ধ্যা। নারীবাহিনীর মাঝখানে বসে বিরাজ করছে তারা রজনীগন্ধার মালা বুকে। "বুল" মার্কা রাম পেটে পড়েছে তাদের। সাতপাকে ঘোরার জন্য বসে আছে বর্বর ভঙ্গীতে কিন্তু প্রিয়দর্শিনী নটীদের মুখের চেহারা তখন অমার্জিত ভাতের হাঁড়ির মতো। পুরুষদের মুখে এখনও নরক গুলজারের প্রেতের কালি মোছা হয়নি। কাঞ্জিলাল দালাল ললিতাকে ডেকে বসল "এস রাঙাবউ জলকে চলি।" একটা চটি ছুটে এল—যেন মহাসমুদ্রে আলব্যাট্রস পাখী ক্লান্ত নাবিককে কোন দারুচিনি দ্বীপে বনলতা সেনের সবুজ সংকেত বয়ে করে এনেছে। এক পুরুষসিংহ উদ্যোগী হয়ে চপেটাঘাত বুক পেতে নিল। আমাদের পূজার নতুন বিস্ফোরক আবিষ্কার শ্রীমান অনুরীন বিভাস গান জুড়েছে, " শূণ্য এ বুকে পাখী মোর, আয় ফিরে আয়...।" এক জোড়া চটি উড়ে এল ডানা মেলে তার উদ্দেশ্যে। অবশ্যই নিরুদ্দেশের ঠিকানা বহন করে নয়। কারণ এবার ছিল চপলা



চটপট চটি হাতে তোলা নাটকীয় সামানীতি

দেবীর চপ্পল। ক্রমশঃই হৃদয়হরণ অন্যান্য চপলাচরণ, রাঙাপায়ের আরো জুতো বৃষ্টি হতে লাগল। শ্রীমানেরা শ্রীমতিদের হরিলুট কুড়িয়ে তুলে ধর্মরক্ষার চেষ্টা করছে। এবার প্রতিবেশী প্রমোদ লাহিড়ি স্ত্রীর অঙ্গ থেকে নিজের ধুতি পাঞ্জাবি ফিরে পেয়ে সজ্জিত হয়ে পূজা প্রাঙ্গনে নেমে থতমত হয়েছে। লজ্জিত হয়ে দণ্ডিত বোধ করছে নিজেকে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা যেমন সিনেমার সামনে পরাজিত হ্যাংলা চোখে তাকিয়ে থাকে। একটা চটি এসে পিঠে পড়ল তার। চট করে ঘুরে দেখল নিজের শ্যালি দাঁড়িয়ে। "একি মধুরিমা, তুমি? তুমি না আমার জীবন বীমা?" মধুরিমা লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল, "ওমা জামাইবাবু যে। আপনার এ জামাই সাজে পেছন থেকে চিনতেই পারিনি। ছি, একি লজ্জার কথা!"

আমার পেটের ভেতরে এতক্ষণে ছুঁচোতে ডন মারছে। এবার একলা নির্বান্ধব ঘরে ফিরে আসা। আমার ব্যথার প্রদীপ আলোর সুইচ টিপে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক পাটি জুতো অঙ্গে এসে আছড়ে পড়ল। দাঁত কপাটি লাগার জোগাড়। আধখানি খোলা জানলা দিয়ে আধফালি চাঁদ উঁকি মারছে কী? না। এক মুখ পোড়া হনুমান আমার দিকে খিঁচিয়ে টুপ করে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাসায় আমি ব্যাচেলার, রান্নাঘর রিক্ত। তাই চটে গিয়ে চটি ছুঁড়ে ধিক্কার জানিয়ে গেল আমাকে। রাম ভক্ত হনুমান আমার কৃত্তিবাস রামায়ণটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আমার জামার প্রত্যেকটা বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছে।

পাঁচ

সুখে দুঃখে পূজা শেষ হল। আজ বিজয়া দশমীতে প্রতিমা ভাসান হবে। তাই সেন্টিমেন্টের বিয়োগান্ত হাওয়া। অসুর সহ দূর্গাপ্রতিমা একটি লরিতে বসানো হয়েছে। দ্বিতীয় গাড়িতে লক্ষী ও স্বরস্বতী নিজেদের আসন সংরক্ষণ করে নিয়েছে। তৃতীয় লরিতে কার্তিক ও গণেশ। আমাদের অনুরিন বিভাস, সেজেছে সাক্ষাৎ কার্তিক। কার্তিকের বিগ্রহের বাম পাশে জায়গা নিয়েছে রোমিও ভঙ্গীতে। অন্যান্য ভক্তরা আছে। আছে ধুরন্ধর গোলদার। মালদার ব্যক্তি। সর্বাঙ্গে লক্ষ্মীর বৈভব ছড়ানো। গায়ে আফগানী স্টাইলে অজানুলম্বিত পাঞ্জাবী। ওপরের নক্সাটা ডোরা কাটা বাঘের মতো প্রিন্ট করায়। জামার ভেতরে উল্টোদিকে আত্মগোপনকারী গেরিলা যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর গহন জংলা প্রিন্ট। সন্ধ্যাবেলায় জামার ব্যাঘ্ররূপ দেখাবার জন্য ব্যগ্র হয় সে। দিনের বেলায় জামার উল্টোদিকটা আত্মগোপনকারী গেরিলা যোদ্ধার রঙ্গিলা রূপ নেয় সে। 'ইয়ে আপনা মুডকা সওয়াল হ্যায়" পাঞ্জাবীর পকেটে লের্পাড স্কিন সদৃশ রুমাল। হাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলে দামী পাথর বসানো আংটি। জনমত বলে আংটি সব নকল। অথচ বুকপকেটে দামী সিগারেটের

বাক্স মাথার চুলে লাল রঙের কলপ লাগানো। স্বহস্তে না, স্ত্রীহস্তে লাগানো।

দূর্গাপ্রতিমার সঙ্গে আমি একই লরিতে ঠাঁই পেয়েছি। আমার এক সঙ্গী পাড়ার ডন গায়ে লাল গেঞ্জি। তার বুকের জায়গায় কালো রঙের ষাড় আঁকা রয়েছে এবছর "বুল" মার্কা রাম এসেছ বাজারে। ফরিদাবাদে ফরিয়াদী গুন্ডারা চালু করেছে। লাল গেঞ্জি বিলিয়ে দিয়েছে খদ্দেরের হাতে। ভদ্রলোকের নাম বৃষভানু পতিতুন্ডি। আজ সকাল থেকেই শিবের মতো গলায় হলাহল ঢেলে চলেছে। এখন মদের জোরে সর্ব্বাঙ্গে তাগদ অনুভব করছেন। মহিলারা চলেছে স্বামীসঙ্গে নিজেদের গাড়ী চেপে। এবার মিছিল করে প্রতিমা এগিয়ে চলল রাস্তা ধরে। সামনে খোলা রাস্তা বহুদূর চলে গিয়েছে। সহসা দেখা গেল উল্টো দিক থেকে ছয় সাতটা স্বাস্থ্যবতী গরু লেজ তুলে হাম্বা ডাকে ছুটে আসছে। যেন দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার ভয়ঙ্কর তাড়া তাদের। সারা রাস্তা জুড়ে প্রচন্ড ত্রাস। তার পরেই দৃশ্য একটা ষাঁড়। গরুর তুলনায় অর্ধেক শরীর তার, পেছন দিকের একখানা ভাঙা চরণ ছেঁচড়ে চলেছে। ক্লীষ্ট শরীর সত্ত্বেও গরুদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। একেই বলে ষাড়ের শৌর্য্য! ভ্যাগাবন্ড ইভ টিজার। এই অদ্ভুত দৃশ্যটির চমৎকারিত্বে বৃষভানু নিজের শরীর থেকে লাল গেঞ্জী খুলেছে।



শ্যালিকা মধুরিমা লজ্জায় রাঙা

লরি থেকে নেমে পড়ে ম্যাটাডরের ভঙ্গীতে লাল নিশান দেখিয়ে ষাঁড়কে ডাকছে। ষাঁড় অবশ্য সেটা উপেক্ষা করে গরুদের পেছনে ছুটে চলে গেল।

এবার মিছিল এগিয়ে চলল। গাড়ি চলার গতিতে দূর্গা প্রতিমা ডাইনে বাঁয়ে হেলছে দুলছে। দেবীর পেছনে এক স্বেচ্ছাসেবক করে পতনোন্মুখ দেবী প্রতিমা আগলে ধরে আছে। বৃষভানু এবার সেইদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় সুরু করেছে। প্রতিমার মাথার আড়াল থেকে মানুষের মুখ উঁকি মারছে। মানুষের ঠোঁটে গোঁফ, সেই গোঁফ মাঝে মাঝে দেবীর ঠোঁটের পাশে এসে চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বৃষভানু নেশার রঙে জোড়া জোড়া দৃশ্য দেখছে এতক্ষণে। দুবার হেঁচকি তুলে দেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে বলে উঠল "কে মা তুমি গুঁফো পরী? বল মা, আমায় ঘোরাবি কতো ! দু চোখ বাঁধা বলদের মতো।"

ক্রমশঃ মিছিল এসে পৌছল যমুনার তীরে ভাসানের ঘাটে। "যমুনার তীরে রাধা কেঁদে ফেরে..." গান ধরল বৃষভানু। অন্য লরিতে অনুরীন বিভাস কার্ত্তিকের মতো সেজে কেত্তন জুড়েছে। আমাদের সকলের প্রাণে লেগেছে যমুনার হাওয়া। সকলেই প্রতিমার সঙ্গে নৌকা চড়ে ভাসান যাত্রা করতে চাই আমরা। জোড়া নৌকাতে প্রতিমাগুলি তুলে আমরা এলাম বেশ গভীর জলে। সকলেই নিজ রুচি অনুসারে পানীয় পেটে ঢেলে তরলিত হয়েছি। জলতরঙ্গ বাজছে পেটের মধ্যে। একটা কাব্যিক হঠকারিতা শরীরে ও মনে। " জয় মা দুগ্গা, আসছে বছর আবার হবে..., জয় মা লক্ষ্মী, আসছে বছর ভুলে যেওনা লক্ষ্মীটি, জয় মা সরস্বতী পড়াশোনায় বড় অস্বস্তি, জয় বাবা গণেশ তোমার শুঁড়ে সুর মেলাতে হবে...।" সমবেত কণ্ঠে, সমবেত শক্তিতে প্রতিমাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ছুটি দিলাম সলিল সমাধিতে। বাকি রইল শুধু কার্ত্তিক। প্রতিমার পাশে অনুরীন বিভাস সাক্ষাৎ কার্ত্তিক সেজে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে দরাদরি কল্লছে। বৃষভানুর পেটে এখন নেশার ছুঁচো আগ্নেয় রূপ ধারণ করেছে। চোখের পলকে অনুরীন বিভাসকে পাঁজাকোলা করে তুলে যমুনার জলে ভাসান দিয়েছে। অনুরীন আর্তনাদ করে সংলাপ বলে গেল," আমি ভাসমান মাইন, আমি আগ্নেয়গিরির শীর্ষে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।" শীতল জলের ছোয়ায় এসে নেশা ছুটে গেল। ডুবে গিয়ে ভেসে উঠল সে। যমুনার জল কখনও মিথ্যা বলে না। তাই জীবন শিল্পীর মনের ব্যাথা সোচ্চার হয়ে উঠল, "হায় ললিতা, লোলা, ললিতে!" আমরা সমবেত কণ্ঠে হায় হায় করে উঠলাম। বৃষভানুর হুঁশ ফিরে এল। বায়না ধরে বসল,"আমাকে তোমরা ভাসান দাও মাইরী, পাপের শাস্তি হোক।" যমুনাতে মরা কান্না জুড়ে দিল সে। এই গল্পে আর দীর্ঘ করতে চাইনা। অনুরীন বিভাসকে জল থেকে অবশ্যই উদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু সেবার নিমুনিয়া থেকে সেরে উঠে আমাদের শুভেচ্ছায়, স্ত্রীর সযত্ন পরিচর্যায়, ললিতার প্রতীক্ষমাণ প্রত্যাশায় উদরস্ফীত গণেশের মতো ময়রার দোকানী ঠেকত সে।



শ্রীমান অনুরিন বিভাস

বালতি বিয়োগ

এক

বালতি বিয়োগ। এই একটা কারণে এক আস্ত গল্প পেশ হয়ে গেল। কিসের থেকে কি যে হয়। বিধাতা আড়ালে হাসে, আর গল্পের গুলিসুতো পাকায়। অদৃষ্টের হাতে এক টিপ নস্য নেওয়ার মতোই চতুর পরিহাস। অন্তর্যামির স্বভাবটা চপল খেলোয়ারি।.... গরিবের বাড়িতে সাবেক কালের পেতলের বালতি, পিতৃপুরুষের নাম লেখা, সেটা হারালো একদিন নিরম্বু ভ্যাগ্যাকাশের তলায়। গরিবের সংসারে অভাবের ছড়াছড়ি। খড়-কুটো খোয়া গেলেও ক্ষতি সয়না। মেজাজটা সপ্তমে চড়ে বসল। বাবা বললেন, ''আয়ের রাস্তা দেখ বাপু, ব্যয় আর কতদিন হজম করা যায়।''... মৈত্রমশায় কলকাতায় আর্টকলেজ থেকে স্কলারশিপ পেয়ে, গোল্ডমেডেল তুলে পাশ দিল একদিন।

ফাইনাল ক্লাসের ছাত্ররা ছবির প্রদর্শনী খুলে দিল। আগাম ভবিষ্যতের আশায় বুকে দম ভরে। সময়টা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দিনগুলি, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। রবীন্দ্রনাথ, অবনঠাকুর এসেছেন চিত্রকলা দেখতে। সবে তখন মেয়েরা প্রথম আঁকা শিখবার প্রবেশাধিকার পেয়েছে। প্রিন্সিপালের বুকের ভেতরে ঢাক গুড়গুড় আশঙ্কা। কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়েরা কী জানি কী করে বসে। রবিঠাকুর প্রিন্সিপালকে বললেন,'' কী করেছ তোমরা, দু একটা ছবি উল্টো টাঙিয়েছ।''— ''আর কোনো উপায় নেই, গুরুদেব, ছবিগুলো উল্টানো অবস্থায় বিক্রি হয়ে গেছে। পাল্টা ঘরে চলে গেছে তারা। এখন সোজা করলে খদ্দের পয়সা ফেরত চাইবে।''— প্রিন্সিপাল জানালেন। মৈত্রমশায়ের হাতে আঁকা **self-potrait,**— যেটা গোল্ডমেডেল পেয়েছিল, সেটা বিক্রি হলো না। উৎসাহে ভাঁটা পড়ল।

মৈত্রমশাই গেল শান্তিনিকেতনে, অশান্তি বুকে চেপে। বিশ্বকবি তখন কবিতার খাতায় ছুটি নিয়েছেন। জলরঙের খেলাঘর সাজিয়ে বসেছেন। তুলি আর বর্ণে মাতাল কবি। আমন্দে ফর্সা কানে বহুরূপীর রঙ ধরেছে। বোলপুরের বজ্জাত গরম। আমের বোল ফুটেছে। তুলির টানে আর কবির মনের ভাঁজে তখন ছবির তিলোত্তমা মুর্তি তৈরী হচ্ছে। ''তরুণ তুমি ছবি দেখছ কেমন? ছবির কাজে তোমার মতো শিক্ষার

দখলদারি নেওয়া হয়নি আমার।"— কবি জিজ্ঞাসা করলেন। তরুণ মৈত্রের শিল্পবুদ্ধি তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। ছবি আঁকা দেখছে না সে, দেখছে এক বিশ্বজোড়া ব্যক্তিত্বকে। এদিকে মৈত্র মশায়ের চৈত্র মাস,— রোজগার নেই। রবীন্দ্রনাথের গায়ে তালপাতার বাতাস করছে সে। তরুণ গেল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়। অবণঠাকুর আজকাল কাটুম-কুটুম ফেলে ছবিতে হাত দিয়েছেন আবার। পায়ে ফোড়া হয়েছে, শুশ্রূষা চলেছে।

"তরুণ, তোমার এত ক্লিষ্ট চেহারা কেন, হতাশ কাতর শরীর? বুঝেছি আয় নেই। অতুল বোসের কাছে যাও। হাত দাও পোট্রেট আঁকায়।"— তাই হলো, অতুল বোসের প্রস্তাবে মৈত্র মশায় আঁকল সত্যেন বোসের প্রতিকৃতি। শিল্পীর খাসা হাত। এর পর আশুতোষ মুখার্জী ধরা দিলেন শিল্পীর তুলিতে। রঙের রাখি পড়িয়ে দিয়ে নরম বাঁধনে শিল্পী আসর গরম করে তুলল। ক্রমে পুষ্পিত সৌরভের মতো একটা সুনাম ছড়িয়ে পড়ল ভারিক্কি সমাজে।

আজকাল আর অর্থের জন্য উমেদারি করতে হয়না। তবে এখও ছন্নছাড়া জীবন। স্থায়ী চাকরি নেই। ছবি আঁকবার বায়না আসে শহরের বাইরে থেকে। ছুটোছুটি লেগে আছে পায়ের চাকায়। তবে ছবির হাত ধরে সচল সমাজের নানা অভিজ্ঞতা মিছিল করে আসছে মৈত্রমশায়ের তরুণ জীবনে।

ছবি আঁকার বায়না এল বাটপাড় গঞ্জের জমিদারের কাছ থেকে। জীবন সতরঞ্চের সাহেব, বিবি, গোলামদের আসরে। মহারাজের ছেলে, অর্থাৎ ছোটকর্তা রাজবাড়ি যাবার রাস্তা বাতলে দিল।

"আমাদের খাসমহল, স্টেশনের ঢিল ছোঁড়া দূরে। ট্রেনের কালো ধোঁয়া আকাশে ছবি আঁকছে শরতের মেঘের সাথে। মাঠে, ঘাটে কত কাশবন সাদা হয়ে আছে। ইস্টিশনের কাছাকাছি এসে এঞ্জিন সময়ের মার্জিন বাড়িয়ে দেয়।— ইতি উতি করে। যাব কি যাবনা, পিছুটান হয়। সেই সুযোগে কামরা থেকে নিচে ঝাঁপ দেবে— বামাল সমেত। আমড়াগাছি করো না। দেখোনি, চাল নিয়ে কালোবাজারি করে যারা, বস্তা ভরা চাল ছুড়ে দেয় ট্রেন থেকে? মনে রেখো আইন ভাঙে যারা, তাদের টনটনে জ্ঞান বিষয়বুদ্ধিতে। প্রথমটা মাটিতে লুটিয়ে গড়িয়ে যাবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। গতরে জখম হবে না। বুঝবে তোমার আক্কেল জ্ঞান সেলাম জানাচ্ছে। এদিকের চালচলনটা এমনধারা। সাবেককাল থেকে। রেলপুলিশ সন্দেহ করে তোমার সাথে কোলাকুলি করতে চাইলে, আমার বাপের নাম শুনিয়ে দেবে। সেলাম ঠুকে তোমার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবে।

...তারপর আমার বাড়ির দিকে শর্টকাট রাস্তা বেছে নেবে। গ্রামের ভুগোল জানা আছে কী? হাঁটা পথ। দুলকি চালে রাঙা রাস্তার ধুলোয়। বাতাস-মুখী হয়ে চলো। রাস্তা হারাবে না। সজনে তলা, নিমের পাড়, হোঁদল বন, বাঁদর বাগান, আম, জাম,

কাঁঠালের বাগিচা পার হয়ে যাও। ফকির চাঁদের আখড়ায় জল খেয়ে নাও। তারপর এই গাঁ, সেই গাঁ, নাম জানা নেই। ব্যাস, তারপর ধু ধু তেপান্তরের মাঠ। বেদম হাঁটা। মনে মনে জপ করো, ' সন্ধা হলো, সমঝে চলো; সন্ধা হলো, সমঝে চলো"

তেপান্তরের মাঠ পার হলে বুঝবে কেল্লা ফতে। কারণ ফেরবার আর যো নেই। সূর্য তখন পাটে বসেছে। ফিরতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ফেরারী আসামীর মতো সন্ধ্যা তোমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলবে। সে এক হারে, রে, রে রোমহর্ষক ব্যাপার। মালকোচা বেঁধো। টর্চ রেখো সাথে। ডান হাতের বাঁকা পথ পরিত্যাজ্য। সেটা ডাকাত চলার রাস্তা। রাতে যাদের নাম মুখে আনতে নেই। বাঁ হাতের রাস্তা ধরে সট্‌কে পড়বে। কেউ যদি সামনে এসে পড়ল, অমনি সাধ্বি ব্রাম্মণীর মতো সতী চলেছে শ্বশুর বাড়ি গোছের লক্ষ্মীশ্রী টেনে, পেছন দুলিয়ে দুলকি হাঁটবে। এসো রাঙা বউ, জলকে চলি। এই তো যাই। যেন কতবার গিয়েছ এই সনাতন রাস্তায়। এপাড়ায় চালের কালোবাজারীদের আড়তের সমারোহ। অতএব বেপাড়ার লোক দেখলে সন্দেহের চুলোচুলি লেগে যায়। গণধোলাইয়ের জামাই আদর লেখা থাকতে পারে কপালে। ধরা পড়ে গেলে হয় জান দাও, নতুবা ওদের নাড়াবাঁধা শিষ্য হয়ে থেকে যাও। পুলিশের ধুরন্ধর টিকটিকি ঘোরাঘুরি করে। ... ক্রমশঃ কৈবর্ত পাড়া, নাপিতধাম, বৈষ্ণবের আখড়া, মেথরমণ্ডি, ডাকাত-কালিবাড়ি পার হয়ে যাবে। তালগাছ, শাল গাছের সংখা বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাস, আর কোনো চিন্তা নেই। তুমি এসে পড়েছ জঙ্গল মহলে। আর তোমার চালে বেচাল হওয়ার ডর নেই। জনমনিষ্যি থাকেনা সেখানে। কেবল হাড়গোড় পাওয়া যেতে পারে। সেখানে আমার জোড়া ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করবে তোমার জন্যে। সহিস থাকবে।

—কৈ হে শিল্পী, শ্বাস নেই কেন ? বেঁহুশ হয়ে পড়লে নাকি ? রাজবাড়ি যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? ষাঁড় পেরোলেই শিবের দর্শন হয়।"

দুই

সংসারের অনটন বড় বেশী, তাই মৈত্র মহাশয় অনিশ্চিত বিপদের হাতে নিজেকে বণ্টন করে দিল। কী উপায়ে শহরের শিল্পী জমিদারের খাস মহলে পৌছতে পেরেছিল, সে অভিজ্ঞতা আর এক দিনের গল্পের জন্য তোলা থাক। ... জঙ্গল মহল থেকে ঘোড়ার পিঠে মোটর গাড়ি ধেরে, ধেরে, ধেরে ধিনাক নাচের তালে চলল উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে। যাত্রা যখন শেষ হলো রাত তখন গভীর, হুম হুম করছে। দোতলা রাজকুঠির সামনে লৌহকপাট। ডাকো দারোয়ানকে। লোহার শিকের দরজার ওপারে খাটিয়ায় শুয়ে তাকে কালঘুমে পেয়েছে। শত ডাকে সাড়া নেই। হাঁ করে হাপরের মতো নিঃশ্বাসের প্রলয় তুলেছে। কুম্ভকর্ণের জাতভাই নিদ্রার বিজয়কেতন

তুলে দিয়েছে। সহিস ঢিল ছুঁড়ে দিল গায়ে, কিস্যু হ'লনা। মাঝখান থেকে পাশে মাটিতে শোয়া কুকুরটা করুণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। একেই বলে মনিবের জন্য কুকুরের দরদ। টহলদারী এক পেয়াদা এগিয়ে এসে গেট খুলে দিল। একতলাতে ছোট কুমার থাকে, দোতলায় মহারাজ স্বয়ং। লণ্ঠন হাতে পেয়াদা একতলার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক শুরু করে দিল। খাসচাকর ঘুমে পাথর হয়ে গেছে। একটা জানলা খুলে গেল। ছোটকর্তার ঘর, লণ্ঠন জ্বলছে। এদিকটা লণ্ঠন-সভ্যতা।

—কে রে, রাতের মৌতাত ভেঙে দিচ্ছে ? গোরা সৈন্য এসেছে ? সাহেবদের বলো কাল সকালে পায়ের ধুলো দিতে।

পেয়াদা ঃ আর্টিস্ট এসেছে কলকাতা থেকে।

—এ্যানার্কিষ্ট এসেছে ? তাড়াও, তাড়িয়ে দাও। কুটুরীতে গুম করে রাখ। বন্দুক লাও।

—বাবু, বন্দুকের বাঁট আছে, নল নেই।

—তবে পুকুরে ঝাঁপ দাও।

—মৈত্র মশায় এয়েচে।

—কী বললে, বিষয় আশয় চেয়েছে ?

(হাঁউমাউ, মরা কান্না শোনা গেল)।

—শিল্পী এয়েচে।

—কী বললে, শিউলি এসেছে? আমার শিয়রে শিউলি, ঠোঁটে শিউলি। ওরে মেয়েটা আমার বিধবা জীবনে সধবার সিঁদুর। ডেকে আন।

একতলার বন্ধ দরজা চিচিং ফাঁক হল মন্ত্রের মতো। ছোটকর্তার খাস চাকর ভজহরি, লণ্ঠন হাতে বেড়িয়ে এল। ঝিঁ ঝিঁ ডাকার আসর বসেছে মাঠে। তখন মৈত্র মশায়ের চোখে নিদ্রার শমন নেমে এসেছে। ওকে কাছারি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল আরামকেদারায়। লণ্ঠনের আলো যত, অন্ধকার আরো বেশী। ঘরের ভেতর কয়েকটা চামচিকে সার্কাসের ট্র্যাপিজ খেলার মতো হাওয়ায় সাঁতার শুরু করল। ছোট কুমার এসে দাঁড়িয়েছে দেওয়ালে মস্ত ছায়া ফেলে। পা দুটো টলমল নেশার পালে হাওয়ার দোলায়।

—"শিল্পী, এই ভর সন্ধ্যাবেলায় তোমার আসার সময় হল ? বাপু বলে কয়ে আসতে কী ছিল? আমি কি দিব্বি দিয়েছিলাম, এসো না? বিষ্যুদবারে বারবেলায় পায়ের ধুলো রাখলে। তবে এলে যখন বঞ্চিৎ করবো না। গেলাসে সিন্নী এখনও বাকি আছে। তুমি খাও, আমি প্রসাদ পাব। তোমার শরীরে সাক্ষাৎ শিবের লক্ষণ। তোমাকে একটা পেন্নাম ঠুকি। ঢালো হলাহল শিবের গলায়। সকাল থেকে ঐ কর্মটা করে চলেছি। চোখে এখন গোলাপি খরগোশ দেখছি।

মৈত্র মশায় চিঁ চিঁ ক্ষীণজীবি গলায় বলল,—"একটু যদি শুতে পেতাম। আর

একটু বাতের মলম, রাতে যাতে কাত হয়ে না পড়ি।" কুমার বলল, " সি কী কথা? হরিমতী আছে, তোমাকে দুধে আর চন্দনে সাজিয়ে ঘরে তুলবে। বালাই ষাট। সাধ করে কেউ বৈরাগী সাজে? না কি, গোলাবিকে ডেকে আনি? মর্জি মতো পছন্দ করে



নিও। পথে শিউলিকে দেখেছ কী ?"

ভজহরি রূপোর রেকাবিতে ফলাহার নিয়ে এল। বয়সে সে প্রাচীন। চেহারাটা যেন যমের দোসর। অনেকদিনের পুরাতন কফ্ চাপা গলায় বলল,বাবু উঠোনে

চলুন। সেখানে রাতের আকাশের তলায় গগনমুখী হয়ে চিৎকার করছে, "ভগবান, ভগবান।" বোধকরি অন্নগ্রহণ করতে হলে বিধাতাকে সাধাসাধি করতে হয়। মৈত্রমশায় নির্বাপিত শক্তি দিয়ে গলা মেলালো। এটাই হয়তো এই সংসারের বিধি। শেষে সিদ্ধিলাভ হলো। বামন অবতার এক কোলকুঁজো চাকর জলের ঘটি এনে অতিথির হাত, পা ধুইয়ে দিল। ভজহরির ভর্ৎসনা, "ভগবান, তোকে গলা টিপে মারবো। শত চিৎকারে তোর সাড়া নেই।" ঘোর কলি।"

তিন

পরের দিন সকাল বেলা। মৈত্রমশায় দোতলায় বসে শ্বেতপাথরের বারান্দায় মহারাজের সঙ্গে আলাপচারী। টেবিলে গেলাসে আঙুরের রস, বাতাবির রস, ডালিমের রস। জীবনের জাহান্নামের দর্শন কথা শুনছে জাঁহাপনার মুখে। ওনার চওড়া কাঁধ। বুলন্দ দরওয়াজা যেন। খল হাসির গমকে কাশ্মীরের খিলনমার্গ খসে আসে। চওড়া বুকের পাঁজরে জীবনের নীল আকাশ আজও নবীন আছে। সারা জীবন প্রেমের গুলতি ছুঁড়ে চলেছেন। বয়সে যদিও পাক ধরেছে,অবসর হয়নি আজও বিলাস ব্যসনের ব্যস্ততায়।

—শিল্পী, তোমার তুলিতে রস কত বশে আছে ? তুমি কার মাথা শিকার করেছ?

—আজ্ঞে, সত্যেন বোসের ছবি এঁকেছিলাম।

—সতু বোস ? তার সাদা চুলে শন। শরীরে মরচে ধরে গেছে। অঙ্ক করে সে। টাকার লোভে জীবনে নিজেকে অঙ্কের কাটা ছেঁড়া, ছেঁদো রসে বিলিয়ে দিওনা। ইন্সান আঁকো, ইন্সান।

—আজ্ঞে, আশুতোষ মুখুজ্জের ছবি এঁকেছি।

—পণ্ডশ্রম করেছো। সে তো কেতাব পড়ে। পণ্ডিত মানেই বিষয় আশয় পণ্ড। কেতাব পড়ার লোকদের মাইনে দিয়ে পুষে রাখি। আমার জীবনী লিখছে তারা। আমি স্বাক্ষরের অক্ষরও জানি না, টিপ সই দিই। — এতে কী প্রমাণ হলো ?

—আজ্ঞে, আপনার মতো কীর্তি কটা আছে? অক্ষরের তোয়াক্কা রাখে না।

—আছে, আছে , ঘরে ঘরে সেই দেশনেতা তৈরী হচ্ছে। আজ বাদে কাল, সময় দেরী নেই। তোমার চেহারাখানা দিলখুশ, স্বভাবটাকে করো দিলবাহার। কি খাবে? স্কচ, তামাক, গাঁজা, ভাঙ? কিস্যু খাবে না?এই ভাবে কাঁচা শরীর পাত করোনা। অনাহারি থেকো না। তোমার কোন দোষ নেই, এটাই তোমার মারাত্মক দোষ। একদিন বেঘোরে প্রাণ হারাবে। মাতাল হতে হবে। শিল্পী তুমি, রসের ঘরে আমিষের অভাব —গুরুচণ্ডালী দোষ। তাছাড়া খানিক ইয়ে টিয়ে পেলে দুর্বল জানে উর্বর চিন্তা আসে।

—আজ্ঞে, এখনও উদ্বাহবন্ধন আমার হয়নি।

—সেডা আবার কী ? রান্নার ব্যঞ্জন, নাকি সেটা আক্কেল দাঁত? কত এসেছিল রাতে, সকালে ঝরে গেল আমার ছেলের হাতে?

বড় কর্তার চোখদুটো শার্দুলের মতো দৃষ্টি শানাচ্ছে। একটা খল হাসি আছড়ে পড়ল দেওয়ালের পাষাণের বুকে। পচাৎ করে পানের পিক ফেললেন পিরীচের ভেতর।



তেলছবি আঁকা হবে দরবার কক্ষে, সেখানে মধ্যমণি হয়ে মহারাজ সিংহাসন ধন্য করছে। এক অজ্ঞান তামসি ক্ষুধা ইতিহাসকে অজগর সাপের মতো জঠরে জড়িয়ে জর্জরিত করছে। সন্ধ্যার নহবত বেজে চলেছে, রূপবতী রাজকন্যার মায়াশ্রিত গোধূলি আকাশে। ইতিহাসের বক্র পথ আবার চক্রবৎ সুখ-দুঃখের ঘূর্ণিদোলায় রাজসিংহাসন দোলাবে। তাই পুরাতন সাজসজ্জা বেরিয়ে এসেছে। মিথুন রাগ

বাজছে সানাইয়ে। চার দেয়ালে পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো, বিদেশী শিল্পীর হাতে আঁকা। বাঁকা দৃষ্টি দিচ্ছে উদয়দিগন্ত থেকে। বংশদণ্ড হাতে শেষ মহারথি অস্তাচলের পথে মুকুট পড়ে ময়ূরসিংহাসনে বসে। মুহুর্মুহু তামাকের ধোঁয়া আর বারুদ কুটিল কুণ্ডুলি পাকাচ্ছে আলবোলায়। আমরুদ খাচ্ছে ঘনঘন, সযত্ন অবহেলায়। রাজা উজীরের খামখেয়াল বজায় রাখছে। দশ ফুট উঁচু, বিশ ফুট চওড়া ছবির সাইজ হবে।

ছবি আঁকা শুরু হলো। শিল্পীর তুলি দ্রুত ছোটাছুটি করছে, একে একে বশ করে চলেছে, পুতুলের মতো গড়ে চলেছে দরবার কক্ষের চালচলনকে। তুলির হুকুমে রইস সমাজটাকে চাবকিয়ে আগাপাশতলা নতুন করে মানুষ করছে। আগামী পৃথিবী অবাক হয়ে দেখবে শিল্পীর বহ্নিময় চিত্র ভাবনা। কামুক রাজকাহিনীকে স্বরস্বতীর হংসমুখী শ্বেতকল্পনায় ধ্রুপদী তালের ঠেকা জুড়ে দেবে। সিংহাসনের পাশে ঢাল-তরোয়াল হাতে প্রহরী পাথর হয়ে আছে। পঞ্চনদীর ওপার থেকে পাগরীধারী এই উগ্র সৈনিক এসেছে। ওর পেছনেও দুটো চোখ তাকিয়ে থাকে।

পেছনের দেয়ালে দুই দিকে দুই দরজা, অন্দরমহলের সঙ্গে সেতুবন্ধন করছে। দরজা দুটি আধাখোলা। উঁকি দিচ্ছে তৃষাকাতর চোখ, তার সাথে রমণীয় ভুবুর ভাঁজ। অন্দরের বাঁধ ভাঙবে বুঝি। যেন কলকাতার আর্টিষ্টকে বাটোয়ারা করে নিতে চায়। ঘুঙুরের শব্দ তুলে এবার দুইজন স্বপ্নসুন্দরী ঘরে এলো। জাতিকারা বয়সে কাঁচা, স্বভাবে পাকা। অনায়াসে এসে সিংহাসনের পেছনে গালে হাত দিয়ে ছবি দেখছে তারা। একজন মহারাজের কোলে বসে পড়েছে। পটের বিবির মতো।

মৈত্রমশায়—"মহারাজ এদের সরে যেতে আজ্ঞা হোক। নইলে ছবির বিলাস-তরণী কোন কূলে গিয়ে ঠেকবে সেই বিদ্যে আমার জানা নেই।" ইতিমধ্যে আরো দুটি মেয়ে আটিসাটি রহস্যের মতো এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিতে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়েছে।

মহারাজ—"তুমি ওদের দিকে তাকাচ্ছো কেন ? আমার দিকে তাকাও। ওরা যাবে না, যায় না কক্ষণো।" হার মেনে সিংহাসনে বসে আছেন। নায়েব এবার মৈত্রমশায় কে চোখ টিপে জানালো— "ছেড়ে দিন কর্তার কথা। উনি ইয়েদের নিয়ে বেঁচে বর্তে আছেন। কাছখোলা মানুষ। সিটিং দিয়ে মিটিং করে ওনার ছবি আঁকা কোনো ভদ্রলোকের কর্ম নয়। ওনার ফটো আছে দরবারে বসে। তাই দেখে আঁকা সারুন। মেহেরবানি করে পছন্দ মতো তাস খেললে একটা ছুঁড়িকে পাঠিয়ে দিতে পারি। আস্তানা গেড়ে থাকুন। অল্প সময়ে জাহান্নামের গোলাম হয়ে থাকবেন।"

...পশ্চিম ঘরের বিছানা ভরা জ্যোৎস্নায় আলোর ঢল নেমেছে। জীবন ও যৌবন। —কোন পথে হাতছানি ? মৈত্রমশায় একা এখন নির্বাচিত শোয়ার ঘরে। সারা ভুবনটা তার চিৎ হয়ে শুয়ে আছে খাটে। ঝুলি থেকে বাঁশী বেরিয়ে আসল। জীবনে যতোই জট পাকাকনা কেন, বাঁশীর সুরে সব ভার হাল্কা হয়ে যায় মেঠো পথে সন্নাসী গেরুয়া ধুলায়।

ফটো দেখে ছবি শেষে আঁকা হল। নায়েবের কথাই বজায় থাকল। জীবন্ত জমিদারকে ছেড়ে ফটো দেখে জীবনের জলছবি আঁকা হল একমাস ধরে। যেন খাপে ঢাকা খোলা তরোয়াল। স্ববিরোধী কান্ডকারখানা। বাস্তবে রাজা আস্ত আর নেই। কর্মখালি হয়ে আসছে। অতীতের বর্ম পড়ে বসে থাকা। বিষয় আশয় মুলতুবি রইল। ছবি দেখে বড়কর্তার আহ্লাদ হলো।

—তরুণ, তোমার খাসা হাত। প্রতিশ্রুতি আছে বটে। কিন্তু, রাসকেল তুমি। একা হাটে বসে আছি। কেউ গাইছে না, নাচ নেই। এ কেমন ধারা ছবি ?

—আজ্ঞে, দরবারে নাচবে, কার হুকুম আছে ? তার জন্য জলসাঘর চাই।



"—তবে আঁকো জলসাঘরের ছবি। জলসা ডাকি। জীবনের স্বাদ, আহ্লাদ নিয়ে গুছিয়ে বসি। তুমি কষে একটা ছবি দাখিল করো, আমি দখলদারি নিই। আয়েসের পাতে নিরাশ করোনা ছবিতে। শেষ রাতে আমি মাটিতে ছবি পেতে ধরাশায়ী হব। এমন ছবি আঁকবে, যে আর্টকলেজের দেওয়াল চৌচিড় হয়ে ফেটে পড়বে। মনে রেখ রাজকাহিনীর ইতিহাসটাই খেয়ালের বশে পাকা ইতিহাস লেখে। তারপর তুমি

ফুটানি করো। খালি হাতে ফিরে যাবেনা। রূপোর মুদ্রা, উপঢৌকন, রূপবতি কন্যা, সব পাবে। সারা জীবনের মাসোহারা পাকা বন্দোবস্ত।" হঠাৎ মহারাজের গলা সপ্তমে উঠল।—"মনে রেখ ছবি দেখে যদি কৌমার্য ভঙ্গ না হয়, তোমাকে কামানের গোলার সামনে উড়িয়ে দেব।" মৈত্রমশায় এখন পৈতে হাতে দূর্গানাম জপ করছে।

পুরাতন জলসাঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে দুর্গন্ধ অবকাশ অনেক বছর চাপা ইতিহাস হয়ে আছে। মহারাজ স্বয়ংম্বর হতে চান। জনস্রোতের বেনোজলের রাস্তার দূরে ঢাল তরোয়াল নিয়ে তার সকাম ভাবমুর্তি। সেই রাজা—

আলমগীড়ের হালুম রেওয়াজ, বন্দুকের বাজ,
বঙ্কিম চোখে রক্তিম মেজাজ, গতরে আতরের সাজ,
নাজুক চোখে নাচোয়ালি লাজ,
—গতরে ব্যাধি স্থবির হলো,
মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে
মহিম হালদার, কবিরাজ
হতাশ জীবনে আলোর বটিকা দিল ;
মহারাজ গোপনে চেটে নিল।

বড় কর্তার সখের পেয়ারী, অন্দরের বন্দর ছেড়ে এসে নাচল। ছোটকর্তা স্কচের ভাঁড়ার ছেড়ে আসছেনা। সেখান থেকে উর্দিপরা খানসামারা খালি গেলাস পরিবেশন করছে জলের সাথে জলসাঘরে। বারবার রব উঠছে 'হৈ খিদ্মদগার, শরাব লাও"। সবার পানীয় গেলাস থেকে গলায় ঢেলে শিবনেত্র হয়ে ছোট কর্তা ক্রমাগত হেঁচকি তুলছে ভাঁড়ারে। সকলের খালি গেলাসে মুহুর্মুহু প্রক্সি দিয়ে যাচ্ছে। জলসাঘরের এক কোণে মৈত্রমশায় ইজেলের ওপরে ক্যানভাস চাপিয়ে ছবি এঁকে চলেছে। নিজের শিল্প বুদ্ধি আর জমিদারের বর্বর মর্জির এক মার্জিত সহাবস্থানের চেষ্টা করে চলেছে। সেই ছবি আরো একমাস ধরে শেষের পরিণতি দেওয়া হল। যাতে ভবিষ্যমানবকুলের হেপাজতে তুলে দেওয়ার যোগ্যতার সোপান পায়। পশ্চিম ঘরে শুয়ে প্রতি রাতে, কিম্বা অলস দুপুরে শিল্পী বাঁশীতে যেন ডাক দেয় কাকে? বাবার চিঠি নিয়মিত আসে না। খাওয়া-পড়ার অভাব ঘুঁচে গেছে। কিন্তু কোথায় যেন সুঁচ বিঁধে আছে। বেপরোয়া বেআব্রু জমিদারিতে, পিছল পথে কোন বৈকুণ্ঠের লোকে তার বাঁশীর সুর মুর্ছিত এলোকেশী হয়ে মাথা ঠুকছে?

চার

কয়েকদিন পর আড় ভেঙ্গে সচল হয়েছেন জমিদার। বিশাল বাগানে শিল্পীর কাঁধে হাত বিশ্রাম রেখে পায়চারি। মহারাজ বলছে, "গৃহিণী গত হয়েছেন। রাতের অনিদ্রার অসুখ জানো কী?

—জানি বৈকি। সকালে অভাবের সংসারে ডন বৈঠক দিই। রাতে দগ্ধ হুতাশন।

—তুমি আস্তাবলের ছাপোষা ঘোড়ার মতো কথা বলছ। যুগ-যন্ত্রণার কথা বলোনা। জানো আমার বাপ -ঠাকুর্দা কখনো কর্ম করেনি? এতে কী প্রমাণ হলো?



—আজ্ঞে ছোট মুখে বড় কথা কি সাজে? আমি বামুন হয়ে কী করে চাঁদে হাত বাড়াই?

—বেড়ে বলেছ বটে। আমি তোমার বাপের বয়সি। আমার বিনতি রাখবে?

একটা মৃগনয়না মেয়েমানুষের ছবি আঁকবে। সঙ্গে মুংরীর গলায় ঠুংরী বাজবে। মজুরী যথেষ্ট পাবে।

—আজ্ঞে, মেয়েমানুষ কী দোষ করল? ছবি আঁকব।

—গতরে সুতোও থাকবেনা কিন্তু। ছবিতে যথেষ্ট ইয়ার্কি থাকা চাই।

টুংটাং করে নূপুরের ছন্দে কয়েকটা মুদ্রা খসে পড়ল মৈত্রমশায়ের পাঞ্জাবির পকেটে। বড়কর্তার শিথিল হাতে সুক্ষ কসরৎ আছে।

—মহারাজ,সাহস দেন তো প্রশ্ন করি।

—সহবৎ বজায় রেখে প্রশ্ন করো।

—কেমনটি চাই? গৃক ভেনাস, না, বটতলার বিবি?

—"ওই দুটো মিলিয়ে একটা দমকা ঝড় তুলে দাও। মেমসাহেবের শরীরে বটতলার ঢং। একটা আঁসটে গন্ধ রেখ, যেন ডুবজলে মাছের লীলে। পারলে আমাকে জলে ফেলে দিও, আমি মৎসকন্যা ধরব। আমাদের পুর্বপুরুষ ছিল আরাকানের দুর্ধষ্য জাতি। জীবনের তোয়াক্কা রাখতো না। তুড়ি বাজিয়ে ইতিহাসের রাস্তা কেটে নিত। তোমাকে আর্শীবাদ করছি, আমার যোগ্য চেলা হও। তবে এসো শয়নকক্ষে"।— সেখানে কতো বালিশ ছড়িয়ে আছে, রাত জাগা গুপ্ত কাহিনী পাছামুড়ে শুয়ে আছে। মহারাজ হাতে তালি বাজাল। তালির তলবে ঘরে এসে দাঁড়াল একটি নেপালি মেয়ে। চোখের পলক যেন প্রজাপতির পাখা। নাকের ইষৎ আভাষ আছে। আটসাট শরীর, বেঁটে হলেও আবর্তনে সুডৌল। চেহারায় কৌলিন্য না থাকলেও, একটা মৌল আবেদন আছে শরীরে।

মহারাজ—"কমলি, তুই কমলা হাতে বিছানায় শুয়ে পড়। চাপা পড়ে আছিস সংসারে। কলকাতার আর্টিস্ট তোর ছবি আঁকবে। সাহেবেরা তে.র ছবি দেখবে। ইতিহাসে দর বাড়বে তোর। একদিন আসবে, তুই হবি লায়লা মজনু। আর্টিস্টকে পছন্দ হয়েছে?"

—কমলি মুচকি হাসে। ছবি আঁকার ইজেল আর ক্যানভাস ঘরে আনা হলো। কমলি কোমল বিছানাতে শুয়ে আছে রম্ভার মতো নগ্ন শরীরে। দাহ্যশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মেয়েটির চোখ যেন উদাসি। মুখের হাসিতে অশ্রুবেদনা ছোঁয়া। আছে সেখানে, তবু সে নেই পৃথিবীর এই মরুতে। শিল্পে নগ্নতা থাকে না। তুলির সৌকুমার্য তাকে জড়িয়ে থাকে মগ্ন তাপসীর ধ্যানে। আর্টিস্ট আঁকছে, গুনগুন সুরে তান ধরেছে। কোথায় যেন এক সুক্ষ বসন কমলির ছবিতে। বাসনার ঠোঁটে একটা চাপা বারণ রঙের রসায়নে।

মহারাজের চোখে বাঘের মতো ক্ষুধার নীল আলো। বাঘবন্দি খেলছেন। মাঝে মাঝে বাহবা দিয়ে তারিফ করছেন, শিল্পীর উদ্দেশে, মোহর ছুড়ে দিচ্ছেন গালিচার ওপরে।

—এত দিন তুমি কোথায় ছিলে শিল্পী? পাকা হাত তোমার। আমি আর্টিস্ট হব, বড্ড দেরী হয়ে গেল মাইরি। কমলি, তুই এবার পেছন ফিরে শো সোনা, তোর উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু দুদিক আঁকা চাই। পূর্ব, পশ্চিম— তাও বা অপূর্ণ থাকে কেন?

জাহাপনা তৎপর হয়ে উঠছে মডেলকে উল্টে পাল্টে নড়া চড়া করার জন্য। ওনার স্বাদ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই। মৈত্রমশায়ের গরীবি আছে, কিন্তু আছে বয়সের তারুণ্য, আরও আছে শিল্পের গড়িমা। একটা বিচ্ছেদের বিছে বৃদ্ধ জমিদারের মনে রক্ত ঝরাচ্ছে।

মনে হচ্ছে এই সেদিনের ছেলেটা কমলিকে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে ক্যানভাসের ওপরে।

—শোনো তরুণ, তুমি সামনে পেছনে দুটো ছবি আঁকো। ক্যানভাসের সামনে একটা পেছনে আরেকটা। আমি সামনের ছবি দেখব, দ্বিতীয়টা আমার কোল গরম করবে।

— আজ্ঞে, সেই রকম ক্যানভাস তো তৈরী হয়না।

—তুমি একটা লক্ষীছাড়া। না,না, লক্ষী ছোঁড়া।

হঠাৎ ঘটনায় যতি পড়ল। নায়েব মশায় বন্ধ দরজার পেছনে গলা খাঁকারি দিচ্ছে। "মৈত্র মশায়ের চিঠি এসেছে।"

মহারাজ জ্বলে উঠল, "তুমি একটা কষাই। আমি কিনা জপে বসেছিলাম। অসময়ে তোমার সময় হল।" মৈত্র মশায় পাশের ঘরে এসে দাঁড়াল। সেখানে নায়েব আর বৃদ্ধ ভজহরি। ভজহরির হাতে রূপোর থালায় লাল মখমলের ওপরে একটা সাদা লেফাপা রাখা আছে।

—"আজ্ঞে আপনার চিঠি।" একটা রূপোর মুদ্রা মৈত্র মশায় তার হাতে রাখল। চিটি হাতে শয়ণ কক্ষে ঢুকতেই নারীর হাতে নির্যাতন। কমলি ছোঁ দিয়ে চিটি কেড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। শরীরে তার শিথীল বসন। জমিদারের দু চোখের ভুরু প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে কপাল জুড়ে ব্রহ্মাণ্ডের দুঃশ্চিন্তায় তালগোল পাকিয়ে গেছে।

অনেক রাত হয়েছে। বাইরে বাতাসে শীতের আমেজ। দুরে শেয়ালের ডাক, হায়নার গলার আওয়াজ। পশ্চিমের ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। মৈত্রমশায় বালিশের তলায় বাঁশীর সন্ধানে হাত বাড়ালো। বাঁশী নেই। নিঃসঙ্গ ঘরে প্রাণ হাহাকার করে উঠল। হাতে ঠেকল একটা চিঠি। প্রথমটা আশঙ্কা হল আরশোলা বা টিকটিকি। টর্চ জ্বালালো সে। বাবার চিঠি।

—তরুণ, তোমার বিয়ে স্থির হয়েছে। অশাকরি তোমার পছন্দ হবে কণ্যাটিকে। এরা আমাদের পাল্টি ঘর,—কাসুন্দেতে থাকে। কতদিন বাউণ্ডুলে জীবন কাটাবে? পত্রপাট ফিরে এসো, যেন লগ্ন না পার হয়ে যায়। আশা করি তোমার খবর কুশল।

ইতি বাবা।

চিঠিটা কমলির হাত থেকে ফিরে এসেছে। ডানা মেলে আসেনি নিশ্চয়। রাতের রজনীগন্ধার মতো। অন্ধ ভবিষ্যতে যেন একটা আলোর জানলা খুলেছে। বাঁশীটা গেল কার ঠিকানায় ? ডানা মেলে উড়ে যায়নি নিশ্চয়। বাড়ির পেছনের বাগান থেকে রজনীগন্ধা, হাস্নুহানা আর জুঁই ফুলের উদ্দাম সৌরভ রাতের গভীরে স্বপ্নের কুঁড়ি হয়ে ফুটেছে যেন। স্বপ্নের মসনদে বসিয়ে অলকার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা শিল্পী বিদায় নিল যখন বড়কর্তা, কুমার দুজনেই ঘুমিয়ে কাতর। ইতিমধ্যে একটা সাইকেল কিনেছে সে। নায়েবমশায়, ভজহরি ছিল বিদায়ের রাস্তার ভাঙা আসরে। পাখি জাগা ভোরের সকাল। মৈত্রমশায়ের সাইকেলের দুই চাকা বণবণ করে ঘুরে চলল সজোরে কদম ফেলে।... ক্রমে স্টেশন কাছে এসে পড়ল। সেই কালের গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। ভিড় কম ছিল। সেখানে চায়ের দোকানে গুলতানি হচ্ছে। সাইকেলের চাকা ক্রমে বিশ্রামের যতি টানল দোকানের সামনে।

—"বাবুমশায়ের কোত্থিকা আসা হল?" প্রশ্নের সাথে চা পরিবেশন হল।

—"কলকাতা থেকে বেরিয়েছি কয়েকমাস আগে। ছবি আঁকি অর্ডার পেলে।"

—"এপথে মার্ডার করতে আসে অচেনা লোকে। আপনার চেহারা ভারী খাসা। দেখে মায়া হয়। লাটুবাবুর বাড়ি যান। ওনার রেস্ত আছে যথেষ্ট। ইষ্টনাম ঠোঁটে। ষাট বছর বয়সে দ্বিতীয় বে করেছেন। বলা কি যায়? নতুন বউয়ের ছবি আঁকবেন আপনি। উনি স্ত্রীকে মা ডাকেন। মাথায় জটা, চোখদুটি রাঙ্গাজবা।"

চায়ের দোকানের পাশে ভাতের পাইস হোটেল। বাঙালি মাছে-ভাতে আছে। কষে খাচ্ছে। তার সাথে অম্বলের ঢেকুর তুলছে। খেতে বসে একজন গলায় ডঙ্কা বাজাচ্ছে। "ওরে কাঁচালঙ্কা দিয়ে যা।"

ওদিকে আরএকজন খেতে বসে বলে চলেছে,"ওরে, তোরা খাবারের শেষ পাতে সুক্তো দিলি? তার সাথে চাটনীর খাটনী। কব্জী ডুবিয়ে আমিষের পাতে খেতে দিলি না। একেই কি বলে ব্রাহ্মণ বিদায়?"

দোকানদার মৈত্রমশায়কে আবেদন করল, "খেয়ে যান স্যার। ইলিশমাছ ভাপে রান্না, না খেলে কান্না পাবে। ইলিশের ভাজা, ঝাল, টক, বাঙালের হাতে রান্না, ঘটিদের হাতে পরিবেশন সব আছে।"

এই কথা ঘোষণা হওয়া মাত্র খাওয়ার সুর কেটে গেল। সামনের সারিতে খেতে বসে এক বঙ্গতনয় পাত ছেড়ে হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল।— "দুর শ্লা, ইলিশটা আছে আগে জানলে রুইএর পায়ে মাথা খুটতাম না।"

মৈত্রমশায় চটপট উঠে পড়েছে। মন বসেনা কিছুতেই। ওর সাইকেলের চাকা

আবার চক্র কাটতে শুরু করল। লাটুবাবুর বাড়ি। সেটা একটা প্রাইভেট রেল স্টেশন। জংশন স্টেশনের পার্শেল ক্লার্ক একদিন অবসর নিয়েছিল। রেলের নাট-বল্টু সমেত বিদায় নিল সে। স্বচ্ছন্দ অবসরের পাকা বন্দোবস্ত করল প্রাইভেট রেল স্টেশন তুলে। স্বাধীনতার আগেকার দিনগুলি কিংবদন্তির মতো। সারা জীবন খাটুনি গেছে। সুতরাং লেট জীবনে লাট হয়ে বসলেন। তাছাড়া কর্মের অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাবের



শাসন যেন। লাটুর বাড়ির সামনে লাল সবুজ রেলের সিগনাল। গৃহস্বামী বাড়িতে না থাকলে লাল আলোর চোখে নিষেধের আগুন জ্বলে। সবুজ আলো জ্বললে সুস্বাগতম। লেভেল ক্রসিংএর গেট আছে। বসতবাড়ির চেহারাটা অবিকল রেল স্টেশন থেকে ছিটকে আসা এক টুকরো অংশ। অবসর নেওয়া রেল কর্মচারির বিশদ চেহারা অভ্যাসে আর স্বভাবে স্বচিত্র হয়ে আছে বাসাতে। বাইরে রেললাইন পাতা আছে। লাটুর যাতায়াত সুগম করার জন্যে ট্রলিও পাতা। বারান্দায় রেলের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চ পাতা। দপ্তরের নম্বর লেখা আছে সাদা রঙের অক্ষরে। লাটুবাবুর বিকার নেই, সারাজীবনের কীর্ত্তি অক্ষয় করে রেখেছে। ইতিহাসের পাতায় লাটুর থাবা আজও বজায় আছে।

মৈত্রমশায় দরোয়ানের হাতে চিরকুট পাঠাল অন্দরে। স্প্রিং এর ঘোরানো দরজা ঠেলে লাটু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেরিয়ে এল। —"এখন সবে দেড়টা কিম্বা দুটো বেজেছে। টিফিন টাইমে আসার হুকুম নেই কারো। চেপে বসে থাকো বারান্দায়। ঘন্টি বাজলে ভেতরে আসবে। আমি হারামজাদা এখন জিরোবো।" লাটুর মুখে বর্মা চুরুটের সুখের টান আসন পেয়েছে।

লাটুর প্রাইভেট স্টেশনের সামনে বিচিত্র বাজার বসেছে। বাঁদরের খেলা, দেহের কসরৎ, ভাল্লুকের নাচ। হরগৌরীর ছবি বিক্রি হচ্ছে। ঝালমুরি, আইসক্রীম। নকল রাধাকৃষ্ণ, নকল ভীম সচল হয়ে ভিখ্যে চাইছে রং মেখে সং সেজে। রোদের প্রখর তেজ। মৈত্রমশায়ের চোখে ঘুম নেমে আসছে। হঠাৎ কানে এল, "তোর মুখে কালি, তোর মুখে কালি।" সামনে একটা আলকাতরা রঙের কিশোর শোর তুলেছে। শিল্পী ঝেঁকে বলল, "বটে, বটে।" ছেলেটি উত্তর দিল, "তরমুজের ফালি, তরমুজের ফালি, খাবেন নাকি?" রোদের তেজে বেচারার তরুণ মুখ কালি হয়ে গেছে।

মেমসাহেবের পটের ছবি বিক্রি হচ্ছে। মনে পড়ে গেল কমলা হাতে কমলির কথা। গ্রীক ভেনাসের শরীরে বটতলার ঢং। মাথায় দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনার গোলকে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিয়ে করার আগে ছেলেরা নিজেকে বর্বর ভাবে। তার সঙ্গে আত্মাভিমান। বিয়ের মুখে বউয়ের হাতে ভদ্রস্থ হওয়ার আগে নিজেকে অপ্রস্তুত অসহায় মনে হয়। সামনে বরফ বিক্রি হচ্ছে, মাথায় চাপালে কেমন হয়?

আচমকা সম্বিত ফিরে এল। ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, **spring and bring me that drink**। লাটুবাবু কলিঙবেল ভেঙে ফেলবে বুঝি। ওর হাতের বিরাট থাবা, থাবার গায়ে লোম আছে। দরোয়ান তেড়ে এল, শিল্পী ছুটে গেল ভেতরে। কাতর চেহারায় সবিনয় নমস্কার জানিয়ে। ব্রিটিশ শাসনে রেলের জমিদারীতে বিশাল আরাম কেদারা থাকত। লাটু বসেছে সেখানে। বেশ একটা দামি পোজের ঢং করে। মুখে সেই বর্মা চুরুট যেন রেলের ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ছে। মুখটা রক্তাভ, যেন ইঞ্জিন গরম হয়েছে, এক্ষুনি বাষ্পের স্টার্টে টপ গিয়ারে পলাতক হবে। ওর একটি দর্শনচিন্তা আছে।

নির্বিশেষে সকলকে সে হারামজাদা গণ্য করে।

—তুমি হারামজাদা কোত্থেকে উদয় হলে? রেল পুলিশের গোপন গোয়েন্দা কী? তাই যদি হও, পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এখান থেকে তীর্থ সেরে বিদেয় হও।

—আজ্ঞে, আমি শিল্পী।

—অ, সেডা তোমার জুলফি দেখে সন্দেহ হয় বটে। মাথায় বাবড়ি চুল লটরপটর, সেটাও তেলের অভাবে শুকনো, বাসি হয়ে আছে। তোমার আদুরে হাত-পা, রেলের মিস্ত্রির কাজে সুবিধে হবে না। হারামজাদা, তুমি চাল, কলা, মুলো সিধে নিয়ে বিদেয় হও।

—আজ্ঞা করুন আপনার ছবি আঁকি পত্নির সাথে। ইতিহাসে ছড়া হয়ে থাকবে।

—তুমি ইঁদুরের ছবি আঁকতে পারবে? গণেশের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে? তোমার ভবভীতি আছে কী? ভগবৎ-ভক্তি, ভাগ্যবানের সেটা থাকে। **God** বলতেই গদগদ। আমি ত্রিসন্ধ্যা হারামজাদা গণেশায় নমঃ উচ্চারণ করে হারামজাদা ইঁদুরের ক্যালেণ্ডারে মাথা ঠুকি। কপালটা বেজায় ফুলে গেছে। — ওরে ও গণেশা, হারামজাদা, আর্টিস্টকে জল আন, পান দে, বার্ণিশ কর। — বেয়ারা ছোটাছুটি শুরু করল।

—এই যা দেখছ ঘরদোর, কিছুই আমার না। সবটাই পাওয়া। যুগের হাওয়া। এর সবটাই ছিল রেলসরকারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রমরমা বাজার। রেলের লোহা-লক্কর, নাট-বল্টু, মামা-ভাগনে সবাই আসন তুলে হাঁটা দিল কালো বাজারে। চড়া দাম। মুনাফা ফেটে পড়ছে। প্রথম স্ত্রী গত হলেন। বড়কর্তা চোখের জল মুছে দিয়ে সান্ত্বনা দিল, "তোমার বিশয় সম্বল যা আছে, হারামজাদা, তিনবার বিয়ে করতে পার, তিনখানি নতুন বাড়ি, গাড়ি কিনে কেতাদুরস্ত জীবন কাটাতে পার। যেদিন রেল থেকে অবসর নিলাম সে বলল, লাটু, তুমি চলে গেলে ধ্বস নেমে যাবে।" আস্ত ইস্টিশন ভেঙে আধখানা চলে এল আমার হাতে। সরকার যৌতুক দিয়েছিল রেল মিউজিয়াম।

শোনো শিল্পী, তোমাকে কাণ্ডজ্ঞান শেখাই। সত্য, মিথ্যা বলে কিস্যু নেই। পবিত্র পাপী হয়ে ভগবানে বিশ্বাস ঠেকাও। দেবতা সকলকে প্রশ্রয় দেন। সিঁধেল চোর শরীরে তেল মেখে রাতে সিঁধের যন্ত্র হাতে ওলিতে গলিতে ছায়ার মতো মসৃণ হয়ে বেরোবে। গিন্নী অর্ডারের ফর্দ দিল। 'গয়নার বাক্স এনো। হেঁসেল থেকে ইলিশ মাছ এনো কপালে থাকলে। রান্নার বঁটি ভোঁতা হয়ে গেছে। পারলে আর একটা এনো। অন্যের বাড়িতে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়োনা।' — তবেই দেখ চোরের আত্মত্যাগী চেহারাখানা। পরনে নেংটি, শরীরে তেল ঝরছে। হাতে সিঁধকাঠি, কানে বিড়ি গোঁজা আছে। ভগবানকে ডেকে বলছে টিপ্ টিপ্ বুকে, 'শিব, শিব ঠাকুর। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করো, ছেলেপুলের মুখের দিকে চেয়ে এমন ছবি আঁকতে পার?

সেদিন রাতে মৈত্রমশায় সেই ছবিতে হাত দিল, লাটু সরকারের জীবনদরদি ছবি। শরীরে তেল, পড়নে নেঙংটি, মুখে চুরট, হাতে সিঁধ কাটার যন্ত্র। পাশে বসে আছে লাটুর দ্বিতীয় স্ত্রী। মাথায় ঘোমটা, গণেশের শুঁড়ের মতোই লম্বা সেটা। লাটু তাকে আবদার করে বলল, "তুমি হারামজাদা ঘোমটা খুলে বসো, তোমার ছবি আঁকবে যে।"

আমি তলাপাত্র

এক

লেকের জলে একটা ঢেউয়ের মাথায় আলো ছোটাছুটি করছে। কিষাণের ঘামঝরা ক্ষেতে যেন সোনাঝরা ফসলের অভ্যুত্থান। মনের ভেতরে সেই আলোকযান ঢুকে পড়েছে। নিস্তব্ধতার বিলম্বিত লয়ের তান কানে বাজছে। তারা-ঝরা স্বপ্ন-সম্ভবা সেই গহন সুর। একান্ত আপনার। অন্য ভূবন থেকে আসা। সব সুর যেখানে গিয়ে মেশে, সেখানে অশ্রুবেদনা ছোঁয়া। এই মুহুর্ত্তটা লেকের জলের মতো টইটম্বুর। পয়োধি-উজার বর্ষার জলে অভাব নেই কিছু। হাওয়াতে ঘাম শুকিয়ে গেল। বেশ একটা বিশুদ্ধ talcum cosmetic নিবিষ্ট রেশ। পিঠের পেছনে আছে খেলার মাঠ,— যেখানে বিহানের বেলা ফুটবলের আসরে তেরঙ্গা পতাকা উড়ত। বেলা, অবেলা কত ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। সেদিনের ছোঁড়া আজ সংসারে ছড়ি ঘোরাই। একা বসে ব্রজের স্মৃতির লাটাই ঘোরাই। রবিবার সন্ধ্যা আজ। কাল অফিসে মাইনে পাব। সেই দিনটা পাকা জহুরীর মতো জামাই আদর চেহারা, চোগা-চাপকান। অফিসে কামাই নেই, আছে মনের ভেতরে কামাই। এই জলের ধারে যদি ঠিকানাটা বাঁধা থাকত? টিকে থাকতাম ভেলাতে চড়ে নির্জন অবকাশে। চিলের মতো নিজের চারণভূমিতে চড়ে বেড়াতাম। ধর্মের কল তোমাদের সংসারে বিকল হত না। তোমার পথ হাঁটা নিরাপদ হতো। তোমাদের কম ক্ষতি হতো, ব্যাথার বেদনাতে। এতদিন বেগুনের ক্ষেতে নির্গুণ সাধনা চালিয়েছি। আরে ছ্যাঃ, মাথার ওপর কাকের নির্বিচার আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়ল পুচ্ছদেশ থেকে। সরে বসলাম। রসভঙ্গ হলো।

পাঠকের দরবারে লেখকের নিতান্ত খুঁটিনাটি ব্যাক্তিজীবনের খরকুটো অরণ্যে রোদন যেন। বাপু হে, essay লিখে চলেছ। স্কুলে ক্লাসের খাতায় লিখতে যদি, জলপানী পেতে। আজ বিদায়ের পাতায় জীবনের আগাম আদায় লেখা থাকত। এই সব ছিঁচকাঁদুনী বাল্যরসে ভরা, বালখিল্যতা— মাইরী ভাল লাগেনা। জীবনের ঝাঁঝাঁ- রস চাই। তোমার কাঁধে সযত্ন চাদর, ভাঁজ ভাঙা পরিপাটি চেহারাখানা ভরাডুবি হবে। তার চাইতে ঘটনা বলো, দুর্ঘটনা হলে আরও ভাল হয়। প্রথম বলেই কলমের ছক্কা হাঁকাও। টক ঝাল আমিষের স্বাদ পিঁয়াজ-রসুন, সব যদি

থাকে, তবে বলো খেতে বসি। গল্পলেখা অসী যুদ্ধ। ক্রুদ্ধ পাঠকের চোখে লেখকের বুদ্ধ-প্রতিমা চেহারাখানা বেয়ারা ঠেকে। এত সংযম ছেড়ে, বেহিসেবি বেআব্রু কথা বলো। অযথা গৃহিণীপনা করোনা। প্রেয়সী কি নেই?

গল্প লেখার হরেক সমস্যা। পাঠকের দাবী ঘটনা ঘটা চাই। পাঠ্যপুস্তক তারা পড়তে চায়না। ঘটনা যদি নেই, তবে ঘটা করে শূণ্য ঘড়ার জল কেন ঢালছ সম্পাদকের উত্যপ্ত শিয়রে? তার চাইতে বরফের চাহিদা বেশী, যুগযন্ত্রণার প্রশম হয়। প্রত্যাশা যেন ঝড়ের মতো। রয়ে সয়ে আলাপচারিতা চলবেনা।

গল্প লেখার হাতেখড়ি হয়েছিল ঠাকুমার মুখে শুনে। নাতনির মাথায় ব্রহ্মদৈত্য চেপে বসে আছে। আবদার করছে, ঘটনা বলো। ঘটনা হল কিনা কাহিনীর অস্থি, মজ্জা। সেই হাড় চিবিয়ে নাতনির অশান্ত মেজাজ প্রশান্ত হয়। কোন ভুমিকা নয়, নয় কোন গৌরচন্দ্রিকা। তন্দ্রা আসার আগে বলো শেষে কী হয়েছিল ? ঠাকুমা সেদিন স্বখাতসলীলে। ঠাকুমার জীবনে পূর্বাপর সব ঘটনাই ক্ষুদে মেয়ের জানা হয়ে গিয়েছিল। তবুও জানালার ধারে শিক বেয়ে বাঁদর খেলছে। — আরো কিছু বলো। সাধারণ মানুষের জীবন বড্ড ন্যাড়া। থোরভরি খাড়া, খাড়াভরি থোর। এদিকে ঠাকুমার অন্য সমস্যা। ঠাকুমা সুদে আসলে বাড়ছে। বাড়ছে শ্রোতার সংখ্যা। বেজুড় সংখ্যা ভালো লাগেনা। তাই নাতি কোলে এল। সবে সে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। হামা দেয় আর ক্ষ্যামা দেয়, গুবড়ে পোকার মতো উল্টে গিয়ে চিৎপাত শুয়ে অসহায় হাত পা ছোঁড়ে। কোনমতে মাদুরে সাঁতার কেটে তার বাঁদুরে শরীরটা এসেছে ঠাকুমার আদুরে কোলে। নাতির দাঁত নেই একটাও, অথচ তার হাসি দিগন্তবিলাসি, বিশ্ব - ব্রহ্মাণ্ডকে মুখে পুড়ে দিতে চায়। শিশু ভোলানাথ। সব কথাতেই হাসে, সব গল্পই সার্থক তার কানে।

ঠাকুমার জীবনে লুকানো ইতিহাস ছিলনা। নেই অঙ্গসজ্জা। নেই মলাটের বাহারী বিলাস। শুধু লন্ঠন ছিল। আর জ্যোৎস্নার আলো। বৃষ্টির দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ষার রাতে সব গল্প ফেলে রেখে গেল। অসমাপ্ত রেখে গেল নাতনির আবদার। এমন লেখক কটা আছে, যার কাছে এমন পাঠক আছে, যার নাতনির গল্পের দরকার আছে? স্বাতি নক্ষত্র অতিদূর কক্ষ-পথে তাকিয়ে আছে। ঘুমন্ত সংসারে অঘটন বিলাস কৈ?

একবার কী হল? রোখ চেপে গেল। বড় সাধ, কবিতা লিখি। ইংরেজিতে ঝাঁঝাঁ বুলি ঝালিয়ে দেখি। সাহেবদের পিঠে ঝাল ঝেড়ে প্রাণটা জুড়োক। ভাষার মাথায় হ্যাট কোট পড়াই। মুখে yankee বুলি। উচ্চাঙ্গ সুরে উচ্চারণ করতে গেলে পাঠকের শরীরটা টম্ টম্ বন্দুকের গুলির মতো ঝম্ ঝম্ করে উঠবে। (সম্পাদক বলল, এই বই ছাপলে বই প্রতি পাঠকের হাতে ডিক্সনারি ফ্রি তুলে দিতে হবে) । রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি পরীক্ষার প্রবেশিকা পাশ করলেন না। তবুও ওদের ভাষায়

লিখে নোবেল প্রাইজ তুলে নিয়ে পরাধিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন। ইংরাজ সমাজ ধাঁধায় পড়ে গেল। একি কবিতা? নাকি বিদগ্ধসমাজের বিরুদ্ধে কপট রসিকতা ? He had the last laugh perhaps ...। কিংবা আমি যদি মাইকেল হই, ইংরাজি ভাষায় লিখে নির্গুণ ললাটে বিষয়-আশয় বানাই। হানা দেই বিদেশের পাকা ধানে। ধন, ধান্যে পুষ্পিত সৌরভে জাতে উঠি। সকলকে ধমকে বেড়াই? ভাগ্যের খোঁজে ওই পথে যাওয়া সুচিন্তিত রেওয়াজ। সাহেবের ভাষায় রস আছে, আছে পরিপক্ক জ্যাঠা রসিকতা। আছে কষের কশাঘাত। আমিষের ভাগ যেন বেশী। কথায় বলে white man's burden। সাদা চামড়ার বৃষস্কন্ধে সভ্যতার নিম্নগামী চাপ। দেখেছিলাম বটে, ধর্মের ষাঁড় মন্দিরের সামনে প্রস্রাব করছে। ঘড়ি ধরে দশ মিনিট, তার পর শেষ ফোঁটা পড়ল। ধার্মিক পুরোহিত আঁজলা ভরে যৎকিঞ্চৎ ধারণ করল। মাথায় ছিটোলো তাকে—গঙ্গা জলের মতো গণ্ডুশ পান করে বসল। তারপর চটপট হাঁটা দিল বসুন্ধরার বুকে চপেটাঘাত করে। ষোড়শ উপাচারে লক্ষীর পূজো উপোস করে আছে পুরোহিতের জন্য। পরহিতে পরচর্চা করতে হয় পুরোহিতকে ।

আর এক দৃশ্য। কলকাতার বন্দরের গঙ্গার ঘাট। ইংরেজ পরিবার স্রোতের মতো দেশে ফিরে যাচ্ছে। ভারত সেদিন স্বাধীন হয়েছে। নৌকার মাঝি দেখে চলেছে সেই দৃশ্য— সাহেবরা কদম ফেলে জাহাজে চড়ছে। এক সাহেব, ডাকা-বুকো চেহারা, মুখের চেহারা বুলডগের মতো, ডাঙাতে প্রস্রাব সারল। সারতে গিয়ে সূর্য প্রায় ডুবে যায়। মাঝির চোখ ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে। Discharing white man's burden। স্বদেশে যাওয়ার আগে বিদেশে রেখে গেল।

ইংরেজি কবিতায় হাত্ দিয়েছিলাম। বিশুদ্ধ অসৎ ইচ্ছায়, যথেষ্ট অসংযম করে শেষে আমার কবিতার সঙ্কলন জন্মের সকাল বেলা সূর্যের আলো দেখল। তারপর কাব্যটি অনাদরে ধুলোতে ধূসর হল। অভিমানে জখম হলো মানী কবিতাগুলো। সবার হাতে কপি তুলে দিলাম। পাইকারি সই লিখে, সবিনয় নিবেদন ইতি।

বন্ধুরা সাবাস জানালো, কিন্তু আমার কবিতার পাতায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। ধারাবাহিক উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর ইতিহাস। কেউ পড়ে না, পড়লেও হৃদয়ে মাখে না কেউ।

কেন এমন দৈন্য দশা ? গোড়ার কারণ। কাব্যের মেনুতে দুর্ঘটনার রামধেনু নেই। নিরামিষ পাতে রাবিশ কারো মুখে রুচি হয় না। শুধুই গাছপালার পালাগান কবিতায় বর্বর ঠেকে। নিরামিষ অন্নের এ শুধুই গরুর মতোই জাবর কাটার ধ্যান। কোন কাটা ছেঁড়া নেই, নেই চমক অথবা ধমক। বিশুদ্ধ বনস্পতির সরল জীবন। কারো বুদ্ধির গোড়ায় চিত্তশুদ্ধি করে না। পিত্তদোষ হয়।

কেন এই কাব্যের হাতে আমার বৈধব্য দশা ? ঠাকুমার কথা মনে পড়ল।

ঠাকুমা নাতনিকে কোলে দোল দিচ্ছে, তার সাথে রামরাবণের গল্পের দোলন দিচ্ছে। নাতনি কান পেতে তাগ করে আছে যুদ্ধের গোলাগুলি শোনার জন্যে। যত সৈন্য মরে, যত শত্রু বাড়ে, নাতনি ঠাকুমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে নিদ্রার আয়োজন করে। দুঃখের অভিযোগ করে লাভ নেই। গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার গল্পের সাথে নাতনীর মতো বান্ধবী-পাঠিকা নেই। তাই আজ স্থির করেছি, পাঠককে অত্যাচার করবনা। আমি কাগজের বুকে কলম চালাই। আমি কাগুজে বাঘ। নিজের হাতের সম্মার্জনীতে নিজেকেই উত্যক্ত করে তুলেছি। সাহিত্যের মুটে-মজদুরি, ব্যাগার খাটাতে অরুচি ধরেছে। কাহিনীর কারখানায় আপন অভিরুচি চলেনা। পররুচি অনুযায়ে পরহিতে পরচর্চা করতে হয়। পাঠকের নানান বাদ-বিচার আছে,ভেদাভেদ জ্ঞান তার টনটনে। নিজের দুঃখে কাতর হয়, লেখকের দুঃখে অশোকের মতো বীতরাগ হয়ে থাকে। অন্ধগলিতে রন্ধ্রের ফাঁকে কেন যে ফাঁপরে পড়লাম?

স্কুলে কাঁচা বয়সে কবিতার পাকা রস চেপে বসেছিল। মনে পড়ে কয়েকটা যুগান্তকারি পঙক্তি লিখেছিলাম যথেষ্ট রসনা দিয়ে।

"আজ এই রাত্রি-মধুরে,
বাতাস সুখে,
তারাপথে তারাপীরের ব্যাকুল নীলিমায়,
স্বপ্ন টুটেছে,
মন ছুটেছে, দৃষ্টি অপলকে জাগিরে।"

শেষের লাইনে বেশ একটা সারা জাগানো হা রে রে রে ছন্দবিলাস ছিল। কেন জানিনা কাব্যের কমল বনে রস যতটা জমেছিল, পরীক্ষার তহবিলে নম্বর সেই অনুপাতে অনাদায় রয়ে গেল। Poetic injustice। পরীক্ষাতে ফেল না করতে পারলে সাহিত্যের এভারেস্ট scale করা যায় না। রাশ ছাড়া রসের গোঁয়ার্তুমি ছিল যত, ততটা ছিল ব্যাকরণের হটকারিতা, বিশেষতঃ বানানে ভরাডুবি হয়েছিল। তাই আজকাল ব্যকরণের স্বজনপোষণ বিশেষ মানিনা, বানানকে নড়ে চড়ে সরে বসতে বলি আমার অভিরুচিঅনুসারে। সাহিত্যে বীরবল হব অভিসন্ধি ছিল, তলাপাত্র হলাম।

এদিকে সেদিন স্কুলে ইংরাজি স্যার উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। তোমরা আদা নুন খেয়ে রাত জেগে গল্প লিখে আনো, তবেই ইংরেজী ভাষাতে সরগর হবে। সুতরাং ক্লাস জুড়ে এক গণ প্রয়াস উপন্যাস কামড়ে ধরল। ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো গভীর রাতে সংলাপের বিলাপ শুরু করে দিল আমার পড়ার ঘরের কোণে। স্বপ্নে দেখছি সেখানে স্বয়ং সেক্সপীয়র আমার খাতা জুড়ে নাটকের কাটা ছেঁড়া করছে। পাতা ছিঁড়ে তাল গোল পাকিয়ে তাচ্ছিল্য করে ফেলে দিচ্ছে। পছন্দ হচ্ছেনা বোধ হয়। আমি হামাগুড়ি দিয়ে কাগুজে বাঘের মতো পরিত্যক্ত

পাতায় থাবা বসাচ্ছি। কাল সকালে এই সব টোকাটুকি করে মাস্টারের সামনে টিকে থাকব। এই বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকের হাতে রক্ত নদীর ধারা চলতি কালে অক্ষুন্ন না রাখতে পারলে পূর্বসুরীর আত্মত্যাগ বৃথা যায়। তাই আমার খুদ্র শক্তি দিয়ে খন্ডযুদ্ধ চালিয়েছিলাম স্কুলের খাতায়। ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায়ে নুতন নায়ক পেশ করতাম, হিরোইনের সঙ্গে গেরো বাঁধবার জন্যে। ক্ষীপ্ত ডায়লগ ছিল তার, সংক্ষিপ্ত আয়ু। দুই পাতা পরে এসে আমার হাতে ধরাশায়ি হত সে। জীবনের দরাদরি তার শেষ না হতেই ইতিহাসের পাতায় ছুটি দিতাম তাকে। পরের অধ্যায়ে নুতন নায়ক আসে, আবার তাকে নিয়ে কাটা ছেঁড়া করি। ঝাঁকে ঝাঁকে আসত তারা বহ্নিময় কামনা নিয়ে, কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী ছিল। এই বিয়োগান্ত করুণ উপন্যাস লেখার খবর পেয়ে ইতিহাসের স্যার নাম রেখেছিল 'ছেঁড়া তার।' বেশ ভারিক্কি নামখানা। বয়স্কদের মতো বয়স্য মনে হত নিজেকে। উপন্যাসের খাতা জুড়ে চরিত্রদের হাড়গোর পড়ে আছে। কিন্তু নায়িকার শরীরে হাত তুলিনি কখনও। তরিবৎ সুস্থ শরীরে শরীফ মেজাজে রাখতাম তাকে। ব্যাপারটা ছিল মনস্তাত্বিক। নায়ক, নায়িকা লেখকের মধ্যে হয়তো ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ চলত। পৌরুষের হিংসার জ্বালায় পুরুষ চরিত্রদের শিকার করতাম। হয়ত মেয়েদের বোঝার বয়স তখনও আমার হয়নি। সুতরাং তাদেরকে নিয়ে কাটা ছেঁড়ার বুদ্ধি—বিলাস তখনও পেয়ে বসেনি।

স্কুলে তাই গল্প লেখায় ঘটনার অভাব ছিলনা। ঘটনার ক্ষীপ্র হস্তান্তর চালাতাম অন্যের লেখা থেকে। মাস্টার সেদিকে তাকিয়েও দেখত না, ভাষা মেরামতের চর্চা চালিয়ে যেত। ভাষা চর্চার বৈষয়িক দিকটা কড়া নজর রাখতেন। যেটা ভবিষ্যতে টিকবে। বোধকরি তাঁর জানা ছিল ধার করা বিদ্যের আগামী সম্ভাবনা কিছুই নেই। যতই কেন নকল গোঁফ পড়ে হালুম হুলুম করো, আর মাস্টারকে জুলুম করো — তুমি বকলস্ পড়ে ক্লাস ঘরেই বাঁধা থাকবে। সংসারের গোলক ধাঁধা দেখনি তো। পরে টের পাবে, যখন দেখবে তোমার চাইতে বড় তাবড় পণ্ডিত সাহিত্যের পাঁকে কাদা হয়ে পড়ে আছে। সত্যি তাই হয়ে দাঁড়াল। সংসার ঘটনাবিহীন হল। পকেটের রেস্ত কমে এল। শিয়রে টাক বেড়ে গেল। — সময়ের দীর্ঘায়ত ছায়া। ব্যাপারটা এমন — নাকের বদলে নরুণ পেলাম টাক ডুমাডুমডুম। অর্থাৎ কিনা গল্পের ভুগোল ভণ্ডুল হলো, হাতে রইল কলম। নষ্ট সুর, তাল-বেতাল, ভণ্ডুল তান। জীবনের লোটা কম্বল সম্বল মাত্র। তাই পরিহাসের মলম বুলোই ক্ষতের বেদনাতে। অম্লরস, খানিকটা ঝাঁঝালো। ... ডুবে ডুবে জল খায় পাতি হাঁস। মঙ্গল-শনি লেকের জলে সাঁতার কাটি। গ্রহের কপট দৃষ্টি এড়াতে। গল্পের গুগলী ওঁত পেতে আছে জলের তলায়। তাকে দেখে বরঞ্চ চিন্তার দিগন্তবিলাসি হওয়া যায়। যদিও সে জাতে যৎকিঞ্চৎ খাটো। কঠোর কঠিণ সত্যের

জটিল প্রশ্নের গুগলী দেখনি তো? বার বার ফেল মেরে আউট হয়ে যাবে। আউট! পরাস্ত সৈনিকের কানে তড়িতে বাজ ডাকল। এত তাড়া কেন, ত্বরা কিসে? খানিক সবুর করো। এখনও ঘাসের বুকে শিশির শুকোয়নি তো?

লেকের জলে সাঁতরাই, আর জীবনের তপ্ত সন্তাপে কাৎরাই। জলের সঙ্গে আকাশের কী সম্বন্ধ ? যেন ঝেঁপে বৃষ্টি নাবছে। যদি ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করতে পারতাম?

দুই

ঢাকুরিয়া লেকের ধারে জীবনের একটা অধ্যায় কেটেছিল। এই জীবনের চলতি বিলাস বাসা বেঁধেছিল লেকের আনাচে কানাচে। বয়সটা ছিল যেন চারাগাছ। অথবা আগাছা-ছাগলে যা মুড়োয়। বস্তু জীবনকে অবহেলা করতাম। একটা বায়বিয় চিন্তার মায়াজাল তারামণ্ডলে আবহসঙ্গীত শোনাত। এক ক্ষীণজীবি হেঁয়ালি প্রতিভা প্রতিষ্ঠা করার পেছনে রসসাহিত্যের দরবেশ হয়েছিলাম। রসের ভাঁড় উপচে পড়ছে। শুধু লেখালেখি করে ললিত ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া যাচ্ছে না। তাই শাখা মেলে এলাম ছবিতে।... লেকের ওপরে সাঁকো পাড় হয়ে জনস্রোত বয়ে চলে। তার নিচে জংলা জমিতে বসে জলের কোল ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হয়ে তন্ময় ভাবে স্কেচ্ করে চলেছি। আঁকি, আর বার বার মুছি তাকে। রবার ঘষার শাসনে ছবিটা মৃগীরুগীর মতো ছটফট করছে। ছবিতে কবিতা খুঁজছি। আকাশের রোদ কটকট করছে। কিছুতেই মর্জি মতো হচ্ছে না। দুইয়ে মিলে দন্দ, হয়ে দাঁড়াচ্ছে "ছবিতা" ... বেলা বয়ে গেল। আকাশে মেঘ জমলো। হুঁশ নেই আমার জগতের দিকে। ছবির সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করে জলের আরো ধারে গড়িয়ে এসেছি। ভরাডুবি হওয়ার আগের অবস্থা। লেকের জলে জীবনের তলাপাত্র ভরাট করার চেষ্টা। আজ আমার একদিন, ছবির দুর্দ্দিন, হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব।

খেয়াল নেই ইতিমধ্যে আমার পেছনে উঁচু জমিতে একটা ছোটখাটো ভীড় জমে উঠেছে। জনতা বিচার করছে আমাকে।—" এতই যদি ছবি আঁকার শখ, ছোকড়া পণ্ডশ্রম না করে পড়াশোনায় মন দিলে সংসারের উপকার হত। সখের পেছনে যত্ন দেখে বাঁচিনে।" কে যেন বলল অন্যজনের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

—ছেলেটা ছবি আঁকছে নাকি জলের সঙ্গে কেলি করছে। আত্মহত্যা করবে নাকি, ঝোঁকের মাথায় ! ওফেলিয়ার মতো ভেসে যাবে জলে, লটকে থাকবে লতায় পাতায়।

—আজকাল এমনটা হচ্ছে বটে। বিলেত যেতে না পাড়লেই লেকে আসে

আর জলে ডোবে। জলের মতো জীবনের তরল সমাধান।

—জোয়ান বয়সে কোথায় ব্যয়াম করে ব্যারাম সারাবে, ফুটবল খেলবে, জীবনটাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, তা না, পৌরুষ হারিয়ে কেঁচে গণ্ডুষ করতে বসেছে। মহাত্মা গান্ধি বলেছেন দেওয়ালে আঁচড় কেটে যা, কীর্তি রেখে যা।— আরেকটা মন্তব্য শোনা গেল।

—কথাটা বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। গান্ধি টুপি, কংগ্রেসি নির্বুদ্ধিতা কতদিন চলবে? আরেকজন ভুলটা সিধে রাস্তায় ঘুরিয়ে দিল।

—অ, ভুল বলেছি বুঝি ? কিন্তু তুমি মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে রমাপদ কবিরেজের ব্যাটা না ? চেনা চেনা ঠেকছে যেন। কোবরেজ হতাশ জীবনে আলোর বটিকা দেয়।

—আজ্ঞে কাকাবাবু, আপনি ঠিক চিনেছেন। আমার অপরাধ নেবেন না।

—ওই জলমগ্ন ছেলেটাকে রাজনীতিতে ভিড়িয়ে দাও। ফ্রাসটেটেড ক্যারেক্টার মেকস্ party's ট্রাসটেড ক্যাডার।

ইতিমধ্যে জনতার ভীড়ে মশলামুড়ি, আইসক্রীম বিক্রি হচ্ছে। চা খাচ্ছে কেউ, চৈতন্য উদ্রেক করার প্রয়োজনে। আয়োজনে অভাব কিছু নেই। এও এক ঘটনা। এক রত্তি ছেলেটা জনতার উত্তেজনার অনুপ্রেরণা। কে যেন গুরু গর্জন করে উঠল—

—কান ধরে তুলে নিয়ে এসো ছোকরাকে। পুলিশে ধরিয়ে দাও। পিতার নাম ভুলিয়ে ছাড়বে।

—সাবধান, ওই কর্মটি করবেন না। কাছে গেলে কামড়ে দিতে পারে। হাড়ে বিষ আছে।

জনতা তাকিয়ে আছে শকুনের মতো। ফিরে যাবার তাড়া তো নেই। কোথায় ফিরবে? ফেরার রাস্তায় ভীড়ের ঘাম আছে, এমন দুর্ঘটনা তো নেই? ছবি হলোনা, শুধু গল্পের জিজ্ঞাসু পাঠকেরা সেই দিন আমার কথা শুনতে চেয়েছিল। টেনশন ছিল, অতএব মেনশন করবার মতো উপজীব্য আজ পেলাম। যেদিন পৃথিবী ছেড়ে যাব, তোমাদের কাউকে ক্ষমা করবো না। বরঞ্চ ক্ষমা-মার্জনা চাইব। আমরা সকলেই জাত শিশু, যতই বজ্জাত হই।

... সংক্ষিপ্ত কাহিনীর ইতিকথা আজও রেশ টেনে চলেছি। নেই নেই করে বেশতো নাতিদীর্ঘ কাহিনী জমলো। ঘটনার গন্ধবিলাশ শুঁকতে শুঁকতে জীবনে সন্ধ্যা হলো। শেষে এলো আজকের দিন।

কলমের কারিগরী দিয়ে ছদ্ম জীবনের পুতুল খেলা। কলমের অসি দিয়ে মসীমাখা কায়াহীন ছায়া-শরীর, মানুষ-পুতুলের কাঁদা ও হাসা সেই শাসনে বাঁধা। অথচ লেখক নিজেই অদৃষ্টের শিকার হয়। লিখতে ভাল. অন্যের আঘাত চাখতে

ভাল, গাইতে ভাল। কিন্তু নিজেরটা সইতে ভাল লাগে কী ? জীবনের গরল দিয়ে প্রবৃত্তির আগুনে রসের ভাঁড় জাল দিই। ভাল দিয়ে সাহিত্যের আলো জ্বলে না। জীবনের কালির সাথে কোলাকুলি করেই সংস্কৃতি উর্বর হয়। বিচিত্র মানব চরিত্র, আগুন নিয়ে খেলা করছে। পালা ভাঙার পালা শুনতে চায় সে। — এক তাণ্ডব নির্বুদ্ধিতা, চন্ডাল স্বভাব। এমনিতেই হাড়ে হাড়ে জ্বলছ, আবার সেই উত্তাপে গল্পের বিনুনি পাকিয়ে পাঠকের হাড়ে বাতাস করছ। স্রষ্টা নিজেই বদখেয়ালী।

একেই কী বলে সভ্যতা ? বদাচার বিনা রইস্ পাঠক আনন্দবাজারে পা মাড়াবে না। বিনা হাড় গোড়ে সাহিত্যধর্ম রক্ষা হয় না। পরহিতে পরচর্চা করতে হয়। ধরণী দ্বিধা হলেই, তবে কিনা সীতা তুমি, সতি হবে।

তিন

এককালে ঢাকুড়িয়া লেকের অদুরে আমার এক আদুরে সজ্জা ছিল। মামার বাড়ি। সেখানে শীতের রাতে বেহালা শোনা যেত রাত দশটার পরে। ঘুমের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করত সেই বেহালার সুর। যেন রাস্তার অলিগলি, বাসার রন্ধ্রে সঙ্গীতের জোয়ার-ভাটা মন্দ্রিত হচ্ছে। আকাশ ভেঙে তারার সংবাদ ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। বেহালা বাদক নির্জন রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় একা। জাতে সে ডোম, শরীরটা কালো যেন আলকাতরা মাখা। তার বাসার ঠিকানা শ্মশান ঘাট। পরনে পুরাতন প্যান্ট-সার্ট জীর্ণ নেকটাই।

যেখানে দাঁড়িয়ে সে বেহালার ছড়ি টানছে তার পেছনে একটা তেতলা বাড়ি। হাইকোর্টের জাঁদরেল উকিল থাকে সেখানে। প্রায় রাতে তার আর্তচিৎকার শোনা যেত, স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে। — "বলি বপুলা (অর্থে বিপুলা) তুমি আমারে মেরোনা, কিলায়ওনা, চিমটায়ওনা বলছি। ওরে ফাদার ! বঁটি হাতে দর্শনধারি হলে ? সাবধান, ফৌজদারি মামলায় জড়ায়ে যাবে। "— বেহালার গতি অব্যাহত হয়ে আছে, যেন শ্মশান বৈরাগ্য পেয়েছে। বেহালা নক্ষত্রের সমান নিঃসঙ্গ বৈরাগী। নক্ষত্রের সমান ক্ষত্রিয় সে।

গল্পের গোড়ায় ফিরে যাই। লেকের জলের ধারে বসে চিন্তার ঘুড়ি উড়িয়ে ছিলাম। কাহিনীর খোঁজে বেড়িয়ে ছিলাম সময়ের পেছনে। এখনও বসে সেই স্থানে। উঠে পড়তে মন চাইছে না, ছোটাছুটি করবার বাসনা নেই। সময়টা মুর্ছিত হয়ে আছে। হঠাৎ একটা মোটরগাড়ি আমার পেছনে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। এক মুহুর্তের জন্যে হেড লাইটের আলো লেকের জলে আছড়ে পড়ল। আলোর হাতে সনাক্ত হলো জলে ভাসছে এক মরা। ওকি, চোখের ভুল নয়তো? মুখখানা

অবিকল সেই বেহালাদার।

ব্যাস্ত হয়ে, প্রায় তড়িত পায় হাঁটা দিলাম বাড়ির রাস্তায়। রাত দশটা। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়াতে ঝড়ের সংকেত ঘটনা ঘটে গেছে। রেডিওতে আকাশবাণীর খবর শোনা গেল —“আজ রাতে বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে।”

রূপকের বাতায়নে—ছবি ও কবিতা

এক

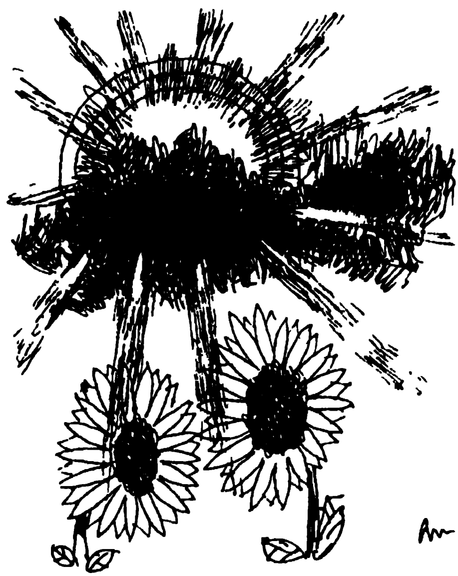
"You shall be a chaos in order to become a dancing star." একথা বলেছেন জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে। সৃষ্টির শুরুতে ছিল মহাপ্রলয়, ঘনিয়ে এল ঘূর্ণিঝড় আর বন্যা। এই ঘুর্ণির উন্মাদ তালে ক্রমে ছন্দিত হল অসংখ্য নীল তারার জীবনস্পন্দন। কল্পনা করা যায়, এই বিশ্বচরাচরের তুর্কী নাচন, মরণ-বাঁচন, তাল ও লয় আর কিছু নয় — এক বিতর্কিত উপহাস। Cosmic fun। দার্শনিক বলেন চিদানন্দের চঞ্চল লীলা নিখিল বিশ্বে নাট্যায়িত হয়ে চলেছে। বিধাতার সৃষ্টিসুখের উল্লাস লিওনার্দো ভিঞ্চি এক আবহমান রূপক ভাবনা। শেক্সপীয়ার বলেছেন, স্কেচের প'রে বার বার নতুন রেখার আবর্ত টানতেন। যার ফলে রেখা থেকে রেখান্তরে, ভাবনা হতে ভাবনান্তরে চিন্তার পট পরিবর্তন হয়ে চলত। আদি বিশ্বের এই **chaos** বা জটিলতা বিস্তারিত হত ছবির ওপর। সেই রেখার তুঙ্গস্থ তালে



শেষ পর্যন্ত ধরা দিত শিল্পীর ইঙ্গিত ছবি। চিত্রের তিলোত্তমা।

The metaphor of life betrays a bitter argument । কান্নাহাসির দোলা। Life is tears continuum, joy continuum। মাঝখানে এক হারানো সুর। সুখী মানুষও তার ছোঁয়া পায়। কারণ সুরের পেছনে একটা নিখিল মন আছে যা সকল মানুষকেই একটি মালায় গেঁথে তুলতে পারে। এলোমেলো অসংলগ্ন বিপর্যস্ত

জীবনকে গুছিয়ে তোলার বাসনা, ফেলে আসা দিন, নতুন করে বাঁচবার রসনা। জীবনের দুটি পা, তার একটি সংসারের কঙ্কর পথে হাঁটে, অন্যটা কল্পনার ডানায় পলাতকা। এই দুই চরণ ফেলে জীবনচর্যার গান। তাই বিবাদ লেগেই আছে। দুটি সমান্তরাল রেখা তবে মেলে কী উপায়? কল্পনার বরপুত্র রূপকের অসীম কক্ষপথে তারা আলিঙ্গন করে। Poetic vision। এই দূরত্ব অন্তরমুখী। গহন কল্পনার তলাতলে রূপক ডুবুরি। সেই জন্য ছবি ও সাহিত্য কল্পনা-সম্ভবা। As a mermaid that finds a swimming lad। কল্পনাশক্তির কূলপ্লাবী যৌবনের জোয়ারে সেই আশ্চর্য্য মৎস-কন্যার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়। শিল্পের অনুপ্রেরণা যৌবনের দূত—একথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। একই অঙ্গে দুটি ডানা মেলে পাখি যেমন ওড়ে, রূপক তেমনি দুটি দূরের জিনিসকে এক যাত্রায় সামিল করে।



আমাদের ব্যবহারিক জীবনও রূপকের সাজ পাল্টে চলেছে। Rainbow costumes। শিল্পের আসরে এই রূপক পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে রূপসাগরের তীরে চাঁদের হাট বসায়। Exploit of the unattainable realms। "এই নিকটে থাকা অতি দূর ব্যবধানে রয়েছে ঢাকা।" এই দূরত্বই রূপকের প্রাণ সুধা।

" আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি,
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারাবেলা...।"

"Love.
Her tall head in spring's ambitious attire.
sings her long notes. unslept in time.
for a final meeting in thc twilight kingdom
my flute is breathless. "

সে আসবে, তার জন্য আমার বাঁশী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। কবিতার রাস্তায় কার জন্য প্রতীক্ষা? রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ? অথবা রূপকের রাজার কুমার ? দেবতা রূপকেরই মানস-সন্তান। তার স্পর্শে গোধুলির সময়, বাদল আকাশ, আমার হৃদয়, মন একই মালায় গাঁথা পড়েছে, এক জোড়া পায়ের ছন্দের সঙ্গে ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের এই গানের পরের পঙ্ক্তিগুলিতে দেখা যাবে সমস্ত বনাঞ্চল এই আগমণির পূর্বাভাসে মানুষ-তুল্য শ্রবণ শক্তি লাভ করেছে, তারা বাঙময় হয়ে কানাকানি করছে, মানুষের মতোই তাদের কৌতুহল শিহরিত হচ্ছে। প্রকৃতিকে মানবোচিত চরিত্র দিয়ে তাকে জীবন দেবতার প্রতিক্ষার দ্যোতক করে তোলা রূপকের সহজাত ক্ষমতা। **Logos** কে জানাতে **mythos** এর কাছে ভাষা ধার করতে হল। **Fictive imagination** । এখানে সাধারণ বুদ্ধি প্রতিহত হয়। **Mythos** এর এই ইন্দ্রধনু **(rainbow aura)** না থাকলে মনের জানলা রুদ্ধ হয়ে যাবে। সভ্যতার উষাকালে এই **aura** আরো বেশী উজ্জ্বল ছিল, প্রগতির তীক্ষ্ণ আলোয় ঘটেছে **decay of aura** । **Transformational perception**। ভাবনা হতে ভাবনান্তর। অকুল সীমানাতীত বর্হিবিশ্বে ছুটে চলেছে চিন্তার আলোকবর্তিকা, যা সীমিত বাস্তবতাকে মহিমান্বিত করে। পৃথিবীর বুকে অপার্থিব রূপান্তর ঘটায়। **Surreal plane (Salvador dali** এক সংকীর্ণ অর্থে **surrealist** ছবি আঁকতেন—**dream psychology** বা স্বপ্নের অবচেতন জগতের ভাবানুকরণ ও চিত্রানুকরণ)।

রূপকের এক চমৎকার বাস্তবানুগ উদাহরণ আছে। সূর্যের বিশাল শরীর, তীব্র তেজস্ক্রিয় শক্তি তার। এদিকে কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এক কবি-সত্তা নেমে এল আকাশ থেকে শ্যামল মাটিতে। হল এক সূর্যমুখী ফুল। সূর্যের উদয় হতে পাটে যাওয়া পর্যন্ত এই ক্ষীণ প্রাণ ফুলটি তার চাহনী দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। উদ্ভিদ জগতের পরিভাষায় একে বলা হয় **tropism**। দুস্তর ব্যবধান পার করে দুটি অসম বস্তুর হাতছানি, মেলামেশা মিলন- বাসনা এক মৌলিক রূপক। শিশুমন **(genotype threshold of mind)** এই স্বপ্নরাজ্যে অবাধে যাতায়াত করে। মেঘের তরঙ্গে মনে মনে ছবি আঁকা, তারাকে অবোধ হাতছানি, চাঁদের দেশে চরকা-বুড়ি যেন তর্কাতীত সত্য। কিছু কিছু পরিণত মানুষের মনে এই অভিজ্ঞতা না-ভোলা বাণী হয়ে থাকে। রূপক সেই সবুজ অবুঝ মনেব বায়না ? .. আকাশ পেতে চাওয়া এক অদ্ভুত মনের ভাঁজ। কত কবি, শিল্পী যে

আকাশমুখী হয়েছেন তা চয়ন করে কয়েকটা বই হয়ে যাবে। হাজার বছর ধরে আসমান তার বিস্তীর্ণ বুক জুড়ে আষাঢ় মেঘের সমারোহ করে চলেছে এক প্রতিক্ষায়, কবে কোন মহেন্দ্রক্ষণে কবি কালিদাস আসবে, রচনা হবে মেঘদূত কাব্যখানি। সেই কাব্য রচনা হ'ল কল্পনার রঙে, বাষ্পের রেণু দিয়ে, স্বপ্নের আখরে। সঞ্চারী মেঘ হল যক্ষ ও যক্ষিণীর পলাতকা বিরহ সংবাদের আবহকালীন দূত। **Picture- poem**। ঝড়ের মেঘের হাতে চিত্রকল্পময় কবিতার ছন্দিত বাণী এক চিঠি যেন। কবি **Robert Frost** আকাশমুখী;

" Let chaos storm!
Let clouds swarm !
I wait for the form. "

কবি তার শৈশবের গল্প বলছেন, যখন মেঘ ছিল তার শিশুসাথী ? ঝড় ও মেঘের সংঘাতমুলক বিতর্কিত উপন্যাসের **plot** ভাবছেন কী ? কিংবা আকাশে ছবির আঁচড় কাটছেন; অথবা কোন ভাবমুর্তি ধ্যান করছেন ? **The sky for page, with the ink of life writes the august delight of the bird-mind** । এখানেও রূপকের প্রচ্ছন্ন চক্রান্ত। আকাশের **Olympian** গরিমায় রূপকের প্রসারিত ডানা। **From clouds to tumbling clouds we range**। রবীন্দ্রনাথও আকাশচারী বা আকাশমুখী। লিখছেন —

"মনে হয় আকাশপানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই অমনি এক মেয়ে,
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিভত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি,
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে হারিয়ে গেছি আমি।"

এক অদৃশ্য স্বয়ংক্রিয় শক্তি সৃষ্টিকে অটুট রেখেছে অলঙ্ঘনীয় বিধান দিয়ে। তাই চন্দ্র, সূর্য, তারা আপন কক্ষপথে চলে, পথ হারায়না। সৃষ্টি রসাতলে যায়না। জীবনের ছন্দের তালভঙ্গ হয়না। এই বিধান যদি লঙ্ঘন হত তাহলে মানুষরূপী মহাকাশ হাহাকার করে উঠত, সৌরজগতের আলো নির্বাপিত হত। এই কবিতায় এক বিশ্বচরাচরব্যাপী নিখিল রূপক সম্বল করে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার তলাতল আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সৃষ্টির নিত্যতা ও অনাসৃষ্টির অনিত্যতার মাঝখানে দাড়িয়ে বিজ্ঞানের এই ব্যাকুল প্রশ্ন।—ভবিষ্যত জীবন বাঁচবে তো?...আকাশের রহস্য অন্তহীন।

সূর্য যুদি লয় হয়, রূপকের গ্রাসে তবে কী হতে পারে ? চাঁদের আড়ালে সূর্য অন্তরীণ। পূর্ণগ্রাসের সময়ে পৃথিবীর বুকে তমসা চেপে বসে। প্রাণীজগতে তখন ত্রাস। পাখীরা বাসায় ফেরে। আকাশে তখন একটা উজ্জ্বল জ্যোর্তিবলয়,

তার চূড়ায় হীরের টুকরোর মতো এক তীক্ষ্ণ আলোর রেখা খোলা তরোয়াল যেন কোপদৃষ্টি দিচ্ছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ ঘনায়মান **catastrophe** র মুখোমুখি। কী প্রলঙ্কর সুন্দর সেই দৃশ্য ?— যাকে বিজ্ঞানীরা বলে **diamond ring** । তিমির আকাশে বসে সে হাসে পুষ্পের হাসি। **Beauty is the begining of terror!** সূর্য যদি আবার শ্বাশত হয়ে তার কক্ষপথে ফিরে না আসে ? **Doom'sday date** কী এসে পড়েছে? এক কোন রূপকের বলে পৃথিবীটা কীর্তিনাশার পথে ঢলে পড়ল? বিজ্ঞানের পাঠ যখন ছিলনা, মানুষের মনে এই ধরনের দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা নিশ্চয় হত।

দুই

এবার আকাশচারিতা ছেড়ে ধরায় আসা যাক। রোম্যান্টিক ধারার কবিরা রূপকের বিস্ময়কর প্রয়োগ করতে না পারলে খোঁড়া হয়ে যেতেন। শেলীর **"Ode to the skylark "** কবিতায় আকাশগামী এক পাখী হয়ে দাঁড়াল স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র। **"Ode on a Grecian urn"** (কীটস্) কবিতাটি মৃৎপাত্রের শরীরে এক চিরযৌবনা নারীর রূপ দেখতে পায়। প্রাণহীন পদার্থ হল জীবনসৌন্দর্য্যের অবিনশ্বর আধার। মৃৎপাত্রের ভেতরে যে শূন্য জায়গা সেখানে কবিতার চিত্রকল্প বর্ণনায় নারীর শরীরের অভ্যন্তর জায়গা, মানুষের আসা যাওয়ার সম্ভাব্য গর্ভস্থান। এখানে ছবি ও কবিতা রূপকের মঞ্চে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। মৃৎপাত্রের গায়ে নক্সা-কাটা জীবনকাহিনী অশেষ মাত্রা লাভ করে। সময় বিলীন হয়ে যায়। মাটির পাত্রের **attic shape** কবির চোখে সৌন্দর্য্যের শাশ্বত সত্য। **Beauty is truth , truth beauty**।

মানুষের চিত্র ভাবনা ও কথা সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে করুণ নিষ্ঠুর জীবন-যন্ত্রণা। এই এলেমেলো বেসুরো জীবনে রস পেতে হলে মনকে বীনার তারে টানটান করে বেঁধে রাখতে হবে। জীবনমুখী চেতনা ও সৃষ্টি সচেতন মন। পারিপার্শ্বিকতার তরঙ্গ মেখে নিতে হবে। টুকরো ঘটনা ও টুকিটাকি দৃশ্যমান চলমান জগত। শিল্পীর মনের কোটরে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সংগ্রহশালায় পৌঁছে যাচ্ছে। " পথে চলে যেতে যেতে কোথায় কোনখানে, তোমার পরশ আসে কখন কে জানে...। " খুঁজে নেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসের সজাগ অন্বেষণ শিল্পীরা করে এসেছেন। **Henry Moore** তার স্টুডিওতে এসব জড়ো করতেন। **"I put all the odds and ends that I have collected, pebbles, bits of bones and found objects, and so on, all of which help to give one an atmosphere to start working..."**। এই সমস্ত হঠাৎ

পাওয়া খণ্ড রূপগুলি ছোঁয়াচে হয়, সৃষ্টির মেজাজকে সাড়া দিয়ে যায়। এই ভাবে শিল্পীর কর্মোদ্যমের প্রস্তুতি, পরিণতি নয়। রাতের দীপ-শিখা জ্বালানোর আগে ভোরের সলতে পাকানো। শিল্পীর মানস কুঁড়ি। শিল্পকলার উপজীব্য আসে **from the rythmic cadence of everyday life.**

Henry James বলেছিলেন, **"As for the wind blown germs themselves, who shall say... where they came from ? We have to go too far behind... Is'nt all we can say they came from every quarter of heaven, that they are there at almost any turn of the road ? They accumulate, and we are always picking them over, selecting among them. They are breath of life, by which I mean that life, in its own way breathe them upon us. They are... floated into our minds by the current of life."** আকস্মিক পাওয়া এই সব শিল্পনন্দন জিনিস তাদের আপন হাতে সিদ্ধ, আকস্মিকতাই তাদের প্রাণের ঐশ্বর্য। এদের চেনবার জন্য রূপ-চেতনা দরকার।

রাস্তায় পরিত্যক্ত নিষ্প্রাণ জিনিস এক অদ্ভুত চোখ মেলে আমাদের দেখে। মনটা থমকে দাঁড়ায়। এরা মনের আকাশে মেঘের মতো চলতি হাওয়ার পন্থি। পারিপার্শ্বিক চলমান জগতের আর এক নাম **meandering field** । পাহাড়ি নদী বা ঝরণা যেমন লঘু ছন্দে ছোট মেয়ের মতো নৃত্যপরা লাফিয়ে চলেছে — চলাতেই তার আনন্দ, অনির্দিষ্ট গতি প্রকৃতি, কখনও পাহাড়ের কোলে দেখা দেয়, আবার আড়ালে লুকোচুরি খেলা। রবীন্দ্রনাথ কবিতার ছত্রে ছত্রে আঁকিবুকি করতেন। তাকে বলা হয় **doodles** অথবা **macaroni**। বাজে কথার ঝুড়ির মতো হাবিজাবি নক্সা কাটা। কবির পরবর্তীকালে ছবি আঁকার দিনগুলি এখান থেকে প্রত্যাশিত হয়েছিল। শিশুর দুর্বোধ্য রেখার প্রগলভতা এক সময় হয়ে দাঁড়ায় পূর্ণাঙ্গ ছবির ভাষা। পারিপার্শিক জগতের এক এলোমেলো গতি আছে। এরা **untamed shapes , untutored forms, born free**। এই খুঁজে পাওয়া রূপগুলি **vagrant tramp happenstances**। আধুনিককালে শিল্পধারায় নিয়ম ভাঙার চেষ্টা হয়েছে, প্রমাণ করার প্রয়াস হয়েছে **art has no history**। চলার গতিতে ছবি, চলার গতিতে কবিতা। দাঁড়ানো নয়, ঐতিহাসিক বর্তমানতা নয়, **Henry Moore** ভাস্কর্যের দৃষ্টিতে আধশোয়া শরীরে **(reclining figure)** ধরিত্রীর রূপ - ভঙ্গীমা দেখতে পেলেন। ভূলুণ্ঠিত গাছের শরীর তার হাতে হয়ে দাঁড়ালো আধশোয়া মানুষ। মানুষী গাছ, নাকি শাখায়িত মানব ? **Man- nature metaphor**। অবনঠাকুর ভাঙা কাঠের টুকরো আর কিছু খুঁটিনাটি ফেলে দেওয়া জিনিস জোড়াতালি দিয়ে কাটুম-কুটুম তৈরী করেছিলেন। এখানে খেলার উচ্ছল আনন্দ ও শৈশবের জীবনশতরঞ্চ।

At first a gift from chance's lucky hands,
then a man's little handiwork,
open to childhood's golden gates;
next a climbing down the steps of time
to where the rosemary bed was in nursery days.

কাটুম-কুটুম শৈশবের খেলাঘরেব প্রাণ প্রতিষ্ঠাব এক রূপক লীলা। বিখ্যাত উপন্যাসিক ভিক্তর হুগো কাগজের ওপর কালিবর্ষণ করতেন, সেই মষিলিপ্ত কাগজ ভাঁজ করতেন। ভাঁজ খোলার পর দেখতেন কালির বিচিত্র আকার ও বিকারের চেহারা। নিজের কল্পনার আল্পনা বুঝি সেই রকম। ছবির ও রূপের ইঙ্গিত দেখা যেত (যাকে বলা যায় **ink bloch psychology**), যাকে নিজের মেজাজে ভরাট করতেন, ওলট - পালট করতেন। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি পুরাতন



নোনা ধরা দেওয়ালের গায়ে দেখতে পেতেন মানুষের ভীড়, এমনকি যুদ্ধের ছবির আভাস। প্রাচীন চীনের শিল্পীরাও সেই মজা দেখত। মানুষের কল্পনার দৌড় রূপকের সোনার হরিণের পেছনে। তারপর সে নিজেই সোনার হরিণের কাছে ধরা দেয়। ঝিনুক কানে ঠেকিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের গান শোনা। **The magic role and wash of the coral seas**।

গাছের ডালের অবয়বে, তার বক্র ভঙ্গীমায়, জটের মধ্যে, ত্বকের স্পর্শে অনেকখানি ভাস্কর্যের লক্ষণ দেখা যায়। কেউ চোখের পিপাসা দিয়ে এসব খুঁজে

দেখেন। তাদের নয়ন শিল্পী বলা চলে। যাদের সংগ্রহের ক্ষুধা তাদের চয়ন শিল্পী বললে অন্যায় হবে না। তবে বস্তুগত ভাবনা জগতে হঠাৎ তরঙ্গ তুললেও সে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। আপন মনের মাধুরী **(Transformational perception)** মিশিয়ে সেই নবোন্মেষিত ভাবের তরঙ্গকে মানুষের নিজের পরিমণ্ডলে এনে রসের সাগর মন্থন করে তুলে আনতে হবে। তবেই সে শিল্প ও সাহিত্যের জগতে নন্দনবাসিনী হওয়ার যোগ্যতা পাবে। হঠাৎ পাওয়ার আকস্মিক সংগ্রহশালা তিল হতে তিলোত্তমা হবে। নইলে এই আকষ্মিক সংগ্রহগুলি শিশুসুলভ খেলার মধ্যেই ভুলে থাকবে। যেমন **lucky flukes** অথবা **arrested Niagra Falls**। সেই নায়গ্রা প্রপাতের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ করতে হলে খেলার অঙিনা ছেড়ে একটা চ্যালেঞ্জের করমর্দন করতে হয়। **Where the play ends and the challenge begins**। শুধুই সাদৃশ্যগত মিল নিয়ে কলাদেবী সুখী নয়। **Art is not a mere resemblance to external strains of life, or agreeable**



alikeness of things. It is an index of thought and exploration; an inside-out process. শিল্পকলার আসল উদ্দেশ্য অন্তঃকরণকে প্রকাশ করা, সুপ্তকে জাগ্রত করা, বস্তুজগতে নিগূঢ় তত্ত্বকে আনন্দময় করে তোলা।

অহল্যা অভিশপ্ত হয়ে পাথরে পরিণত হয়েছিল। রামচন্দ্রের স্পর্শে তার জীবন ফিরে পাওয়ার কথা। বহুকাল সেই পাথর বসুন্ধরার বুকে শিশির-সিক্ত হল, লতা-বেষ্ঠিত হল, মলয়-স্নিগ্ধ হল, ধরিত্রির বুকে শব্দ শুনতে পেল, শুনল কালের

পদধ্বনি, নবারুণ সূর্যের সকাল সে দেখল, আষাঢ় মেঘের কালো কাজল ছায়া তাকে হরণ করল, জ্যোৎস্না তাকে বরণ করল, বসন্ত তার গায়ে ফুলের আল্পনা দিল, মেঘের মল্লার গান, বর্ষার মুখর ভৈরব হর্ষ তান, মাঝদরিয়ার কুল ভাসানো আহ্বান কানে এলো। প্রকৃতির ঐক্যতান, **fullest utterence of nature** অহল্যাকে মুক্তি দিয়ে গেল, রামচন্দ্রের অপেক্ষায় রইল না। অহল্যা পর্বত শিলার মতো পুরাতন, অরণ্যসম চির নবীন। মানুষ আর প্রকৃতির চমৎকার রূপক। এই কথা স্মরণ করে অভিশপ্ত পাথরের বুকে যে ভাস্কর খোদাই করবে, তার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। পারবে কী অহল্যার বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে ? **Primordial rock** অতি পুরাতন, বন্য, চিরনবীন। **Frozen ecstasy of life**। কঠিন শাপে যে বাঁধা। ভাস্কর্যের কঠোর তপস্যায়, গভীর ধ্যানে তার শরীরে কালজয়ী জীবনের গান ঝঙ্কৃত করে তুলতে হবে। আপাতসদৃশ পুতুল গড়ার পাথর খেলা তার সামনে বাল্যখিল্যতার সমান। গাছও তাই। **In its naked nobleness an epic of mass and power** । গাছের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করতে হলে, একটা বড় মাপের রূপকের আশ্রয় নিতে হবে। তালতমাল বনরাজি। তার **whispering shores**। সেখানে কান পাততে হবে। নীল অরণ্য যেখানে গগনে মেশে।

কালজয়ী আর্ট শিক্ষাগুণে, চোখ বা হৃদয়ের একক শক্তি দিয়ে তৈরী হয় না। শিল্পীর সম্পূর্ণ সচেতন অস্তিত্ব ও সত্তা যখন অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতার ঢেউয়ে চেনা জগত হারিয়ে ফেলে,অচীন সাগরে ছিটকে পড়ে, তরী যখন ডুবে যায়, বাস্তবতার শেষ সীমায় তখন একমাত্র আশ্রয় সম্বল রূপকের সপ্তডিঙা। রূপক সেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন সভ্যতা অত্যন্ত দীন ও সীমায়িত হয়ে পড়বে। পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে প্রাচীন গুহা **Altamira** র নাম অনেকেই জানে। যখন **Paleolithic** মানুষ বেঁচে ছিল। তখন স্বাক্ষরবিহীন আদিম শিল্পী বন্য জন্তুর ছবি এঁকেছিল। পনের হাজার বছর আগে ফ্রান্সের উপকূলেও প্রাচীন গুহাচিত্রে আক্রমণরত জন্তুর ছবি দেখা যায়। ঐতিহাসিকদের মতে এমন আক্রমণাত্মক শিকারী জন্তুর ছবি উদ্দীপিত ভাবে পরে বিশেষ হয়নি। অত কাল আগে হাতের আঙুলের বিবর্তন তেমন হয়নি যার সাহায্যে শিল্পীর মনের সূক্ষ্ম গতি-প্রকৃতিকে ছবিতে ফোটানো যায়। তবে কালজয়ী আর্ট সেদিন কেমন ক'রে সৃষ্টি হয়েছিল ? কল্পনা করা যাক পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে গহন অরণ্য। নির্জন বিপদ-সঙ্কুল জীবন। আদিম মানুষ বনাম বন্য প্রাণী, একে অপরকে শিকার করে। তখন আদিম মানুষেব ঠিকানা গুহা-সুড়ঙ্গ, গুহাগর্ভ। গুহার দেওয়ালে ও ছাদে বিকট গর্ত, ফাটল, শ্যাওলা। সময়ের কুঞ্চিত বলিরেখা পাথরের দেওয়ালে আঁকা। অস্পষ্ট ভোরের আলো, দিনের আলো, গোধূলির আলো ঢুকে আলো

আঁধারির মরীচিকা সৃষ্টি করে। গুহার মধ্যে ঘূর্ণায়মান আলো ছায়া আদিম গুহাবাসীর চোখে বিচিত্র প্রহেলিকা সৃষ্টি করে চলেছে। আদিম চোখ মানসপটে ছবি এঁকে চলেছে , গহন রাতে গুহার দেওয়ালে আগুনের আলোয় সে বাইসনের ছবি দেখল। বাইরে তখন বন্যপ্রাণীর ভয়াল চিৎকার আর ছুটে চলা অসংখ্য খুরের আওয়াজ। অর্ধেক সে দেওয়ালের গায়ে সময়ের বলিরেখায় আঁকা ছবি, অর্ধেক মানুষের কল্পিত বাস্তবতা। কালজয়ী সেই ছবি। কারণ সেই দিনের মানুষ তার জীবন মরণের লড়াই দিয়ে, নিজের বিপন্ন অস্তিত্ব দিয়ে, ভয় আর মিশ্রিত



করে বাইসনকে উপলব্ধি করে। নিজের সমস্ত অস্তিত্বকে মুছে ফেলে সে দেখছে শিকারীর থাবা। **Catostrophe** র সামনে দাঁড়িয়ে জীবন-মরণ দ্বন্দের অক্ষয় রূপক হয়ে উঠল সেই দিনের এক আদি শিল্প। সেই একই রূপক, **Beauty is the begening of terror**।— ভাঙনের পথে এলে তুমি স্বারস্বত কবির পদটিকা। এই ভাবে এক অতি পুরানো পৃথিবীতে ছবির যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই অনুপ্রেরণাকে বলা যায় **Man's first primordial contact with the world. The shock and stimulus of the superabundant energy of the charging animal created and 'aura' in primitive sensibilities**। এই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ এক **poetical knot,** যখন আমাদের চিন্তা ছুটে যায় রূপকের দ্বারে কবিতার উৎস সন্ধানে **(poetry at it's source)**।

জীবনানন্দ দাসের জন্মশতবর্ষ চলে গেল। তাঁর কবিতার মলাটের তলায় ব্যক্তি-মানুষটার কৌতুহলী অনুসন্ধান করা হল। কিন্তু কৌতুহল চরিতার্থ হল না। বনলতা সেনের ইতিহাস ও ঠিকানা জানা গেল না। এই নাম যেন এক রহস্য — কোন সুড়ঙ্গ পথে লুকিয়ে আছে। সে কী কবির জীবনকালের নাটোরের পড়শিনী, যার অস্ফুট ভালবাসা না পাওয়ার বেদনা তাকে ঘর ছাড়া করেছিল ? কবির সুখ দুঃখ, হতাশার মাঝখানে ধ্রুবতারা ? নাকি হাজার বছর মানুষের পথিক ইতিহাসের সোনালী ফসল? নীড় ভাঙা মানুষের নীড়ে ফেরার আকাঙ্খা ? অথবা মহাকাল সমুদ্রের ঢেউ, উতলা বাতাস আর জীবনমাদলের মুখর ধরা — তার মাঝখানে অমৃতের প্রশান্ত সুরাসাকী? এক বিরাট রূপকে ধরা এই সব রহস্য।

জনপ্রিয় রূপক, জনপ্রিয় কবিতার মতো ভাতে বাড়ে। ভবিষ্যত মানুষের কল্পনার রসে লালিত, পুষ্ট হয়। মোনালিসার ঠোঁটের হাসি যেমন দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কল্পনার অনির্বাণ শিখা। অশেষ যার যাত্রা। নিশীথিনী প্রিয়া রূপকবাসিনী বনলতা সেন। **Robert Frost** বলেছিলেন " **Education by poetry is education by metaphor... is the prism of the intelect** "। কবিতার হাত ধরে রূপকের সিঁড়িতে যতই উত্তরণ করা যায়, কুহকিনী মায়া ততই আমাদের পেয়ে বসে। রূপকের এক ভাবের আকার আছে, ছবির দেশে যার সঙ্গে রূপায়িত মূর্তির সমানতা। " **The figure a poem makes**" বলেছেন **Frost**। উপন্যাসকে বিলম্বিত দীর্ঘ মাত্রার রূপক মনে করা হয়। **Henry Miller** বলেছেন **"(The artist) creates... a reality in which he can live out his unconscious desires, wishes, dream, ... He scorns the ordinary alphabet, which yields atmost only a grammar of thought, and adopts the symbol, the metaphor, ideograph. He writes Chinese. He creates an impossible world out of an incomprehensible language, a lie that enchants and enslaves men".** ফরাসী কবিদের লেখা সম্বন্ধে বলা হয় **"Introduction of modules of disorder into the heart of linguistic order, a new type of organisation which simultaneously sets at defiance all probability and all equiprobability (that is to say, of chance)... each word of a poem is a new incantatory..."**

চার

সাহিত্যের মণিকোঠায় যত সব অমূল্য মণিমাণিক্য রয়েছে তার মধ্যে হাস্যরস এক উজ্জ্বল রত্ন। রূপক এখানে পরিহাসের ভূমিকা নেয়। হাসির ষড়যন্ত্র বাদ

দিলে জীবনের জলসাঘর অসম্পূর্ণ থেকে যায়। **The comical trickster of language is a theme as fluent as as sea, sets to the desert sands thousand eloquent tongues. Life is vast salad and we are mad men to mix it**। বাঁধ ভাঙা হাসি জড়জগতের ওজনটাকে হাল্কা করে দেয়।

স্বাভাবিক জগতে আমাদের চেনা-মুখ রূপকগুলি বিশ্বস্তভাবে কাজ করে, ষড়যন্ত্রের ফাঁস পড়ায় না। এই গৃহপালিত পোষা রূপকগুলি ভাবনা হতে ভাবনান্তরে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসির আসরে নিয়ে চলে পকেট হতে পকেটান্তরে। অনেক কবি আকাশচারীতা করেছেন। কিন্তু সুকুমার রায় লিখেছেন, আকাশের "গায়ে যেন টক্ টক্ গন্ধ।" আবোল তাবোলের কারখানায় বক আর কচ্ছপ মিলে বকচ্ছপ, হাঁস আর সজারু মিলে হাঁসজারু হয়ে দাঁড়ায়। **Don Quixote**-র **Sanco Panja** গাধার পিঠে চেপে রাজকীয় গরিমায় জীবন নাট্যে **comedy of errors** ঘটিয়ে চলে। আবোল তাবোলের এক চরিত্র পরম গাম্ভীর্যসহকারে কাঠের মধ্যে কতো বিচিত্র ধরনের ফুটো থাকতে পারে সেই গুরুতর রহস্য খেটে খুটে খুঁটিয়ে দেখছে। এক ধরনের কাষ্ঠ হাসি বলা যাক। কাঠকে যারা নেহাত কাঠ বলে তারা বখাটে আকাট।

আরো আছে কত চরিত্র। সারমেয় অসাড় ভাষায় **tragic hero** কে কন্দর্পকান্তি সুন্দর কথায় গালি দেয়। রূপকের এই উদ্ভট বর্ণসংকর তখন আসরের মধ্যমণি হয়ে গঞ্জিকা সেবন করে, রস হতে রসাতলে যায়। **Nonsense rhymes** (ভণ্ডুল তান) আমাদের এক বিশেষ লাভ সাধন করে। শিল্পের বা সাহিত্যের গোড়ায় যেখানে গোঁড়ামি দেখা যায় তাকে সুখনস্যের হ্যাঁচকা টানে নস্যাৎ করে দিতে পারে। **There is a brand of humour by the levity of which seriousness is intensified**। হাস্যরস জীবন বোধের উল্টো পুরাণ। যে রসে প্রেম মজাইল, সেই রসে ভাঁড় সাজাইল।

"খাও খাও ভইরে টিনে কেরোসিন, কেরোসিন। কেরোসিনের সুবাতাসে মহাপ্রাণী খইসে আসে।" একথা লিখেছিলেন লীলা মজুমদার। ভ্রান্তিবিলাস। **Idiots enchanting**। পরিহাস হচ্ছে অমলিন পারিজাত, শুভ্র সমুজ্জ্বল। গোপাল ভাঁড়ের ভুমিকা নিয়েছিল। মানুষ যখন অহরহ কাঁদে বিধাতা মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু জীবন-যুদ্ধে বিদূষকও যদি ভেঙে পড়ে, বিধাতা তখন অশ্রুপাত করে।
